বাহিরে যাহারে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাহিরে যাহারে খুঁজেছিনু দ্বারে দ্বারে

পেয়েছি ভাবিয়া হারায়েছি বারে বারে

কত রূপে রূপে কত না অলঙ্কারে,

অন্তরে তারে জীবনে লইব মিলায়ে

বাহিরে তখন দিব তার সুধা বিলায়ে।

শ্রীমতী ভক্তি চৌধুরীর অটোগ্রাফ খাতা থেকে

১৯৮৮ সালের ঘটনা নিয়ে ১৯৩৭-৪৩ সালে যা ঘটেছিল

শ্রীধর

১৯৮৮ সালের ২০শে মার্চ্চ তারিখের

"নূতন বিশ্ব মনস্তত্ত্ব সমালোচনা" পত্রিকায় প্রকাশিত :

নিম্নলিখিত চিঠিটি একটি পুরাতনী পুঁথিপত্রের দোকানে পাওয়া যায়। চিঠিটি থেকে সুকুমার চিত্ত পাঠকরাও বুঝতে পারবেন, পৃথিবীতে এমন অনেক বই প্রকাশিত হয় যার লেখকেরা একেবারেই নকল ! সে সব বইর আসল লেখকরা বহুকাল আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

চিঠিটি এই :

প্রিয় চিরু,

তোমার কাছে ভাই আজ আমার একটা অপরাধ স্বীকার করার আছে। তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাই তোমাকে ছাড়া পৃথিবীর সবচেয়ে এক বড় জোচ্চুরী, সবচেয়ে বড় এক দুঃখের কাহিনী আর কাকে বলব ! ভয় হয় তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করবে, হয়ত উড়িয়েই দেবে। কিন্তু বন্ধু, যদি তোমার এতটুকু বিশ্বাস হয়, সমস্ত পৃথিবীকে এ কথা জানিয়ো, কারণ তুমি যখন ভাই এ চিঠি পড়বে, জীবনের সমস্ত দুঃখ ভোগ থেকে আমি তখন চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছি। না, না, ভয় পেয়ো না বন্ধু ! ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার জীবন বেশ ভালই কেটেছে এবং আমি বেশ বড় রকম সাফল্য লাভ করেছি।

কিন্তু শোনো আগে আমার কাহিনী। তোমাকে না বলে আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না, যে আমি একটা প্রকাণ্ড শঠ। জোচ্চোর আমি ! আমি অন্যের বিদ্যে ও বুদ্ধি চুরি করে নিজের বলে চালিয়েছি ! যদিও আমার এই ব্যবসার ধরণটা বেশ একটু অদ্ভুত ও আজব রকমেরই ছিল। কিন্তু যা হোক, পার্থিব সুখ যাকে বলে তার সব স্বাদ আমি পেয়েছি। আর আমি নিজেকে বলি—হাঁ লোকে আমাকে বলে বটে আমি নাকি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, বলে আমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বরলিপিকার। কিন্তু—কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না—আমি একবর্ণ গদ্য রচনা করতে জানি না, স্বরলিপির একটা চিহ্নও বেরোয় না আমার হাত দিয়ে। কিন্তু এসমস্ত কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি ......

তুমি জানো ১৯৩৭ সালে আমি এক ব্যাঙ্কে সামান্য কেরাণীর কাজ করতাম। কোন রকমে কায় ক্লেশে আমার জীবন কাটত। ঠিক এই সময়ে এমন একটা অদ্ভুত দোকানের দেখা পেলাম আমি, যাতে করে আমার সমস্ত জীবনের ধারা একেবারে বদলে গেল।

সেদিন ছিল একটা শনিবার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আটটা প্রায় বাজে। বাজারের রাস্তা দিয়ে আমি একমনে চলেছি। হঠাৎ ডান দিকে একটা দোকানে আমার চোখ পড়ল। উজ্জ্বল আলোকে দোকানটা ঝলমল করছে। আশ্চর্য্য! এর আগে তো কখনও দোকানটা আমার চোখে পড়েনি! দোকানটার মাথায় সাইন-বোর্ডে ইংরাজিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা:

THE ANTIQUE SHOP

কি যেন, কে যেন—আমাকে দোকানের ভেতর টেনে নিয়ে গেল। Antique shop যে এমন অদ্ভুত হতে পারে কোনদিন আমার ধারণা ছিল না। দোকানটা আগাগোড়া ক্রোমিয়ম দিয়ে মোড়া। ঘরটা মস্ত আলোকিত কিন্তু আলো যে কোথায় বোঝবার উপায় নেই। তবুও আমার আশ্চর্য্য হবার কথা নয়; দোকানের বাইরেটাই ছিল যথেষ্ট রকম অদ্ভুত।

আমি এমনই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে হঠাৎ বন্দুক ছোড়ার মত একটা আওয়াজ আমার কানে তীব্র আঘাত করলে:

"—মহাশয়ের কি চাই?"

চমকে উঠে আমি 'কাউন্টার'এর দিকে তাকালাম। দেখলাম আশ্চর্য্য রকম এক জোয়ান পুরুষ সেখানে দাঁড়িয়ে। তীব্র চোখ দুটো তার জ্বল জ্বল করছে। পরণে তার রবারের মত একটা জিনিষের তৈরী—দুভাগে বিভক্ত এক বিচিত্র পোষাক!

"এঃ—ইয়ে—এই আমি একটু দেখছি।" কোনরকমে ঢোক গিলে গলা দিয়ে আমার স্বর ফুটল।

সে অদ্ভুত লোকটি তখন একটু হেসে বললে, "বেশ, বেশ।"

দেয়ালের একটা বিচিত্র ঘড়ির দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল—"উঃ এযে আটটা বেজে গেছে। এখনই ট্রেন ধরতে হবে আমাকে—! কিছু জিনিষপত্রও কেনবার আছে।"

কতকগুলি পুঁথিপত্র থেকে একটা প্রাচীন হাত-লেখা বই তুলে নিয়ে বললাম—

"এর দাম কত—?"

"দু'টাকা। দাম হয়ত একটু বেশী মহাশয়। কিন্তু এ বইটি চল্লিশ বছর আগের লেখা।"

"দাম বেশী বলছেন,—কৈ?"—আমি অবাক হয়ে বলি।

"হাঁ, তাতো বটেই—কিন্তু এটা খুব—"

আর কোন কথা না বলে আমি তাড়াতাড়ি দাম ফেলে দিয়ে সে অদ্ভুত দোকানটা থেকে একরকম ছুটে বেরিয়ে এলাম।

ট্রেনে ভালভাবে বসে চেয়ে দেখি বইর মলাটের ওপর লেখা:

জীবনের মহৎ দুঃখ—জ্ঞান চৌধুরী ১৯৮৮

বারে, বড় মজার ত! নিশ্চয় ১৮৯৯ হবে, ভুল করে লিখেছে ১৯৮৮!

দিন তিনেক বাদে বইটা খুলে মন দিয়ে পড়তে বসেছি। আশ্চর্য্য বই, অপরূপ লেখা! কি অদ্ভুত ষ্টাইল ও ভাষা! পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। কি সুন্দর ও কি নূতন গল্প! না, আধুনিক বইর মত মোটেই নয়। হাঁ, এ একটা প্রকৃত শ্রেষ্ঠ রচনা বটে। কিন্তু এরকম বইর লেখক আজও পৃথিবীতে নাম করেন নি কেন—? মনে মনে ঠিক করলাম, এই লেখকের সব বই আমি পড়ব।

পরের দিন 'পাবলিক লাইব্রেরী'তে অনুসন্ধান করাতে তারা আমার কথা শুনে তো অবাক! এরকম লেখকের নাম কোন জন্মে নাকি তারা শোনে নি! বড় আশ্চর্য্য লাগল।

তার পরের দিনই আমি আবার সেই দোকানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। এই লেখকটির খোঁজ আমাকে নিতেই হবে। কিন্তু দোকানটার সামনে গিয়ে দেখি এক জায়গায় লেখা: দোকান বন্ধ, ভেতরে সাজান হচ্ছে।

দিন চারেক পরে আবার গেলাম, তখনও ঐ অবস্থা। শেষে শনিবার এলে মনে করলাম সাজান নিশ্চয় এতদিনে হয়ে গিয়ে থাকবে। গিয়ে দেখি ঠিক, দোকানে সে আগেকার মতই তীব্র আলো বাইরে ঝলমল করছে। আমি একটু ইতস্তত করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু কোথায় সাজান—সেই যেমন দেখেছিলাম তেমনি তো রয়েছে সব ঠিক!

"—নমস্কার। দোকানে তো কিছু সাজান দেখছি না।"

"—সাজান? বলেন কি মহাশয়—? সাজান কৈ আমরা তো কিছু করিনি—আপনি ভুল করেছেন বোধহয়—।"

"কিন্তু—আমি যে নিজের চোখে……"

হঠাৎ দেখি লোকটা মৃদু মৃদু হাসছে। তার সে হাসিতে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভাব দেখে আমি অন্য কথা পাড়লাম।

"মহাশয়, এ বইটির বিষয়ে এসেছি আমি। এই লেখকের সম্বন্ধে আমি কোন খবরই পাচ্ছি না। আপনি যদি দয়া করে কিছু খবর আমাকে দেন—"

লোকটি খুব আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে চায়, তারপর বলে:

—"মহাশয়, জ্ঞান চৌধুরীর নাম শোনেন নি—বড় তাজ্জব তো!"

"না মহাশয়, শুধু আমি নয়, এ দেশে আর কেউ ঐ লেখকের নাম পর্য্যন্ত শোনে নি।"

লোকটা তখন এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে সমস্ত শরীরটা আমার কেমন করে উঠল। একটু থেমে সে বললে:

"—কেন? তাঁর লেখা তো মহাশয় এ দেশের সর্ব্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়। এ বইটি যখন তিনি লেখেন, তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮। লেখক ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।"

"কি—!! ১৯৭০—??" গলা দিয়ে আমার আর কথা বেরোয় না। দোকানদার কিন্তু বলে চলে:

"হাঁ মহাশয়। ২৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। সে বড়ই দুঃখের বিষয় মহাশয়—তিনি আত্মহত্যা করেন।

একি রহস্য! আমার শরীর ভয়ে কি রকম যেন ছমছম করে উঠল। হঠাৎ চেয়ে দেখি টেবিলে যে সমস্ত প্রাচীন পুঁথিপত্র ছড়ান রয়েছে—তার প্রত্যেকটিতেই অনাগত ভবিষ্যতের কোন না কোন একটা

এক আশ্চর্য্য জোয়ান পুরুষ

সালের তারিখ লেখা! ভাবলাম হয় আমি বদ্ধ পাগল—নয়ত এই লোকটা! যাই হোক এ রহস্যময় দোকান থেকে এখন সরে পড়াই নিরাপদ।

কয়েকটা টাকা ফেলে দিয়ে কোনরকমে কতকগুলি পুঁথি ও স্বরলিপি নিয়ে আমি ঝড়ের মত রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। ঘাম মুছতে গিয়ে দোকানে আমার রুমালটা পড়ে গিয়েছিল। ফিরে দেখি দোকানের সামনের ফুটপাথে রুমালটা পড়ে—কিন্তু দোকান কৈ? ভয়ে আমার শরীর হিম হয়ে গেল। দোকানটা কোথায়? একি ভুতুড়ে কাণ্ড! আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না, এইত আমার হাতে দোকানের পুঁথিপত্র রয়েছে! তবে—? অজানা ভয়ে ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে এলাম আমি।

বাড়ী ফিরে এসে ভাবতে লাগলাম: দোকানটা কি তাহলে মানুষের বোধগম্যের অতীত কোন অলৌকিক শক্তিতে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতে (আমার বর্ত্তমান) কালান্তরিত হয়েছে! না আমিই পাগল। কিন্তু আমি তো বেশ স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছি। তা হলে একি স্বপ্ন নয়? সত্যিই কি কোন অলৌকিক শক্তিবলে দোকানটা সুদূর ভবিষ্যৎ থেকে তার অতীতে এ স্থানে চলে এসেছে!

ওই জুলাই আমার মাথায় কিন্তু হঠাৎ এক দুষ্ট বুদ্ধি চাপল। হয়ত এটা দোষণীয়, হয়ত নয়। কিন্তু এটা অন্ততঃ আইনের এলাকার বাইরে নয়। ভয় ভাবনা আমার তখনকার মত উবে গেল। মনে মনে আমি তর্ক করতে লাগলাম: এই বইগুলো এখনও ছাপা হয়নি—আমি কেন প্রকাশকদের কাছে এগুলো আমার লেখা বলে চালাই না!······হাঁ, তুমি জানো তাই আমি করেছি। তাই করে আজ আমি পৃথিবীর সাহিত্যরথীদের মধ্যে, পৃথিবীর স্বরলিপিকারদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছি!···

এরপর কয়েক বছর সকলের অজান্তে আমি প্রতি শনিবার রাতে আটটা থেকে নটার মধ্যে ঐ ভুতুড়ে দোকানটায় যেতাম। এ এক রকম আমার নিত্য অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর কিছু আমি গ্রাহ্য করতাম না। যা পছন্দমত পুঁথিপত্র দেখতাম, কিনে নিয়ে সোজা বাড়ী চলে আসতাম।

হাঁ, কয়েক বছর—১৯৪৩ সাল জুন মাস পর্য্যন্ত বেশ এরকম চলল। আর এই সময়ের মধ্যে আমি প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হলাম। কিন্তু তারপরই···তারপর নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এল আমার সবচেয়ে বড় "শক"—! যেমন আমি অভ্যাসমত দোকানে যাই সেদিনও গিয়ে তেমনি পুঁথিপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছি—হঠাৎ······হঠাৎ তার মধ্যে আমার নিজেরই হাতের সই দেখতে পেলাম! হাঁ, এই চিঠির তলায়—দেখে হতভম্ব বিমূঢ় হয়ে গেলাম আমি! একটা অদ্ভুত ভয়ে আমার শরীর একেবারে কাঠ হয়ে গেল!

* * * * *

বাড়ী ফিরে এসে আমার অদম্য ইচ্ছে হল—এই সমস্তটা আমি আবার লিখি!

* * * * *

তারপর······এখন আমি মৃত্যুর পথে মুক্তি পেতে চলেছি।

ইতি তোমার—

মুকুল

একটি ১৫ বৎসরের বালকের ইংরাজি রচনার ভাবানুবাদ

উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ

লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী

চিত্রিত

পূর্বপ্রকাশিতের পর

মহর্ষি পিঙ্গলের গুপ্তকোঠায় সে রাতের কথা আমি ভুলবনা।

দুঃখের হাসি হেসে মহর্ষি বললেন, "রঙিলা, অমরলতার ইতিহাসে বজ্রনাথের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আজ আমায় লোহার শিকল উপহার দিতে এসেছিলেন বজ্রনাথ।"

দেখলাম, মহর্ষির পায়ের তলায় পাষাণ মেঝেয় একটা লোহার শিকল পড়ে আছে।

মহর্ষি বললেন, "রঙিলা, অমরলতার সাধনা অহঙ্কারের সাধনা নয়। তলোয়ারের কোপে এখানে বড় ছোটর মীমাংসা করতে এলে সাধনায় বাধা পড়বে।" তারপর বজ্রনাথের দিকে ফিরে মহর্ষি বললেন, "বজ্রনাথ, তুমি তো জানো, মহর্ষি পিঙ্গল তুচ্ছ হতে পারেন, কিন্তু তপস্যা তাঁর তুচ্ছ নয়। এসো তুমি তাঁর চেয়ে মহৎ তপস্যা নিয়ে, মহর্ষি পথ ছেড়ে দেবেন তোমায়। পথ ছেড়ে দেবেন কি, পথ তাঁকে তখন ছেড়ে দিতেই হবে—অমরলতা চায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঋষি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর। এখানে দয়া মায়া স্নেহের স্থান নেই।"

মেঘের গম্ভীর করুণ আওয়াজের মত বজ্রনাথের কণ্ঠ শোনা গেল, "মহর্ষি ভুল বুঝেছেন আমায়। মহর্ষির তপস্যায় আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। কিন্তু সবুজ দ্বীপে অভিযান যাচ্ছে, সেই অভিযানের নায়ক হতে চেয়েছিলাম আমি। সেখানে মহর্ষি বোম্বেটে কালীভূষণকে আনছেন টেনে। কেন? বজ্রনাথ কি হীন? অন্ত্যজ? অভিযানের অযোগ্য?"

সেই মশালের আলোয় বজ্রনাথের দুটি চোখের কোণায় দেখলাম দুফোঁটা জল। অভিমানে বজ্রনাথের কণ্ঠরোধ হল।

মহর্ষি বললেন, "বজ্রনাথ, আমার শ্রেষ্ঠ শিষ্য তুমি। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর কালীভূষণ! তাকে পথ না ছেড়ে দিয়ে উপায় কি বজ্রনাথ! কেন তুমি অমরলতার তপস্যায় বাধা হবে?"

কিন্তু বজ্রনাথের মন বুঝছেনা। গম্ভীর মুখে তিনি বারবার মাথা নাড়লেন। বারবার তাঁর হাত তলোয়ারের বাটে মুঠ হয়ে এল। মহর্ষির মুখে গভীর দুঃখ অপার করুণা ফুটে উঠল। মহর্ষি বললেন, "বুঝেছি বজ্রনাথ, অভিযানের নায়ক তোমার না হলেই নয়। কিন্তু উপায় নেই আমার। কালীভূষণ আমার ধ্যানে ফুটে উঠেছে, ধ্যানে দেখেছি অসংখ্য সমুদ্র পার হয়ে সে সবুজ দ্বীপে ফুল তুলছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখি সে সাধ্য আমার নেই। ঈশ্বর হুকুম করেন, মহর্ষি সেই হুকুম তামিল করেন, এইমাত্র। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চাকর এই মহর্ষিরা।"

বজ্রনাথ হঠাৎ মুখে তুলে তাকালেন, পাষাণ দেয়ালে কাঠের ফলকে যেখানে অমরলতার চিহ্ন সবুজ সোনালীতে আঁকা ছিল সে দিকে তাকিয়ে তাঁর দুচোখ প্রখর কঠিন হয়ে এলো। অদ্ভুত একটা রহস্য-হাসি ছায়ার মত হঠাৎ তাঁর মুখে নেমে এল। হঠাৎ খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে বজ্রনাথ ছুঁড়ে দিলেন, চক্ষের পলকে মশালের আলোয় একটা ঝিলিক দিয়ে সেই তলোয়ার অমরলতার সবুজ সোনালী চিহ্ন বিঁধে দিলে।

মহর্ষি একখানা পাষাণ মূর্তির মত হয়ে গেলেন। বজ্রনাথের কণ্ঠ দূর আকাশের বজ্রের মত বেজে উঠল, "অমরলতা! অমরলতা!" তারপর একটু স্থির হোয়ে বজ্রনাথ বললেন, "রঙিলা, জানিনা অদৃষ্ট কোথায় আমায় ডাকছে! কিন্তু ভুলোনা, কথা দিয়েছ, অমরলতার অভিযান আমার হবে।"

আমি কী একটা কথা বলতে গেলাম, ধমক দিয়ে বজ্রনাথ বললেন, "চুপ্ রঙিলা। কথা ফিরিয়ে নিওনা। আমার হাতের ঘি চন্দন আঁকা ফল তুমি নিয়েছ, নিজ হাতে সেই ফল ফিরিয়ে দিয়েছ আমায়। আমার পূজো গ্রহণ করেছ তুমি, বর দিয়েছ আমায় 'তথাস্তু।' মনে রেখো রঙিলা।"

বজ্রনাথ চুপ হলেন। মহর্ষি পিঙ্গল তখন বজ্রনাথের দিকে এগিয়ে এলেন। বজ্রনাথের সামনে এসে হাত পেতে তিনি বললেন, "দাও বজ্রনাথ।" বজ্রনাথ একবার মহর্ষির পানে তাকালেন, তাঁর মুখে তখন গভীর হতাশা ফুটে উঠেছে। মহর্ষির ইঙ্গিত তিনি বুঝেছেন, বুঝেছেন অমরলতার খাতা থেকে তাঁর নাম কাটা গেল। তাঁর দুটি হাত কাঁপতে থাকল, কোন রকমে গলা থেকে অমরলতার হার খুলে নিয়ে মহর্ষির হাতে দিলেন। মহর্ষি আস্তে আস্তে ডাকলেন, "সুকণ্ঠ!" সুকণ্ঠ কাছে আসতে মহর্ষি বজ্রনাথের হার তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "বজ্রনাথ গেলেন। আজ হতে আমার সবচেয়ে আপন হলে তুমি।" সুকণ্ঠ যেন কেঁপে উঠল। একবার বজ্রনাথের পানে তাকাতে গিয়ে তার মাথা হেঁট হয়ে এলো। বজ্রনাথের দলের লোক সুকণ্ঠ, মহর্ষি কি জানেন না? সুকণ্ঠের কপালে এক ফোঁটা দু ফোঁটা

কয়েক ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠল। শুধু বজ্রনাথের মুখে বাঁকা হাসি খেলে গেল। মহর্ষি তখন গম্ভীর স্বরে বললেন, "যাও বজ্রনাথ। অমরলতা তোমায় ছুটি দিচ্ছে। যাও তুমি, বাহুবলে পৃথিবীতে সাম্রাজ্য জয় কোরো, দেখো তাতে পিপাসা মেটে কিনা। অমরলতার ঋষি আমি, আর তুমি অমরলতাকে আজ তলোয়ার দিয়ে বিঁধে দিয়েছ। তোমায় আশীর্ব্বাদ করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলে। যাও, যে পঞ্চাশ হাজার সন্ধানী আজ তোমার সঙ্গে কেল্লায় হানা দিয়েছে, তাদেরও মুক্তি দিলেম আমি। পঞ্চাশ হাজার তলোয়ার সঙ্গে পেলে, তাদের নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হও তুমি।"

তলোয়ার হাতে তাহাকে চাপলেম

মহর্ষির ইঙ্গিতে সবুজ সন্ধানীরা পথ ছেড়ে দিলে। মাথা হেঁট করে বজ্রনাথ বার হয়ে গেলেন। সেই রাত্রেই পঞ্চাশ হাজার সন্ধানী নিয়ে বজ্রনাথ অমরলতার রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন।

তারপর কয়েকটা দিন। অমরলতার রাজ্যে একটা চুপচুপ ভাব। বজ্রনাথের চলে যাওয়ার পর থেকে মহর্ষি যেন অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেছেন, গভীর রাত পর্য্যন্ত তাঁর সাধন চলছে। নানা রকম গল্প শোনা যেতে লাগল। ছুটি সবুজ সন্ধানী মহর্ষির তপস্যাকোঠা পাহারা দেয়। তারা বললে, তারা স্পষ্ট দেখেছে মহর্ষি যজ্ঞ করছিলেন, সেই যজ্ঞের আগুনের আলোয় আর ধোঁয়ায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠল এক অসুর মূর্ত্তি, হাতে তলোয়ার,

দুটি চোখ আগুনের ফুলকির মত। দেখতে সুন্দর, কিন্তু কঠিন কঠোর একটা ভাব চেহারায়।

এমনি যখন গুজব আর রটনায় চারিদিক ছেয়ে গেছে তখন একরাতে মহর্ষি আমায় ডেকে পাঠালেন।

গুপ্ত কোঠায় একটা প্রদীপ জ্বলছে। মহর্ষি মাথা হেঁট করে কী একটা ভাবনায় তন্ময় হয়ে বসে ছিলেন। পাষাণ মেঝেয় আমার পায়ের ছোঁয়া লাগতে মহর্ষি মাথা তুললেন।

আমি মহর্ষির সামনে গিয়ে হেঁট হয়ে প্রণাম করলাম। মহর্ষি বললেন, "রঙিলা, অভিযানের লগ্ন এগিয়ে এলো। সবুজ দ্বীপ ধ্যানে ধরা দিয়েছে। পথের মানচিত্র আঁকা শেষ আমার! এখন তোমাকে দিয়ে আমার বড় দরকার।"

মহর্ষি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "এসো।"

গুপ্ত কোঠার একদিকে দেয়ালে একটা মানচিত্র টাঙানো দেখলাম। মহর্ষি বললেন, "মানচিত্রখানা মন দিয়ে দেখো, রঙিলা। এই যে ভারতবর্ষ, আর এই লঙ্কা দ্বীপ। এদিকে ভারত সাগর, তারই এধারে দেখছ আরব সমুদ্র। আরব সমুদ্রে শুক্লতিথিতে দুপুর রাতে কালীভূষণের দুখানা বোম্বেটে জাহাজ দেখবে। বোম্বেটে জাহাজের হাতে ধরা দেবে তুমি, দেখো তাদের চোখে পড়া চাই। পালানোর ভাণ করবে। তা হলেই বোম্বেটেরা আপনা থেকেই এসে জাহাজ ঘেরাও করবে।"

আমি একটু ভয় পেয়ে বললাম, "বোম্বেটে! বোম্বেটেরা জাহাজ পুড়িয়ে দিতে পারে, মাঝি মাল্লাদের মেরে ফেলতে পারে।"

মহর্ষি ভ্রু কুঁচকে বললেন, "জাহাজ পোড়াক, মানুষ মারুক, তাতে কী যায় আসে!"

আমার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখে মহর্ষির মুখ মৃদু হাসিতে ভরে গেল। মহর্ষি বললেন, "যাদুকর সুশং যাচ্ছেন সঙ্গে। আসল জাহাজ মাঝি মাল্লা যেমন তেমন থাকবে। বোম্বেটেদের তলোয়ারে যারা কাটা পড়বে তারা ছায়া সৈন্য ছায়া মাঝিমাল্লা, যাদুকর সুশংয়ের ভেল্কিতে জন্ম যাদের।"

আমি বললাম, "বুঝেছি।"

মহর্ষি বললেন, "অমরলতার পুঁথি থাকবে তোমার হাতে। এতে সবুজ দ্বীপের ঠিকানা, পথের মানচিত্র আছে, অমরলতা কোন্ লক্ষণ মিলিয়ে চিনতে হবে—সেই সব সঙ্কেত আছে। সবুজ দ্বীপে প্রায় পাঁচশো লতা আছে অমরলতার মতন দেখতে। কোন্‌টি আসল অমরলতা চিনে নেওয়া কঠিন। এই পুঁথি কাছে না থাকলে অমরলতা চিনে নেওয়া অসম্ভব। এই পুঁথি তুমি বোম্বেটে কালীভূষণকে দেবে।"

মহর্ষি একটা বিচিত্র কারুকুরি করা বাক্স আমার হাতে তুলে দিলেন। তারপর মহর্ষি হাতে তালি দিতেই ঘরের অন্ধকার এক কোণ থেকে বারোটি মূর্ত্তি সামনে এগিয়ে এসে মহর্ষিকে প্রণাম করলে। মহর্ষি বললেন, "এই বারোজন—সবুজ সন্ধানীদের ভিতর শ্রেষ্ঠ

এরা। এরাই একদিন মিশর থেকে তোমাকে হিন্দুস্থানে নিয়ে এসেছিল। এরা থাকবে তোমার সঙ্গে। তোমার হুকুম, তা যতই অসম্ভব হোক না কেন, এরা তামিল করবে। ধরো তুমি যদি অমরলতার পুঁথি নিয়ে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলো, এরা মুখ ফুটে 'না' বলবে না। তুমি যদি কালীভূষণকে মাঝ দরিয়ায় ভাসিয়ে দিতে বলো, তোমার হুকুম তামিল না করে এদের উপায় নেই।"

শেষ কথা বলে মহর্ষি হেসে দিলেন।

শুক্ল তিথি। জ্যোৎস্না আকাশে রূপো ঢেলে দিয়েছে। শেষরাতে আরব সমুদ্রে রওণা হতে হবে। ঘাটে জাহাজ বাঁধা আছে। সন্ধানীরা সাঁজোয়া পরে জাহাজে চেপে বসে আছে। যাদুকর সুশং শেষ রাতের আগেই এসে পৌঁছবেন, সংবাদ এসেছে।

আমি আমার সাদাচূড়ো দালানের কোঠায় ব'সে আছি। আকাশ পাতাল ভাবছি। শেষ রাতে রওণা হতে হবে—আরবসমুদ্র আর বোম্বেটে কালীভূষণের কথা ভেবে এক একবার শিউরে উঠছি। কিন্তু তখনই মনে পড়ছে মহর্ষির অভয়, যাদুকর সুশঙের ভেল্কি।

আমার কোঠার বাইরে বারোজন সন্ধানী পাহারা দিচ্ছে। মহর্ষির আদেশ, ছায়ার মত তারা আমাকে অনুসরণ করবে, আমার জন্য আগুনে ঝাঁপ দেবে।

মাঝরাতে চোখের পাতা যেন জড়িয়ে আসছে, একটু হয়তো ঝিমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ খুট্ করে একটা আওয়াজ হল। চমকে চোখ মেলে চাইতে দেখি, দেয়ালে ছায়ার সঙ্গে মিশে কে যেন এগিয়ে আসছে। আমি কাঁপা গলায় বললাম, "কে?" "চুপ্। আমি সুকণ্ঠ" বলে ছায়ামূর্ত্তি সামনে এলো।

সুকণ্ঠ বললে, "রঙিলা। জরুরী কাজে এসেছি।"

"কিন্তু আমি শেষরাতে চলে যাচ্ছি সুকণ্ঠ," আমি বললাম।

"সেই খোঁজ পেয়েই এসেছি।" সুকণ্ঠ বললে।

আমি হেসে বললাম, "ফুল এনেছো বুঝি।"

"ফুল? হ্যাঁ, ফুল এনেছি রঙিলা, এই নাও"—

আমি চমকে উঠলাম। এযে বজ্রনাথের চিহ্ন-আঁকা ফুল! সুকণ্ঠ বললে, "বজ্রনাথ পাঠিয়েছেন আমায়, তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন, একদিন তুমি ঘি-চন্দন আঁকা ফল তাঁর হাত থেকে নিয়েছিলে, বলেছিলে অভিযান তাঁর হবে।"

হ্যাঁ, বলেছিলাম তথাস্তু। "কিন্তু"—বললাম "সুকণ্ঠ আমি অমরলতার পুঁথি যে কালীভূষণকে দিতে যাচ্ছি। অমরলতার পুঁথি না পেলে সবুজদ্বীপের অভিযানে যাওয়া চলে না। বজ্রনাথকে বোলো, রঙিলার কোনই উপায় নেই।"

"উপায় নেই! উপায় করে নাও রঙিলা। বজ্রনাথকে কথা দিয়ে ফিরিয়ে নিওনা। ঐ পুঁথি বজ্রনাথকে দাও।"

"অসম্ভব! কোঠার চারিদিকে সন্ধানীরা পাহারা দিচ্ছে। তাছাড়া মহর্ষির আদেশ, পুঁথি কালীভূষণকে দিতে হবে।"

"এখানে না দাও, আমি লুকিয়ে জাহাজে চাপবো। একফাঁকে পুঁথির বাক্স জাহাজে আমার হাতে তুলে দিও। মাঝসমুদ্রে রাতের ছায়ায় ছায়ায় আমি নেমে পড়বো। সমুদ্র সাঁতার দিয়ে পার হয়ে পুঁথির বাক্স বজ্রনাথকে পৌঁছে দেব। কথা দাও রঙিলা।"

আমি বললাম, "মহর্ষির আদেশ পুঁথি কালীভূষণকে দিতে হবে।"

সুকণ্ঠ বললে, "কিন্তু বজ্রনাথকে কথা দিয়েছ তুমি।"

আমি বললাম, "কথা ফিরিয়ে নিলে পাপ হবে আমার। পাপের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মহর্ষির চোখে আমি ধুলো দিই কী করে, সুকণ্ঠ!"

সুকণ্ঠ মাথা নীচু করলে, কী কথা খানিকক্ষণ সে ভাবলে। তারপর সে আস্তে আস্তে বললে, "রাগ কোরোনা রঙিলা। বজ্রনাথ একটা কথা বলে দিয়েছেন, আমার নিজের কথা নয়। আমাকে তুমি ঘৃণা কোরো না।"

আমি বড় দুঃখে হেসে ফেললাম। বললাম, "আমি তোমাকে ঘৃণা করতে পারিনা সুকণ্ঠ। বজ্রনাথ কী বলেছেন বলো।"

সুকণ্ঠ নখ দিয়ে পাষাণ মেঝেয় আঁচড় কাটতে কাটতে বললে, "বজ্রনাথ বলেছেন, পুঁথি কালীভূষণকে দিতে হবে, এই শুধু মহর্ষির আদেশ। কিন্তু পুঁথি পেয়েও কালীভূষণ পুঁথি যেন না পায়।"

"অর্থাৎ"——

"কালীভূষণের হাত পা বেঁধে নৌকো ভাসিয়ে দিও। সেই সঙ্গে নৌকোয় পুঁথি তুলে দিও।"

আমি শিউরে উঠলাম। সুকণ্ঠও যেন কেঁপে উঠল। আমি বললাম, "এতে বজ্রনাথের লাভ কী—কালীভূষণ মরবে, সেইসঙ্গে অমরলতার পুঁথিও যে ঢেউয়ের তলায়"—

সুকণ্ঠ বললে, "কালীভূষণ সরে দাঁড়ালেই বজ্রনাথ অভিযানের নায়ক হতে পারেন। আর পুঁথি—মহর্ষির গুপ্ত কোঠায় গুপ্ত সিন্দুকে আরো একখানা পুঁথি আছে। সেই পুঁথি নিয়ে বজ্রনাথ বার হতে পারবেন।"

আমি হাত নিঙরে বললাম, "সুকণ্ঠ। বজ্রনাথ পাগল হয়েছেন। তাছাড়া কালীভূষণকে বাঁধবে কে?"

সুকণ্ঠ কাছে সরে এসে বললে, "মহর্ষির গুপ্ত কোঠায় আমি লুকিয়ে ছিলেম রঙিলা। শুনেছি, সন্ধানীরা তোমার হুকুম যতই অসম্ভব হোকনা কেন, একটি কথা না কয়ে তামিল করবে। তুমি হুকুম দেবে, কালীভূষণকে তারাই বেঁধে ফেলবে।"

সর্ব্বনাশ! সুকণ্ঠ বলে কী!

সুকণ্ঠ তখনও থামেনি। সুকণ্ঠ বললে, "তুমি ভাবছো, কালীভূষণকে বাঁধা এতই অসম্ভব। শোনো রঙিলা, মহর্ষির আদেশ—তোমার কথা সবাই যেন মাথা পেতে নেয়। তুমি হুকুম দেবে, দেখবে যাদুকর স্বয়ং কালীভূষণের চোখে মায়াঘুম এনেছেন। ঘুমন্ত বোম্বেটেকে হাত পা বেঁধে মাঝদরিয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়।"

আমি বললাম, "অসম্ভব। আমি বিশ্বাসঘাতক হতে পারবো না। তুমি যাও সুকণ্ঠ। মহর্ষি নিজহাতে তোমার গলায় শ্রেষ্ঠশিষ্যের হার পরিয়ে দিয়েছেন, তুমি তার এই প্রতিদান দিতে চলেছ!"

সুকণ্ঠের মুখ কালো হয়ে গেল। ধরাগলায় সে বললে, "বজ্রনাথকে কথা দিয়েছি আমি, আমার আর উপায় নেই রঙিলা। বজ্রনাথের বিশ্বাস রাখতে গিয়ে মহর্ষির কাছে বিশ্বাসঘাতক হতে হচ্ছে আমায়।"

সুকণ্ঠের পানে তাকিয়ে আমার মন কেঁদে উঠল। এ কী চেহারা হয়েছে তার—দুটি চোখ কোটরে বসেছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। সুন্দর টিকলো নাক তার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সুকণ্ঠ বললে, "রঙিলা, বজ্রনাথকে কথা দিয়েছি। কথা রাখতে হবে। তার জন্যে যদি দরকার হয়, প্রাণ দেবো। শোনো রঙিলা, বজ্রনাথকে আমি কথা দিয়েছি, তুমিও দিয়েছ। মহর্ষিকে মুখফুটে কোনো কথা আমি দিইনি, কিন্তু তার দেওয়া হার গলায় পরেছি, কথা দেওয়ার চেয়ে এতো কম নয়! কিন্তু বজ্রনাথকে কথা দিয়েছি, সেই হয়েছে সর্ব্বনাশ। মহর্ষিকে না ঠকিয়ে উপায় নেই।"

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম, "আর আমারও মহর্ষির কথা না রেখে উপায় নেই। কিন্তু সুকণ্ঠ, আমিও যে বজ্রনাথকে কথা দিয়েছি।"

"কথা দিয়েছ রঙিলা, কথা দিয়েছ বজ্রনাথকে, মুখের কথা এখন সর্ব্বনাশের নিশান হয়েছে তোমার। মহর্ষিকে ঠকাতে হবে তোমার, মহর্ষির অভিশাপ কুড়োতে হবে।"

"আমি তা পারিনা সুকণ্ঠ, আমি, আমি কতটুকু! মহর্ষি, তিনি কতবড়—তাঁকে ঠকাতে গেলে"—

"তাকে না ঠকিয়ে উপায় নেই। রঙিলা, বজ্রনাথ ভালোবেসেছিলেন আমায়। কবিতা লেখায় তাঁর কাছে হাতেখড়ি আমার। একদিন তিনি আমায় বলেছিলেন, সুকণ্ঠ, গুরুকে মূল্য দিতে হবে মনে আছে তো? আমি বলেছিলাম, মনে আছে। সেদিন আমি মনে মনে বলেছিলাম, আর কিছুতে না হয়, প্রাণ মূল্য দেব। আজও তাই, যদি না পারি কথা রাখতে, বজ্রনাথের কাজে প্রাণ উপহার দিয়ে যাবো।"

হঠাৎ সুকণ্ঠের হাতে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি চমকে উঠল। সুকণ্ঠ বললে, "রঙিলা, মৃত্যু

ডাক দিয়েছে আমায়। তোমাকে রাজী করাতে পারলুম না। বেঁচে থাকার উপায় নেই। তুমি সাক্ষী রইলে, বজ্রনাথকে বলতে পারবে তাঁর কাজে প্রাণ দিয়ে গেছি আমি।"

সুকণ্ঠের হাত আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল! আমি মনে মনে কেঁদে খুন হয়ে বললাম, "হায় মহর্ষি! এ কী পরীক্ষায় ফেলেছ আমায়!" আমাকে কে যেন সামনে ঠেলে দিলে। আমি 'সুকণ্ঠ' বলে অস্ফুটস্বরে তাকে নাম ধরে ডাকলাম, তার হাতখানা চেপে ধরলাম, "তুমি মরতে পাবে না সুকণ্ঠ"—

সুকণ্ঠ উদ্‌ভ্রান্তের মত বললে, "না, মরতে হবে। বেঁচে থেকে বড় লজ্জা রঙিলা।"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "তোমাকে লজ্জা পেতে দেবনা আমি সুকণ্ঠ! বজ্রনাথের কথা রাখবো আমি।"

"তারপর, তারপর তুমি বজ্রনাথের কথা রাখলে!" কালীভূষণ ভীষণ গম্ভীর স্বরে বললে। রঙিলার কাহিনী একটানা চলেছিল, জাহাজ-কোঠায় বোম্বেটেরা গল্পের নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, জেগে জেগে তারা এই রঙিলা মেয়েটিকে যেন স্বপ্নে দেখছিল, স্বপ্নে শুনছিল। একটা, দুটো, তিনটে ঘণ্টা ইতিমধ্যে কেটেছে, কারো হুঁশ নেই। হঠাৎ কালীভূষণের কঠোর গম্ভীর স্বর নেশার সুরটা যেন কেটে দিলে। বোম্বেটেরা ধড়মড়িয়ে উঠল।

"সুকণ্ঠকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালে তুমি রঙিলা!"

"হ্যাঁ, বাঁচলাম তাকে," রঙিলা বললে, "শেষরাতে চাঁদের রূপোলী আলো যখন ভোরের ফিকে আলোয় মিশে মিশে যাচ্ছে, তখন আমি একখানা তলোয়ার হাতে জাহাজে চাপলাম।"

"জাহাজে চেপে, তারপর,—তারপর মহর্ষির চোখে ধূলো দিলে তুমি!" অধীরস্বরে কালীভূষণ বললে।

"হ্যাঁ, ধূলো দিতে হল মহর্ষির চোখে। কালীভূষণ, তোমার সামনে যাদুকর সুশণ্ডের রোমাল তুলে ধরলাম, তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়লে। তারপর তোমার হাতপা বেঁধে নৌকোয় তুলে দিলেম, সেই নৌকোয় তুলে দিলেম অমরলতার পুঁথির বাক্স। তারপর মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম তোমাকে"—

"আমাকে নয়, আমাকে নয়, তুমি ভাসিয়ে দিয়েছ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোম্বেটে কালীভূষণকে" বলে' থরথর কাঁপতে কাঁপতে কালীভূষণ উঠে দাঁড়ালো।

কালীভূষণ উদ্‌ভ্রান্তের মত এ কী কথা বলে—তার এলোমেলো কথা শুনে জাহাজ কোঠার সবাই ভাবলে। ক্ষিতিভূষণ ভারী গলায় বললে, "দাদা, স্থির হও, বোসো। নির্ব্বোধ রঙিলা তোমায় মহাসমুদ্রে ভাসিয়েছিল, কিন্তু মহাসমুদ্র তোমাকে ফিরে দিয়েছে।"

"কালীভূষণ নেই, কালীভূষণকে আর ফিরে পাবেনা ছোটকর্ত্তা" বলে' পরচুলো খসিয়ে পুলন্দ বসে পড়ল।

ক্ষিতিভূষণ পাষাণের মত স্থির হয়ে গেল। একটা অতিকায় অজগরের নিঃশ্বাসের মত জাহাজকোঠার বোম্বেটেদের বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

আর রঙিলা—জাহাজ কোঠার মেঝেয় সে লুটিয়ে পড়ল।

রঙিলার কাছ থেকে সকল রহস্য জেনে নেওয়ার জন্য নকল কালীভূষণ সেজেছিল পুলন্দ। পুলন্দের ফাঁদে রঙিলা ধরা দিলে, অমরলতার রহস্য জানলে বোম্বেটেরা। কিন্তু হতাশায় বোম্বেটেদের বুক ভেঙে গেল। তাদের একটা বড় আশা ছিল, রঙিলা মেয়েটির হয়তো মাথা খারাপ। অতটুকু মেয়ে, সত্যিই কি প্রাণে ধরে' সে জলজ্যান্ত একটা মানুষকে হাত পা বেঁধে মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে পারে? নাঃ তা সম্ভব নয়। কিন্তু রঙিলা পুলন্দকে কালীভূষণ ভেবে অকপটে যখন তার কাহিনী খুলে বললে, বোম্বেটেদের ভুল ভাঙল। তারা শিউরে উঠল। কালীভূষণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোম্বেটে কালীভূষণ—সে এখন কোথায়! বোম্বেটেদের মনে হল, হায় মহাসমুদ্র কী নিষ্ঠুর! মহাসমুদ্রের যে গান শুনে তাদের রক্ত নেচে ওঠে, সেই গান যেন কত করুণ!

জাহাজকোঠার বৈঠক শেষ হল। রঙিলাকে তার কোঠায় আটক করা হল। একটা দিনের চারটা প্রহর আকাশের আগুনে গলে' গলে' সেই মহাসমুদ্রের জলে মিশে গেল!

সারাটা দিন ক্ষিতিভূষণ জাহাজের পাটাতনে পায়চারী করল। তার মনে শান্তি নেই। শুধু যে কালীভূষণের কথা সে ভাবছে, তা নয়। এই রঙিলা মেয়েটির কথা ভেবে ও তার মনে শান্তি নেই।—বোম্বেটেদের বিচার বড়ই নিষ্ঠুর। রাত দুপুরে তাকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। ক্ষিতিভূষণ একবার ভেবেছিল, ছেড়ে দেয় রঙিলাকে। কিন্তু না, তা কি সে পারে! কালীভূষণের আত্মা তাহলে অনন্ত পিপাসায় মরবে। তার মৃত্যুর প্রতিশোধ একটা চাই তো। তাছাড়া পুলন্দ তার দুটি হাত ধরে বলেছে, "ছোটকর্ত্তা, আমাদের সর্দ্দার তুমি। ঐ মেয়েটার চাঁদপানা মুখ দেখে ওকে যদি ছেড়ে দাও তুমি, তাহলে আমরা জানবো আমাদের আর সর্দ্দার নেই।

কিন্তু, ক্ষিতিভূষণ ভাবছে রঙিলা পাষাণী তো নয়। কালীভূষণকে যখন সে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, তখন কি আর তার মাথার ঠিক ছিল? তাছাড়া ওর অত সুন্দর মুখ কী ম্লান করুণ দেখাচ্ছে। ক্ষিতিভূষণ দেখেছিল, কালীভূষণ ফিরে এসেছে এই খবর পেয়ে, নকল কালীভূষণকে দেখে রঙিলার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সে কি আর তার নিজের ভুল ধরতে পারেনি!

দুপুররাতে হাওয়া পড়ে গেল, মাঝসমুদ্র হঠাৎ যেন ঘুমিয়ে পড়ল। সমুদ্রের ঘুমন্ত চোখের স্বপ্নের মত একখানা চাঁদ আকাশে ফুটে রইল। সাদা মেঘের ওড়না গায়ে অতবড় আকাশ একেবারে স্থির হয়ে থাকল; আজ সে আর আলোর দোলায় দুলছেনা, তার তারার আঁচল কেঁপে কেঁপে আর চিকমিক করছে না।

রঙিলা তার জাহাজকোঠায় জেগে জেগে রাতের প্রহর গুনছে। মৃত্যু কেমন, মৃত্যু কি মধুর, মৃত্যু কি শুধুই দেশ থেকে বিদেশে যাওয়া—সে ভাবছে। হঠাৎ কবাটে খুট করে একটা শব্দ হল। ক্ষিতিভূষণ এসে কোঠায় ঢুকল।

রঙিলা তার খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ক্ষিতিভূষণ বললে "রঙিলা, আমাকে আসতে হল।"

রঙিলা অদ্ভুত হেসে বললে, "তা বেশ! ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিজ হাতে নিতে চাইলে, তোমায় ঠেকায় কে!"

ক্ষিতিভূষণ ম্লান হাসল।

রঙিলা বললে, "ভয় নেই, আমাকে মারতে হাঙ্গামা নেই। আমি সাঁতার জানি না, সমুদ্রে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যাবো।"

ক্ষিতিভূষণ হেসে বললে, "যত বড় আনাড়ীই হোক, সমুদ্রে পড়ে একবার ঢেউয়ের মাথায় ভেসে ওঠে।"

রঙিলা বললে, "ও।"

ক্ষিতিভূষণ বললে, "তখন তার চোখে পড়ে নীল আকাশ, অনেক দূরের আকাশের আলো, আর সব কিছু নিয়ে এই সুন্দর পৃথিবী।"

রঙিলা কথা বললে না।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "তখন তার বড় সাধ হয়, হায় যদি কোন রকমে বাঁচতে পেতাম।"

একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে রঙিলা পিছন হটে গেল, জাহাজকোঠার দেয়ালের গায়ে সে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দু একবার কেঁপে উঠল।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "কী ভাবছো রঙিলা? সময় হয়ে এলো। কিছু বলার থাকে, আমায় বলতে পারো।"

রঙিলা বললে, "ক্ষিতিভূষণ তোমার জাহাজ তো দেশে দেশে যায়। যদি কোথাও স্বকণ্ঠের দেখা পাও তো বোলো রঙিলা বজ্রনাথের কথা রাখতে মারা গেছে।"

ক্ষিতিভূষণ বললে, "আচ্ছা।"

ক্ষিতিভূষণের পিছু পিছু রঙিলা জাহাজের পাটাতনের ধারে এলো। সচরাচর বোম্বেটেরা ঘটা করে বন্দীদের শাস্তি দেয়। নাচ গান জমে, জাহাজের পাটাতনে বোম্বেটেদের

বেশ খানিকটা ভিড় হয়। কিন্তু ক্ষিতিভূষণ কথা আদায় করেছে, কোন ভিড় হতে দেওয়া নেই। একা সে শাস্তি দেবে। ভিড় পাকিয়ে একটা কচি মেয়েকে সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খেতে দেখা পুরুষের কাজ নয়।

মহাসমুদ্র ধূসর আলোয় দেখা যাচ্ছে ধূ ধূ। দিগন্তে রহস্যের যবনিকা ঝুলছে। তার ওপারে—

"রঙিলা, ঐ দেখা যাচ্ছে দিগন্ত। তার ওধারে কী আছে জানো?"

"জানি না" রঙিলা বলে। মনে মনে ভাবে, মৃত্যু। মৃত্যু দিগন্তের এধারে, ওধারেও।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "দিগন্তের ওধারে আশা। আমাদের সামনে মহাসমুদ্রে কোনো আশা নেই। কালীভূষণের নৌকা দেখা যাচ্ছে না। দিগন্তের ওধারে হয়তো চলেছে কালীভূষণের নৌকা। এসো রঙিলা, সময় হয়ে এলো।"

রঙিলার মুখে মৃত্যুর ভয় ফুটে উঠেছে। তার দুটি চোখে একটা আশ্চর্য্য বেপরোয়া ভাব জেগে উঠেছে। সেখানে যেন জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত্তের ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে।

ক্ষিতিভূষণের পাশে রঙিলা এসে দাঁড়ালো। ক্ষিতিভূষণ বললে, "এবার আমি তোমাকে ঠেলে ফেলে দেব।"

তারপর—তারপর, ক্ষিতিভূষণ রঙিলাকে ঠেলে ফেলে দিলে।

কিন্তু রঙিলা মহাসমুদ্রে না পড়ে জাহাজে বাঁধা একটা নৌকার উপর এসে পড়ল। ক্ষিতিভূষণ এক লাফে নৌকায় নেমে এসে দড়িটা কেটে দিলে। নৌকা টলমল করে মহাসমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ থেকে তফাতে সরে এলো।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই রঙিলা। তোমাকে প্রাণে মেরে লাভ কী? তার চেয়ে তোমাকে সঙ্গে করে কালীভূষণের খোঁজে বেরিয়ে পড়া কি ঢের বেশী বুদ্ধির কাজ নয়!" একটু থেমে ক্ষিতিভূষণ বলে, "হয়তো দিগন্তের ওধারে কালীভূষণের নৌকা চলছে। হয়তো তাকে আমরা ফিরে পাবো।"

ক্ষিতিভূষণ রঙিলার একটা হাত তার হাতে আস্তে আস্তে টেনে নিলে।

অনেক দূরে তাঁর গুপ্ত কোঠায় বসে মহর্ষি তখন লিখছেন, "অমরলতার তপস্যা ব্যর্থ হতে পারে না। অভিযানের নায়ক যে—একদিন সবুজ দ্বীপে সে পৌঁছবে। মহাসমুদ্র, অরণ্য, পাহাড় তাকে পথ ছেড়ে দেবে। মৃত্যু তার সামনে মাথা নুইয়ে পথ করে দেবে।"

প্রথম খণ্ড শেষ

শীতের ভোরে

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

শীতের ভোরে

বেজায় শীত। তবু রাত তেম্নি বড় হওয়াতে, ভোরেই উঠে পড়েছি। সব পাখী তখনো ডাকেনি ভালো করে। কুয়াসার তূলোর জাল দিয়ে পৃথিবীকে ঢাকছে যেন কে; কিন্তু শীতের কাঁপুনি সে জাল ছিঁড়ছে দশ আঙুলে।

যেন কোন জটী বুড়ী তার জট আঁচড়াচ্ছে সারা রাত আর কাঁপছে।

ঘুম কাতুরে বলে আমার একটু যে খ্যাতি না ছিল, তা নয়। ও অখ্যাতি ঝেড়ে ফেলেছি। জ্যোতি-দার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, বাড়ীর সবার আগে উঠব দেখো। এ শীতেও আমার পণ পণ্ড হয় নি, আজও!

শুধু উঠেই, শীতকে নিস্তার দিয়েছি ভাবো তো ভুল হবে। রথীশকেও ডেকে তুলেছি। ঢুটো লেপের ভিতর থেকে বাইরে এনেছি তাকে, যেমন করে বাক্সের আঙুরকে বার করতে হয়।

ছু' মাইল করে হাঁটতে হবে ভোরে আমাদের, জ্যোতি-দার কাছে এ আমাদের ধনুর্ভঙ্গ পণ।

আমার মনে পড়ে না হেরেছি। কিন্তু রথীশ নিজেই প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে ধনুক ভাঙার বদলে। মানে, পণ সে প্রায়ই রাখতে পারে নি।

জ্যোতি-দার কাছে লজ্জা পাবে? তাই শীত জমাট বাঁধতেই, আমি ওর সহায় হয়েছি।

পথে এসে মুস্কিল। এক এক জনকে যেতে হবে এক এক দিকে। তাঁর গাঁয়ের বাড়ীতে নিয়ে এসে জ্যোতি-দা এবার আমাদের সঙ্গে এই মজা স্নুরু করেছেন।

আমরাও দেখব, ভাবছি।

বললেম "পথে হারিয়ে যাস্ তো রথীশ, হুইসিলটাতে হেঁকে স্নুর দিস্!"

চোক কচলে' রাঙা করে রথীশ রেগে বললে, "যাঃ!"

মফ্লার ভালো করে এঁটে, আল্ষ্টারের পকেটে ছুহাত ঢুকিয়ে ও কুয়াসা ভেদ করে চলে গেল জোরে একটা নতুন রণতরীর মত! আলোয়ান জড়িয়ে আমি মাঠের যে দিকটাতে এলেম, একেবারে কুয়াসার বেতাল সাগরের মধ্যে এসে পড়লেম যে!

—তাই তো, আমার মনের সাহসের কম্পাস অচল হল কি এই গেঁয়ো মাঠটাতে, আজ, শেষে ?

লজ্জা করল। দাঁড়ালেম। কোথায় জানি নে। তবু হুইসিলের দিকে হাত গেল না। ও অপমানের পথে না গিয়ে, চলব সোজা।

উপায় যখন হাতে নেই, চললেম সাব্‌মেরিণের মত।

পাখীর গান শুনছি এদিকে সেদিকে! শাদা শ্বেতভূত হয়ে গেছি। শুনেছি যে আলোয়ান আসে কাশ্মীর থেকে নয় তো ইয়োরোপ থেকে, এখন সেটা বেশ বুঝতে পারছি হুটো হাতের উপর দিয়ে আর সেই শোনা কানে। হিমে আলোয়ানটা বোধ হয় কুল্‌পী হয়ে গেছে। সোয়েটারের ভিতরে ছিলেম তাই রক্ষে। পাখীর বাসায় থাকা ডিমের মত ভাবছি মনে মনে অসীম কথা আর চলছিও মহা নিরুদ্দেশে।

হু' একবার ভাবলেম রথীশের বোধ হয় হুইসিল্ শুনতে পাব। কিছু না। পৃথিবীতে কুয়াসা ছাড়া আর কিছু আছে যেন এ-ও আশা করা হুরাশা হয়ে উঠল।

হঠাৎ খট্ করে কী ঠেকল পায়ে! একটা গর্ত্তে পড়তে পড়তে, শিউরেও সাম্‌লে' গেলাম খুব। শরীরটাতে বেজায় একটা নাড়া পড়ল। ভোর বেলাতেও কোনো ভুতুড়ে কিছু কি থাকে গাঁ-দেশে ?

একটা ভাঙা ঢিবিতে ধাক্কা খেয়ে আর উঠতে পারি নি, বসে পড়েছি। শিশিরে ধোয়া হয়ে যেন ঘেমে হাসছে কী কোমল সুন্দর মুখ কালো পাথরের পুতুল! যেন গর্ত্তটাকে আলোতে ভরে রেখেছে কালো পুতুলেই। একটুকু তবু দেখলেম নুয়ে পড়ে'। কিন্তু পারলেম না থাকতে। টুক্ করে তুলে নিলেম বুকে ওকে আলোয়ানে জড়িয়ে।

চারদিকে নানা পাখীর গানে কুয়াসা যেন ঘাব্‌ড়ে গেছে। ঢিবিটের উপর দিয়ে, লাফিয়ে উঠেছি একটা ভিটেতে। আঃ!—কি দেখলেম ? পিছনে থম্‌কে আছে কুয়াসা, আর সাম্‌নে ? উঁচু জমির উপর দিয়ে ঢেলে গড়িয়ে পড়ছে স্যুর্য্যের সোনা, গাছের হাজার হাজার ফাঁক ভরে দিয়ে, খালের জল এক চুমুকে সোনার তবকে গড়ে' তুলে, পথ চলা মানুষ গরু কুকুর মোষ—ঘর কুড়ে, পুকুর, দোকান, খেয়া নৌকো, ছোট্ট ডাকঘর সব যেন কোন্ যাহুতে হাসিয়ে দিয়ে, ঝিক্‌মিকে পাখা মেলছে আকাশে।

হালের গরু পালে পালে চলে গেল। লাঙল কাঁধে হুকো হাতে চাষী নীচু মাঠের ভাঙা ভাঙা ভীতু কুয়াসা যেন টেনে ফেলে দিয়ে পথ করে চলল তাদের নিয়ে।

সত্যি আর এক গাঁয়ে এসে পড়েছি। পড়েছি তো, এগিয়ে চললেম। জ্যোতি-দার গাঁয়ে আগের দু'দিন বেড়িয়েছিলেম বেশ গাছের সারির ভিতর দিয়ে ; এখানে পূবদিকে শুধু খোলা মাঠ। কী খোলা! রোদে কুয়াসায় মাখামাখি হয়ে যেন এক অজানা দেশ করে রেখেছে সামনের সব ধূ ধূ দূরটা! পাথরের পুতুল কি নিয়ে এল আমায় ভুলিয়ে এই মধুর আবছা-রহস্য ঢাকা দেশে ? ওকে আবার দেখলেম। সুন্দর রহস্যের হাসিতে ঘেরা ওরও মুখ। কাঁচা রোদ পড়ে কালো সৌন্দর্য্য ওর চিক্‌চিকিয়ে উঠল দারুণ সুন্দর হয়ে।

"কোথা যাবেন আপনি ?"

চমকে' উঠলেম। বিষম লম্বা, দাঁত উঁচু একটি র‍্যাপারে জড়ানো মানুষ। চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত।

"কোথা যাবে তুমি, বাবা ?"

চমকে' ডানদিকে ফিরলেম। প্রকাণ্ড পাকা দাড়ি, তুলোর টুপিতে বালাপোষে সেলাইয়ে আঁটা গা মাথা সোজা দাঁড়িয়ে, হাতে মোটা বাঁকা লাঠি, চোক দুটি শিশিরে ভিজানো স্নেহে ভরা।

মাথা নেমে এল। পুতুলটা রুমালে বাঁধতে বাঁধতে জানালেম নমস্কার করে, রায়পুর জ্যোতিবাবুদের বাড়ী এসেছি, যাব কোন্ পথে ?

"ও!"

দু'জনেই উঠলেন বলে'।

"তাই বুঝি মূর্ত্তি কুড়ুচ্ছিলে ? জ্যোতি তো ক'বার নিয়েছে। বেশ, কলকেত্তায় ওসব থাকবে ভালো। নাও। ওই পাকা পথ ধরে, এসো সোজা উত্তরে যাবে রায়েদের বাড়ী।"

যেন বালাপোষ ফুঁড়ে হাত একখানি ছুটে এসে আমায় টেনে নিলে বুকের আড়ালে, বোধ হয়, যেমন করে পাখীর উড়ন্ত ডানা সাথে করে নেয় ছানাকে উড়তে শেখাবার বেলায়।

পাকা পথ অবধি চললেম, মনে হচ্ছে ঠিক ঠাকুর্দ্দার বিছানায় ঘুমুচ্ছি। পাথরের পুতুলের সবুজ মায়াপুরীতে।

লাল পাকা পথ। চারদিকে বিপুল সবুজের নাচ। পথে উঠে চমক ভাঙ্‌ল। শব্দ হল মাথার উপর দিয়ে "এগিয়ে গিয়ে দিয়ে আসব কি, বাবু ?"

"হো! হো!" করে একরাশ হাসি হিমেল হাওয়া তাতিয়ে দিলে দুধশাদা দাড়ির কাশবন উলটপালট করে দিয়ে এসে।

"বলছিস্ যত্ন ! ও বয়েসে যে আমরা সাত গাঁ সহর ঘুরে এসেছি শুধু পায়ে রে !"

প্রায় সিকিখানা খাটো হয়ে গেল লম্বা মানুষটি। আমি তার হাতে ধরে বললেম, "মাপ করো আমায়, দেখবে ভাই, আমি ঠিক পৌঁচেছি,—এই তো সোজা উত্তর পথ !"

শাদা দাড়ি উড়িয়ে আর দুলিয়ে দিয়ে হাসি এল "জেনো, দুপুর গড়াতেই খবরটা নেবো আমি।"

খোলা হাসির নিবিড় আদর আর চাপা হাসির একটি মিষ্টি চাউনি গায়ে মেখে বাস্-এর মত চললেম আমি লাল পথের নতুন কাঁকর গুঁড়িয়ে, অফুরন্ত সবুজের যেন সিনেমার ভিতর ভিতর দিয়ে।

উঠে পড়ল রোদ। দশ লক্ষ বকের পাখা বোধ হয় সবুজ সমুদ্দুরের উপর দিয়ে চলেছে। রথীশ এখন কী করছে ? ও কি পথ হারিয়ে এরকম রোদের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, না আলষ্টারে হাত পূরে' গট্‌গট্ করে গিয়ে, কুয়াসায় চাপা পড়তে পড়তে ফিরে চা খাচ্ছে জ্যোতি-দার খুকুর টেবিলে ?

মনে হল যেন আমার পুতুলটা হেসে উঠল। কখন্ ওকে একটু ভারি লাগছিল, এখন আর নয়। কী মধুর ছায়া ! শীতের মধ্যেও একটা গরমে চাপা সবুজ রাজ্য—সব শব্দ যেন স্তব্ধ হয়ে আছে আর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে—এক অরণ্যে পড়েছি ঢুকে ! দেশে মহাবন আর দেখিনি, বোধ হল কোনো মহাবনে পৌঁচেছি। পাতায় পাতায় গাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে লতায় ঝোপে, বিশাল এক এক গাছে গাছে মেশামেশি। কোথাও শিশির টপ্ টপ্ করে ঝরছে প্রায় বৃষ্টির মত, কোথাও শিশির পাতার মধ্যে জমে জল হয়ে খল্‌খল্ করে হাসছে পাখীর গানে কান পেতে রেখে। পথের লালের উপর মাঝে মাঝে রোদ পড়েছে হঠাৎ আঁকা আল্‌পনার মত—যেখানে এলেই চেয়ে থেকে, ঠিক তাকে অমনি রেখে চলতে ইচ্ছে করে, পথটুকুতে বেঁকে। টেনে নিলে এক ঝাঁক নীল-বেগুনী ফুলে মনটাকে। পথের বাঁ ধারে। থমকে' প্রায় জব্দ হয়ে গেলেম, তুলতে গিয়ে। সরু ডালে একেবারে নীলপরীখুকুর ডানার মত নুয়ে পড়ল পাতাগুলো সবুজ হয়ে ভয়ে যেন চোখের জল ছেড়ে দিয়ে—কাঁপতে কাঁপতে। ছোট্ট কাঁটায় খামচে' দিলে যেন হাতে ডালটাকে উঁচু করতে ! বাঃ রে ! পাথরে' পুতুলের দেশে ফুলগাছ কি এ না আর কিছু সত্যি ? একটা ফুল হাতে এসেছিল, তারপর আর আমি নিলেম না। হাতে পুতুল বাঁধা রুমালটার দিকে চেয়ে নিয়ে, সাম্‌নে চললেম ঝুঁকে পথটাতে—ঠিক সেইখানেই একটু সে বাঁক ফিরেছে।

এত বড় পাতা দেখিনি আগে চারাগাছের কখনো। দাঁড়ালেম বাঁক ঘুরতে। থালার চেয়েও বেশ বড়ই হবে। তিনটে পাতার আমি পারলেম না লোভ সামলাতে। বসেই আছে পাশে বড় গাছের গায়ে অদ্ভুত একটা কি পোকা, পাখাওয়ালা, উড়ল না পাতাটা গায়ে লেগেও! মাথা থেকে পিঠটে যেন দিব্যি কে ছুরি দিয়ে কেটে রেখেছে তার!

কৌতূহলে ধরলেম একটা পাতা কুড়িয়ে ওকে চেপে। কিন্তু হাসতে হল। শুকনো পোকা!! তবু ধরেছি যা হোক। বেশ দেখতে; চক্‌চকে, যেন কাঁচের মত। রথীশকে পেলে বলতেম, দ্যাখ্ আরেকটা নতুন হুইসিল্ জুটে গেল। পুরোণোটার সাথী করে দিলেম ওকে পকেটে।

একটা গরুর গাড়ী ছইয়ের ভিতরে বৌ আর ছোট ছেলে নিয়ে ক্যাঁ কোঁ করে যেন ভেঁপু শুনিয়ে সবকে চুপ করতে বলে একা এসে চলে গেল আমাকে চেয়ে দেখে, ছাড়িয়ে আসা বনের পথে।

একি! পুলের উপর উঠে যে আরেক পৃথিবীতে! ডানে আর বাঁয়ে রোদে জ্বলজ্বল্ হলুদ রংএ ছেয়ে গেছে মাঠ—তারি অচেনা দেশের মাঝে মাঝে নীলে শাদায় দোল্ খেয়ে লুকোচুরি খেলছে ভুধারটা সব!

একটা মাঠ? একটা দেশ? রোদের তুলিতে লেখা একটা ছবি?

ইচ্ছে করল এইখেনে রথীশকে এক্ষুণি জোড়া হুইসিলে ডাকি। আর জ্যোতি-দার গলা জড়িয়ে ধরে বলি তাঁকে, আমি হারলেম, পথ হারিয়ে নয় জ্যোতি-দা, কোথাকার যেন নতুন করে দেখানো পথ পেয়ে।

পুলের উপর থেকে নামলেম যখন, ঝাঁকি লাগছে হাতের পুতুলে আর পাতায়। যেন কোন্ আনন্দে মাতাল হয়ে তারা চলেছে আমার সাথে, ভুধারের গন্ধের, মৌমাছির ডাকের আর রঙের থৈ থৈ ঢেউ কেটে কেটে।

যখন পৌঁচে গেছি রায়বাড়ীতে, তখন আমার দু হাত ভারি দেখে, জ্যোতি-দা এগিয়ে নিয়েছেন আমায় আগ্‌লে'। দো-ভাঁজ করে গলায় মফ্‌লার জড়িয়ে রথীশ রয়েছে কোঁচকানো ভুরুতে হাসিমেখে আমার দিকে চেয়েই, আর খুকুর...যেন হারাণো কাউকে পাওয়া—বিষম চেঁচিয়ে!

বাড়ীর ভিতরটা দোর জুড়ে' এসে বৈঠকখানাতে গেছে জমে।

কিন্তু আর একটা চিৎকার খুকুর। লাল মাছের কাঁচের হাঁড়িটা ঘেঁসে ঠোঁটে ঠোঁটে কট্ কট্ শব্দ করছে যে পাখীর ছানাটা, তাকে দেখে।

এসেছে ও আধমরা একটা আমগাছের নীচের ছোট ঝোপের পাশ থেকে আমার আলোয়ানের ঝুলির পালকিতে চেপে। 'ক' 'খ'-র বইয়েতে ওকে কবে চিনেছি কখন, চোকে তো দেখিনি, দেখা পেয়ে অত চেনা বন্ধুর, চায়ের নেমন্তন না করে কে-ই বা পারে ? সকাল বেলাতে তা আমিও পারিনি।

রথীশ বললে হাত মুঠো করে টেবিলে চাপ দিয়ে দাঁড়িয়ে, "তুই পারিস্ সব, জানিনে তোর অসাধ্য কি আছে।"

খুকু বললে জ্যোতি-দার চেয়ারে কোলে বসে তাঁকে জড়িয়ে, বড় বড় চোক দুটো পাখীর দিকে ফিরিয়ে রেখে, "কিসের ছানা, বাবা ?"

জ্যোতি-দা বললেন হেসে ফেলে, "সন্ধ্যেবেলাই ওর কথা জানতে পারব। অমিয় আর যা ব্যাপার করে তুলেছে, এ বেলাটাতে সবাই আগে তাই শোনো।"

পাখীর ছানা তো চেনা আমাদের অনেকের, আর ব্যাপারটা কি হল ভেবে ওঠা ঠিক সহজ হল না।

"ছাখ, শেগুণ গাছ দেশে এদিকে নেই। রায়পুরে বড় জঙ্গলে যে শেগুণ গাছ জন্মেছে তা চেনে আর জানে খুব কম লোকেই। এই বড় পাতাগুলো হচ্ছে ওই গাছের। এ নিয়ে একটা কাগজে আমি লিখেছিলেম। আবার হবে সুরু। তার ফল খুব বড়ও কিছু হতে পারে।"

কিন্তু খুকু খুসী হচ্ছিল না। ছানাটা তখন বইয়ের গাদা ঘেঁসে চোক বুজে রয়েছে। খুকুর জাগা চোক, চুপ করা মুখ, সে দিকেই।

"স্যার জগদীশ যাকে জগতে বিখ্যাত করেছেন সে লজ্জাবতী লতার এই ফিঁকে বেগুণে' ফুল। গাছ যে মানুষের মতই প্রাণের সাড়া দেয়, এই লতাই বিজ্ঞানের পাতায় লিখে তা দিয়েছে। হাল্‌কা নীলে শাদায় ছোট্ট ফুলগুলো আর লাল্‌চে হলদে ফুল, তিল আর শণের। শীতের মাঠ এরা গন্ধে, মধুতে, রঙে ভরে রাখে। এই হলদে ফুল আর কাঁটা-ওয়ালা ডালটা বাব্‌লার। এইটে জলপাইএর একটা ডাল। এদের কেউই কম নয়। জগতের কাজে এদের খুব বড় ইতিহাস আছে। হুইসিলের সঙ্গে রাখা এই পোকার খোলসটি হচ্ছে ঝিঁঝিঁর খোলস। যা ডাক ঝিঁঝিঁর! ওরা পোকাদের হুইসিল বটে! কেউ বলেন, ওদের সন্তানেরাই খায় ওদের পিঠ খুঁড়ে'। কেউ বলেন ডেকে ডেকেই ওদের পিঠ ফেটে যায়। অনেক খবর আর অনেক চিন্তা আজ এই টেবিলে জড় হয়েছে।"

বড়দি বললেন "ওদিকে যে জড়সড়র ধুম লেগে গেল ও কোণে!" সবাই উঠলেন হেসে। খুকুও। বেলা বাড়ছে আর ছানাটা চোক বুজে বলের আকার ধরছে।

"কিন্তু আমরা এখন পাখা মেলছি। অনেক দূরের খবরের এবার আনাগোনা। এই পুতুল, একটু ও বড় বলেই খুকুর ওতে লোভ পড়েনি, অনেক খোঁজার পর আজ হঠাৎ এসে পড়েছে।, ইনিই আমাদের বৌদ্ধ দিনের সরস্বতী। তাঁকে বলে 'প্রজ্ঞা পারমিতা'। ওঁর এমন সুন্দর মূর্ত্তি আর একটি আছে শুধু কাবুল দেশে, এঁ-কে নিয়ে বিদ্বান্ সমাজে এবারে আনন্দের ঝর্ণা খুলে যাবে।"

রইলেম অবাক। ওগো মায়াপুতুল! আজ যে দেশ দিয়ে এনেছ তা কি ভুলব? পার তো পরীক্ষের দিনটেতে দিও ধারাজল একটুকু ছড়িয়ে।

"ও তো সরস্বতী লক্ষ্মী তুইই পেয়েছে!" হেসে উঠল রথীশ। সঙ্গে সব। আমিও।

খুকু তাকাচ্ছে।

জ্যোতি-দা বললেন "চোক বুজে থাকা কি লক্ষ্মীমন্তের লক্ষণ বল কেউ?"

"ও যে প্যাঁচার ছানা, লক্ষ্মী এলে ও-ও চোক খুলবে" বললেন হেসে মেজদি।

"প্যাঁচা?——বাবা?"

"হ্যাঁ খুকু, আমিও প্রথম দেখলেম" বললে রথীশ আমার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিধারা ঢেলে।

যেন দুজনেই জুড়ুলেম।

খুকু আঁকড়ে ধরে জ্যোতি-দাকে হি-হি করে হেসে উঠল ছানাটাকে যেন নতুন করে বিঁধে বিঁধে দেখতে থেকে!

"তা হলে বল যে সরস্বতী আর লক্ষ্মী--দিন আর রাত——এ দুজায়গাতেই আমরা চোখ খুলব, কেমন?" জিজ্ঞেস করলেন জ্যোতি-দা।

"কিন্তু কুয়াসা না কেটে গেলে নয় জ্যোতি-দা, এ ক'টা দিন পর।"

রথীশের কথায় বৈঠকখানায় হাসির শিশিরবৃষ্টি হতে লাগল।

চা'র পেয়ালাগুলো বিদেয় পেয়েছে অনেকক্ষণ। এবার দীঘীর ঠাণ্ডা জল আমাদের টানছে।

কিন্তু স্নানের কথা মনে হতেই ভুরুর ক্যাপসুল কুঁচিয়ে গলায় লেবেল আঁটা আলষ্টারের খাপে ঢাকনা খোলা অষুদের শিশির মত দাঁড়িয়ে পড়ল রথীশ চেয়ারের হাতল ধরে।

চা তো হলই ক'বার, ক্বাথও তার দু'গুণ চলেছে।

বললেম, "বরং এক ফোঁটা ব্রাইওনিয়া খেয়ে ঝাঁপিয়ে পড় এসে আমার সঙ্গে, তুই শুদ্ধ লাখ ডাইল্যুশন হয়ে সেরে যাবি সাঁৎরাবার ঠিক মাঝখানে।"

হাসলে রথীশ—"বলেছিস! দাঁড়া ভাই, গরমের দিনে আসব, সাঁতার শেখাস্।"

রেখে তেলের বাটি, খুকু এসে টানছে দুহাতে, "বা রে! বুঝি বেলা হয় নি?"

কাজেই সব সাঁতারের কসরৎ আজ তাকেই হল দেখাতে।

লোক বিকেলেই। কখন্ পৌঁচেছি এসে জানতে, আর বাড়ীর ছেলেদের কাল ডাক। মানে, জ্যোতি-দার আর আমাদের নেমন্তন।

যেন শাদা মেঘের মত মনে পড়ল, যাঁর কোলে উড়ে এসেছি আজ, ছোট্ট ঘুড়িটি।

আবার বুঝি কাটবে কিছুক্ষণ গন্ধরঙিন্ আমাদের সেই 'প্রজ্ঞাপারমিতার' মায়া-আলোর আনন্দপুরে?

সন্ধ্যের দীপ জ্বলল শীতকে ধাধিঁয়ে। বের করতেই আমাদের ধাঁধিঁয়ে উড়ে গেল প্যাঁচার ছানা খুকুর জোর হাততালির বিদেয়-মালা নিয়ে।
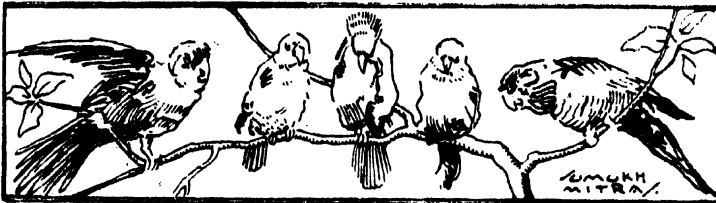
ভাল্লুকদের মংলু

ভাল্লুকদের মংলু মানুষেরই ছানা। কারণ ভাল্লুকদের ঘরেত আর মানুষের ছানা জন্মাতে পারে না। তা হলেও ভাল্লুক মা তার বাচ্চাদের বলে যে—দেখিস বাছারা মংলুকে যেন তোরা আঁচড়ে দিসনি। ওর নরম খালি গায়ে তোদের নখের আঁচড় লাগলে রক্ত বেরোবে। মংলু মানুষের ছানা হলেও তোদেরই ভাই। একই মায়ের দুধ খেয়ে মংলু মানুষ হচ্ছে। দেখছিস না ও যেদিন প্রথম এল নরম নরম কচি হাতে আমার লোমগুলো আঁকড়ে ধরে আমার বুকের মধ্যে মুখ লুকোল একটুও ভয় পেল না? খবরদার ওকে যেন আঁচড়ে দিসনি। ওর গায়ে লোম নেই বটে, থাবাতেও নখ নেই কিন্তু দেখিস মংলু একদিন এই বনের রাজা হবে। ওর চোখদুটো দেখিস না? যখন একদৃষ্টে ও আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকে তখন আমার শুদ্ধ বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। আমি চোখ সরিয়ে নিই। ওর চোখে কি যেন আছে বোধহয় মানুষরা যাকে আগুন বলে সেই। আগুনকে স্বাধীন জানোয়াররাও ভয় পায় কারণ ওই লাল ক্ষ্যাপাটে ঢেউগুলো যে কি করে হয় সে মানুষ ছাড়া কেউ জানে না।

ভাল্লুক মায়ের তিনটে ছানা অবাক হয়ে মা'র কথা শোনে। গুহার বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ে। বনানীর পাতা বেয়ে জলের টুপ টাপ শব্দ। দূরে ধোঁয়াটে গারো পাহাড়ের মাথায়, আগ্নেয় গিরির পাহাড়ের মুখে সীসে-কালো ধোঁয়ার মত একটা বিরাট কালো মেঘের চাপ। ভাল্লুকদের বাচ্চা তিনটে মায়ের গায়ের উষ্ণতাটুকু ভাল করে অনুভব করবার জন্যে আরো ঘেঁসে আসে।

বড় ভাই কালা বলে ওঠে—ওমা মংলু আমায় ঠেলে দিল।

ভাল্লুক মায়ের বুকের কাছে মংলু—এতটুকু মানুষের ছানা, তার কচি হাত দিয়ে কালার পিঠে থাবড়াতে থাবড়াতে কচি গলায় বলে—তা-তা-তা—

—ওমা মংলু আমায় মারছে।

ভাল্লুক মা বলে—থাক থাক কিছু বলিস নি যেন। ছেলে মানুষ ওকি জানে? এই জলে ঝড়ে ওর শীত করছে গায়েত আর আমাদের মত লোম নেই!

মেঘে আর চাঁদে লুকোচুরি খেলা চলছে

ভাল্লুক মা তার থাবা দিয়ে মংলুকে আরো বুকের কাছে টেনে আনে। তার বিশাল দেহের বুকের লোমগুলো মংলুকে আড়াল করে তার ছোট্ট শরীরটা গরম করে তোলে। মংলু চুক চুক করে ভাল্লুক মার বুকের দুধ খায়। বাইরে বনের মাথায় ঝমঝম করে বর্ষা নেচে চলে। বৃষ্টিধূসর রূপালি পর্দার আড়ালে গারো পাহাড়ের অস্পষ্ট চেহারা মুছে যায়। নীরব শান্তিতে ভাল্লুক মা আর তার বাচ্চারা বাইরের সেই বর্ষার খেলা দেখে। তাদের চোখে অন্তহীন যুগযুগান্তরের আদিম জীবনের আদিমতা।

ভাল্লুকের দলে মংলুর আসাটা একটা অদ্ভুত ঘটনা। যার জীবনের কোন আশাই ছিল না, এমনকি পাজী শেয়ালের মুখের গ্রাস থেকে নেহাৎই ভাগ্যের জোরে যে বেঁচে গেছে, তার জীবনযাত্রার সুরুটা কিছু অদ্ভুতও বটেই।

সেদিন শেষরাতে ভাল্লুকের গুহার মুখে মেঘে আর চাঁদে লুকোচুরী খেলা চলছে। সাদা-সাদা তুলোট মেঘের দল আধখানা চাঁদের ওপর দিয়ে হুহু করে ছুটে চলেছে আর সেই মেঘের সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে চাঁদ নেচে নেচে চাঁদা হাসি হেসে বলছে ছুয়ো ছুয়ো। মেঘেদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। গারো পাহাড়ের নীচে ঘুমন্ত বন দুরন্ত গ্রীষ্মে থেকে থেকে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার পাশ ফিরে শুচ্ছে যেন।

ভাল্লুক মা তার গুহায় ঘুম ভেঙ্গে উঠে প্রথমে নখদিয়ে গায়ের লোমগুলো চুলকে নিল তারপরে প্রকাণ্ড এক হাঁ করে হাই তুলল। চাঁদের আলোয় তার বড় বড় আইভরি দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল। জানোয়ারদের চমৎকার দাঁতগুলো একটা দেখবার জিনিস। তারপরে আড়ামোড়া ভেঙ্গে শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ থেকে ঘুমের কণাগুলো তাড়িয়ে ভাল্লুকমা বলে উঠল···অর্‌র্‌র্

তারপরে তার ঘুমন্ত তিনটে বাচ্চাকে ঠেলা মেরে বলল—ওঠ ওঠ শিকারে যাবার সময় হোল।

বাইরে শুকনো পাতায় একটা সামান্য খসখস শব্দ। গুহার মুখে কার যেন ছায়া পড়ল।

—কে যায়? ছানাদের আগলে ভারী গলায় ভাল্লুকমা জিগেস করল।

—ভাল্লুকদের জয় হোক! শিকার টিকার ভাল জুটুক, বলতে বলতে শেয়াল ঢুকল গুহার মুখে।

—ও শেয়ালভায়া দেখছি. কি খবর? কড়া গলায় জবাব দিল ভাল্লুকমা।

কারণ শেয়ালকে জানোয়াররা কেউ পছন্দ করেনা। শেয়ালগুলোর নিজেদের শিকার করার ক্ষমতা নেই। পরের শিকারের হাড় কুটো খেয়ে দিন চালায় নয়ত অসহায় খোঁয়াড়ে বদ্ধ ছাগলছানা মেরে চুরী করে আনে; যে সব জন্তু জানোয়ার যুদ্ধ করতে পারেনা শেয়ালের লোভ তাদের ওপর। জঙ্গলের শক্তিমান প্রাণীদের তা নিয়ম নয়। তারা যুদ্ধ করে শিকার জেতে। শেয়ালগুলো জঙ্গলের কলঙ্ক।

শেয়াল বলল—চলেছি শিকারে

—শিকারে? তুমি আবার শিকার করবে কি?

—হ্যাগো ভাল্লুকমা। বনের ধারে মানুষের গাঁয়ে কিসের মড়ক লেগেছে। সেখানে মড়াও পাওয়া যায় আর খোঁয়াড়ে ছাগলছানাও আছে। মড়কের সময় কেই বা তাদের দেখে?.

ভাল্লুকমা বলল—ছি-ছি!

—আর আখের ক্ষেতে খরগোস টরগোসও একটা মিলতে পারে।

—আখ? আখ হয়েছে নাকি? ভাল্লুকমা জিগেস করল।

—অনেক। আচ্ছা আমি আসি ভাল্লুকমা রাত বয়ে যায়। আঁধারে আঁধারে আবার ফিরে আসতে হবে। ধূর্ত্ত শেয়াল নিঃশব্দে আলো আঁধারি বনে গা ঢাকা দিল।

ভাল্লুকমা উঠল—চলরে বাছারা আজ আখ খেয়ে আসি, আখের মিষ্টি রসে শরীর চাঙ্গা হবে।

তিনটে বাচ্চাকে সামনে নিয়ে ভাল্লুকমা ডুলকি চালে বনের পথে পা বাড়াল। চাঁদ তখনও মেঘের সমুদ্রে হাবুডুবু।

ভাল্লুকরা খেয়াল খোলা ফুর্ত্তিবাজ লোক। খায়দায় মজাকরে ঘুমোয়। শিকারের সময় ছাড়া বনের পথে তাদের গলা শোনা যায়। সেই গলা শুনে ছোটখাট প্রাণীরা তাদের গর্ত্তে ঢুকে পড়ে। ভাল্লুকরা যদিও নেহাৎ খাবারের অভাব না হলে তাদের শিকার করে না, তাহলেও ভীতু প্রাণীদের ভয় যায় না। তাদের সবেতেই ভয়। ভাল্লুকরা গান গাইতে গাইতে চলে গেলে, খরগোস তার গর্ত্ত থেকে মুখ বার করে সেই পথে জুল জুল করে চেয়ে থাকে। গাছের পুরোণ বক্কলে বসে কাঠবেড়ালী কুটুরকুটুর করে বাদাম খায়। ময়ূর

গাছের শাখায় পাখা মেলে। ভাল্লুকমা তার বাচ্ছাদের জঙ্গলের নিয়ম অনুসারে শিকারের সঙ্গে পথের গান ও শেখায়। ভাল্লুকরা বনের মহাজ্ঞানী। দেবদারু শাল তমাল হিজল গাছের বনে জড়াজড়ি। তারি ছায়ায় যেতে যেতে ভাল্লুকমা বলে উঠল—কইরে বাছারা চুপচাপ কেন? আমরাত শিকারে যাচ্ছিনা মিছিমিছি ছোট জানোয়ারদের ভয় দেখিয়ে লাভ কি? গলা ছাড় দেখি কেমন শিখেছিস?

ভাল্লুকের বাচ্ছারা গলা ছাড়ল ঃ

ফুর্ত্তিসে চল, ফুর্ত্তিসে চল
বন ঝরণায় নামল ঢল,
বাদুড় পাখায় রাত নিভেছে
চাঁদ ঢেকেছে মেঘের দল।
গড়াগড়ি দে, গড়াগড়ি দে
আখের মধুরা ডাকছে যে
চিতার ডাকে বন যে কাঁপে
নখের ধারটা শানিয়ে নে।
বন সম্বর জলায় নাচে
বাঘভায়া তার পেছনে আছে
গাছের আড়ালে ধূর্ত্ত শেয়াল
সামাল দে ভাই সামাল দে।

গানের তালে তালে ভাল্লুকি পায়ে পথ কাবার। সামনে চাষাদের চাষের ক্ষেত। ক্ষেতের ওপর মাচায় সেদিন পাহারাদার নেই। তবু ভাল্লুকমা বাতাসে নাকটা তুলে শুঁকে শুঁকে দেখল কাছাকাছি মানুষ আছে কিনা। মানুষের গন্ধ নেই কিন্তু কি যেন একটা ভাপসা পচা গন্ধ ভেসে আছে বাতাসে। শেয়াল বলেছিল গাঁয়ে মড়ক লেগেছে তাই কি? ভাল্লুকমা আর কিছু না বলে আখ চিবুতে সুরু করল, শুধু একবার সে বাচ্ছাদের সাবধান করে দিয়েছিল—দেখিস বাছারা যেন বেশী শব্দ করিস নি।

আকের ক্ষেতের ধারে চাষাদের কয়েকটা কুঁড়ে ঘর। কয়েকঘর সামান্য সরল চাষা সামান্যভাবে চাষবাস করে এই বনের ধারে দিন গুজরাণ করত। তাদের আশাও সামান্য অভাবও সামান্য—দিন কেটে যাচ্ছিল একরকম। হঠাৎ কে জানে কোন দানোর অভিশাপে (উচ্চ আসামের অশিক্ষিত চাষাদের ধারণা যা কিছু অমঙ্গল সব কিছু কোন অশরীরী দানোর অভিশাপ) গাঁয়ে মড়ক নামল। সহর হলে, বা এ গ্রাম যদি সহরের কাছাকাছিও হোত তা হলেও কলেরা বন্ধ করা এত শক্ত হোত না। কিন্তু সরল অশিক্ষিত চাষীরা রোগ থামাবার কোন রকম ব্যবস্থা না করে সুরু করল দানোদের রাজার পূজো। মড়ক এদিকে বেড়েই চলল, দানোদের রাজা ঠাণ্ডা হবার নয়। শেষে এমন হোল যে প্রায় গ্রামকে গ্রাম উজাড়। গাঁয়ের দক্ষিণ প্রান্তে বনের কিনারে যে পাহাড় ছিল সেখানেত মড়া সরাবার পর্য্যন্ত কেউ রইল না। শেয়াল আর ন্যাড়া শকুনের দল যা পারে মড়াগুলোর সদ্গতি করতে লাগল। শকুনের দলের মহা আনন্দ কারণ তারা মরা খেতেই পছন্দ করে কিন্তু শেয়ালকে

খেতে হয় বাধ্য হয়ে। শেয়াল জাতটাই কাপুরুষ। অসহায় প্রাণী ছাড়া তার শিকার করবার শক্তি নেই কিন্তু অসহায় প্রাণীদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতা না থাকুক অন্ততঃ পালিয়ে আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতা আছে। সব সময় তাও জোটে না তাই মরা জানোয়ারের পচা মাংস খেয়েই শেয়ালকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সে দিন এপাড়া সেপাড়া ঘুরে শেয়াল এই দক্ষিণ কিনারেই এসে হাজির হোল। পাড়ায় পাড়ায় মরা মানুষ পড়ে আছে কেই বা ফেলে কে কি করে? সমস্ত জগৎ থমে থমে স্তব্ধ। ঘুমন্ত মানুষেরও একটা শব্দ আছে। জীবন্ত প্রাণীরা অনুভূতির বলে তা টের পায়। কিন্তু একে বনানী পাণ্ডুর মৃতপ্রায় চাঁদের আলো মাখা রহস্যময় স্তব্ধ, তার ওপর শ্মশান গ্রামের সেই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত স্তব্ধতা! কিন্তু হঠাৎ সেই গোলমেলে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কে যেন কেঁদে উঠল—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া! শেয়াল চমকে উঠল—মানুষের ছানার গলা না? এমন কি আখের ক্ষেতে আখ চিবুতে চিবুতে ভাল্লুক মা শুদ্ধ চমকে উঠল—এই ভয়ানক মৃত স্তব্ধতার মধ্যে কাঁদে কে?

এদিকে প্রথম চমকটা কেটে গেলে শেয়াল ভাবল—অ্যাঁ মানুষের ছানা? এদিকটায়ত কোন জ্যান্ত মানুষ সে দেখেনি, তাহলে কি দৈবক্রমে কোন মানুষের ছানা এখনও বেঁচে আছে? ধূর্ত্ত ক্রূর শেয়াল পা টিপে টিপে কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে এগোল।

পূবে প্রথম পৃথিবীর ধূসর উদাস আলোর ছোঁয়াচ তখন। হু-উ-স করে প্রথম জাগা একটা শকুন নামল মড়া মানুষের গাঁয়ে। গাছের পাতা বেয়ে প্রথম শিশির টুপ করে ঝরে পড়ল। কি-ই-চ করে রাত প্যাঁচা চোখ জ্বালিয়ে উড়ে চলে গেল। তার ঘুমোবার সময় এসেছে।

—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া।

শেয়াল পা টিপে টিপে কান্না লক্ষ্য করে একটা চাষীর কুঁড়েয় উঁকি দিল। তার চোখে যে দৃশ্য পড়ল তখন, সে দৃশ্য দেখে আমরা চোখের জল সামলাতে পারতাম না। একটা ঘরে একটা ছোট্ট ছেলে হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাঁদছে—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া!

আমরা জানি ওই তার ভাষাহীন ভাষায় ডাক—ওমা ওমা ওমা! জাগোনা আমার ক্ষিধে পেয়েছে জাগোনা ওমা ওমা ওমা!

কিন্তু মা তার আর জাগবে না। মা তার পাশেই পড়ে আছে। শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত মা ছেলেকে ছেড়ে যায় নি। ক্রূর নিয়তি জোর কোরে ছেলের পাশ থেকে মার প্রাণ হরে নিয়ে গেছে। মা তার সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা।

এ দৃশ্য দেখে কার না চোখে জল আসে? কিন্তু শেয়ালের চোখে জলত এলই না বরং তার ক্রূর মন আনন্দে নেচে উঠল। ওইত অসহায় ছেলেটা পড়ে আছে, একেবারে জ্যান্ত। কতদিন সে জ্যান্ত কচি মাংস চিবোয় নি আজ হঠাৎ ভাগ্য খুলে গেছে। শেয়াল এদিক ওদিক একবার চোরের মত চেয়ে টান হয়ে দাঁড়াল লাফাবার আগে। তারপর একটা মুহূর্ত্ত। সেই মুহূর্ত্তটুকু পার হলেই আর আমাদের এ আখ্যায়িকা লেখবার দরকার হোত না। এক মুহূর্ত্তে মংলুর জীবনের শেষ হয়ে যেত, কারণ ওই ছেলেটাই যে মংলু এ তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ।

শেয়ালের পেশীগুলো ফুলে উঠেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে আলগা হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে মংলুর গলার আওয়াজ চিরদিনের জন্যে নিভে যাবে। শেয়ালের লাফান কিন্তু হোল না। তার কাপুরুষ মন হঠাৎ পেছনের একটা ক্রুদ্ধ গম্ভীর গর্জ্জনে চমকে উঠল। পেছনে ভাল্লুক মায়ের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ গর্জ্জন—গর্-র্-র্ !

শেয়াল এক লাফে পাশে সরে গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভাল্লুক মায়ের প্রচণ্ড থাবাটা নামল শেয়ালের পরিত্যক্ত জায়গায়। ভাল্লুক মা গর্জ্জে উঠল—ঘ্ ঘ্ র্ র্ !

আরও একটা মুহূর্ত্ত।

শেয়াল তারস্বরে চীৎকার করে উঠল—হুয়া হুঃ হুয়া ! আমার শিকার ! একি ভাল্লুক মা ? এত বনের নিয়ম নয় !

ভাল্লুক মা তার বড় বড় সাদা দাঁতগুলো দেখিয়ে বলল—অ র্ র্ শিকার ? এতটুকু মা হারা ছানা—তাকে শিকার ?

—কিন্তু ওত মানুষের ছানা, আমাদের চিরদিনের শত্রু—বলল শেয়াল

ভাল্লুক মা তার কাঁধের পেশীগুলো ফুলিয়ে বলল—শত্রু হয় তার সঙ্গে সমানে লড়াই করব। যে এখনও টিকটিকির বাচ্চার মত এতটুকু সে আবার শত্রু কি ?

মংলুর কান্না এদিকে জীবন্ত গলার শব্দ শুনে থেমেছিল। কতক্ষণ সে কেঁদে কেঁদেও কোন জীবন্ত গলা শোনেনি তাই প্রথমটা সে চুপ করে ছিল। তারপর ভাল্লুকমার গলা শুনে—জীবন্ত আওয়াজ শুনে, তার অভিমান বোধ হয় উথলে উঠল। সে উপুড় হয়ে ভাল্লুকমার দিকে তার কচি কচি হাত বাড়িয়ে আবার কেঁদে উঠল— ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া।

ভাল্লুকমা হাজার হোক মা; সে বলে উঠল—আহা বাছারে !

শেয়াল বলল—তা হলে মানুষের ওই ছানাটা তুমি আমায় দেবে না ? আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে ? ভাল্লুকমা মংলুর দিকে এগিয়ে গেল। মংলু একটুও ভয় পেল না। দুহাতে ভাল্লুকমার লোমগুলো আঁকড়ে ধরে তার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে খাবার জন্যে হাঁই ফাঁই করতে লাগল।

শেয়াল আবার বলল—বনের নিয়ম অনুসারে মানুষের ছানাটা আমার শিকার। ওকে দিয়ে যাও ভাল্লুকমা। আমি মুখে করে চলে যাই।

মংলু তখন চুক্ চুক করে ভাল্লুকমার বুকের দুধ খাচ্ছে। এমন কি তাই দেখে ভাল্লুকমার বাচ্চা তিনটের পর্য্যন্ত হিংসে হচ্ছিল।

—তা হলে দেবে না ? শেয়াল দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে এল। ভাল্লুকমা তার বিশাল থাবাটা উঁচু করে গর্জ্জে উঠল—আর এক পা এগিয়েছ কি শেষ !

রাগে অপমানে শেয়াল ফুলে উঠল। দাঁত বার করে সে বলল—আচ্ছা একদিন আমি দেখে নেব !

ভাল্লুকমা ডাকল—কালা !

ভাল্লুকের বড় ছেলে বলল—মা !

—ধরত পাজীটাকে।

কালা দুপায়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাঁকল—অর্ র্…

কাপুরুষ শেয়াল ভাল্লুকের ছানারই সেই যুদ্ধমান মূর্ত্তি দেখে লেজ পিছনে তুলে মারল চোঁ চাঁ দৌড়। যাবার সময় বলে গেল—আচ্ছা দেখা যাবে!

মংলু তখনও দুধ খাচ্ছে। ভাল্লুকমা তার থাবার নখগুলো ঢেকে তার নরম ন্যাংটো শরীরে থাবড়াতে থাবড়াতে বলল—আহা টিকটিকির বাচ্ছা খা, খা, আজ থেকে আমি তোর মা।

ভাল্লুকের বাচ্ছা তিনটে বলল—তুমিত আমাদের মা।

—আর ওরও মা। নারে বাছারা ওকে হিংসে করিস নি। ও মংলু, টিকটিকি, ওর মা মরে গেছে ওকে দুধ খাওয়াবার আর কেউ নেই। আমি যদি আজ মরে যাই তোদের কি হবে বলত?

বাচ্ছারা একসঙ্গে বলে উঠল—না তুমি মরবে না।

—না রে না ভয় নেই কিন্তু ওকে তোরা কিছু বলিস নি! ভাল্লুকমা মুখে করে মংলুকে তুলে নিল। একটা দাঁতও কিন্তু মংলুর সেই নরম চামড়ায় বসল না।

—চলরে বাছারা ঘরে যাই, পূবে ফর্সা হোল, সম্বররা জলায় জল খেতে আসবে তার পেছনে কালো বাঘ আছে। আকাশে চীল উঠেছে। পাহাড়ে আবার হাতী এসেছে। চল চল।

ভাল্লুকের দল ফিরল লম্বা সারে। আগে কালা তারপরে তার দুই ভাই, সবশেষে মংলুকে মুখে করে ভাল্লুকমা। ফিরতি পথে কালা গেয়ে উঠল

সারি বাধোঁ ভাই
চল ঘরে যাই
সাহসী শিকারী পথ ছাড়ো।

মায়ের বুকে
ঘুমাব সুখে
ও ভাই এবার গান ধরো।
আকাশ রেঙেছে
সকাল ভেঙেছে
বাদুড় ঝুলেছে শাল গাছে,
মহুয়া শাখায়
পেখমে পাখায়
ময়ূর ময়ূরী ওই নাচে।
হাতীর শুঁড়ে
গাছেরা পড়ে
ঘরে চলো ভাই ঘরে চলো,

সাপের ফণায়

চীলের ডানায়

বেলা হোল ভাই বেলা হোল।

ভাল্লুকের দল সদ্যজাগা বনের আলস্যমাখা পথে সার বেঁধে ফিরে চলল। তাদের পেছনে তখন আকাশে সূর্য্যি উঁকি দিয়েছে। কাঠঠোকরা সেই খবর গাছের গায়ে ঠোঁট দিয়ে ঠুকে জানিয়ে দিচ্ছে—ঠক্ ঠক্ ঠক্!

মাছরাঙা তার মরকত মণি আঁকা পোষাক পরে জলের ওপর গিয়ে বসেছে। পাখীদের মিস্ত্রী বাবুই তালগাছে তার বাসা গড়ছে। বাসায় কটা দরজা হবে এই নিয়ে তার গিন্নীর সঙ্গে বচসা, ধার্ম্মিক বক জলার ধারে স্থির। এসব পেছনে ফেলে বাচ্ছাদের সামনে রেখে মংলুকে মুখে নিয়ে ভাল্লুকমা বাসায় ফিরল। এমনি করে মানুষের ছানা মংলু ভাল্লুকদের দলে চলে এল। ছোট্ট তার প্রাণের শিখা নিভু নিভু হয়েও নিভল না। তারপরে দেখা যাক তার প্রশস্ত জীবনে কি পড়ে আছে।

খুকু তুমি একটু থামো

'স'

খুকু তুমি একটু থামো, তোমার সাথে আড়ি,
আমি বুড়ো ঠাকুরদাদা, আমি কি আর পারি !
ছোট্ট-ছুটি হাল্কা পায়ে
ভেসে চলো পবন-নায়ে,
হায়রে আমি পেতাম যদি হাওয়ার জুড়িগাড়ী
দেখে নিতাম তোমার সাথে পারি কি না পারি ।

তুমি চলো যেন ভোরের ছোট্ট প্রজাপতি
আমি চলি ঠাকুরদাদা অতি মন্দগতি,
তুমি চলো সামনে পানে
টানো আমায় আল্‌গা টানে,
আমি বলি "দাঁড়াও দাঁড়াও", তুমি ব্যস্তমতি
একটু হেসে দাঁড়িয়ে বলো "তুমি অলস অতি ।"

পক্ষীরাজের পাখা বাঁধা আছে তোমার পায়ে !
মন-পবনের পরশ লাগে তোমার চলার নায়ে !
সে মন আমি খুঁজে কি পাই !
সামনে পানে মিছেই তাকাই,
অনেকদূরে দেখতে বা পাই আকাশ শেষের গাঁয়ে,
কাদের ডিঙি ভিড়লো, ভেসে কোন্ লগনের বায়ে ।

যারা তোমার আপন বয়েস সবাই ছুটে চলে
তাদের পথে ভোরের আলো মাণিক হয়ে জ্বলে ।
তাদের পথের পাশে পাশে
ফুল ফুটে রয় গাছে গাছে,

খুকু তুমি একটু থামো

ফুলের ডালে পাখীর বাঁশী ঝর্ণা হয়ে গলে,
নাম না জানা রাখাল হাসে অচিন গাছের তলে।

যারা রঙীন হায়রে তাদের বুড়ো কেমন সাথী!
ঠাকুরদাদার আছে কি ভোর! আছে শুধুই রাতি।
পথ চলিতে তাই তো এমন
দুটি পায়ে জড়ায় স্বপন
ভোরের সোনায় হায় জ্বলেনা একটি তারার বাতি,
খুঁজি আকাশ আছে কোথায় আমার তারা সাথী।

যখন তোমার ভোরের বেলা, আমার অন্ধকার,
যখন তোমার খেলার লগন, আমার ঘুমের বার।
ঘুমিয়ে পথে তবু হাঁটি,
পায়ের তলে এ কোন মাটি!
ঠাকুরদাদার হাতের লাঠি হবে বা চুরমার,
শুধু তুমি বলো, "দাদু ভয় কি, চলো আর।"

যারা সবাই খুকুর দাদু, চমকে তারা বলে,
"হায়রে খুকু, দাদু হয়ে পথ-চলা কি চলে!"
তবু তারা ভাবে নাকি
হয়তো তুমি অচিন-সাথী'
মায়া পাখায় উড়িয়ে নেবে দূর আকাশের তলে,
যেখানেতে সাধের স্বপন মাণিক হয়ে' জ্বলে।

ছায়ামূর্ত্তি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গ্রামে পৌঁছুতে মাইল দুয়েক দেরী তখনও এমন সময় তুমুল বৃষ্টি নামল। প্রথমে ভেবেছিলুম ভিজ্‌তে ভিজ্‌তেই যাবো, কারণ বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে আমার ভালোই লাগে। কিন্তু এই অপরিচিত জনমানবহীন পথে জলে আর কাদায় মাখামাখি অবস্থায় পথ হারিয়ে মাঠে মাঠে ঘুর্‌তে হলে বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ যে সম্পূর্ণ উবে যাবে তা মনে আস্‌তেই মতটা বদলে গেল, মাথা গোঁজ্‌বার মত একটা আশ্রয়ের জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠলুম। এ দিকে প্রায়ই নীলকুঠির অনেক বড় বড় বাড়ীর জীর্ণ কঙ্কালগুলো দেখা যায়; সন্ধ্যার মৃদু আলোয় বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দূরের ঝাপ্‌সা বাড়ীটা দেখে সে রকমই কোন একটা বাড়ী বলে' মনে হল।

সত্যিই তাই। অতীত দিনের সমস্ত ঐশ্বর্য্য বাড়ীটার গা থেকে খসে পড়েছে; বড় জমীদার বংশের সুশ্রী ছেলেকে ময়লা কাপড় আর ছেঁড়া জামা পর্‌লে যে রকম করুণ দেখায় ঐ বাড়ীর বাইরেটাও সে রকম। কিন্তু আমার অবস্থা তখন বাড়ীটার চেয়েও করুণ, আকাশের কাছ থেকেও শীঘ্রই যে করুণা মিল্‌বে এ রকম কোন ভরসাও পেলুম না। উপস্থিত এই বাড়ীটাতে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় দেখ্‌লুম না।

সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে। লোকালয়ের বাইরে মাঠের ভেতর অন্ধকারময় ঐ রকম বৃষ্টির দিনে নিঃসঙ্গতা ও নির্জ্জনতা যে কি রকম অদ্ভুত এর আগে তার কোনও স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না। সমস্ত মন অকারণেই ছম্‌ছম্ করে; আর ছাই, জীবনে যত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প শুনেছি, যতই ভাবি না কেন সেগুলো মনে করব না, ততই একটার পর একটা করে মনে পড়ে' যায়।

ক্রমশঃ অন্ধকার গাঢ় হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, বারান্দার এক ধারে অসহায় দাঁড়িয়ে রইলুম। বাতাসে চামচিকের একটা স্যাঁৎসেঁতে গন্ধ। পেছনেই বড় বড় অন্ধকার ঘরগুলো পড়ে' রয়েছে; সেগুলো খোলা কি বন্ধ, পুরোণো কাঠের দরজা ঠেলে দেখবার উৎসাহ, সত্যি বল্‌তে কি, একেবারেই আমার ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একটা খস্‌খসে শব্দে চম্‌কে পেছনে চাইলুম; পুরোণো কাঠের বিবর্ণ দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গ্যাছে আর ভুষো-মাখা একটা লণ্ঠন ওপরে তুলে একটি বুড়ো নিঃশব্দে আমাকে দেখছে। প্রথমে চম্‌কে উঠলেও ঐ

ভূষোমাখা আলো ও কঙ্কালসার বুড়োর দেখা পেয়েই মনে মনে খুসী হ'য়ে উঠলুম। কোনও একটা কথা বলার জন্যে তাড়াতাড়ি বললুম, "যা' বৃষ্টি"—

দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে নির্ব্বাক্‌ভাবে সেই বুড়ো আমার কাছে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে লণ্ঠনটা তুলে বোধকরি ভালো করে আমায় খানিক পরীক্ষা কর্‌লো, তারপর নিতান্ত আচম্‌কা হাস্‌তে লাগলো, "আশ্রয়...হাঃ-হাঃ...তারপর তেম্‌নি আচমকা গম্ভীর হয়ে মুখটা ভারী করে বল্‌লে, "তা, ভেতরে এসো। কিন্তু জায়গাটা হয়তো তোমার সহ্য হবে না!" বুড়ো দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল, তার দেহের প্রতিটি নড়াচড়া ঠিক যেন কলের মানুষের মত!

অনেকক্ষণ পরে আলো ও মানুষের দেখা পেয়ে সত্যিই আমি বেশ খানিকটা উৎসাহ পাচ্ছিলুম। তাই সে সব দিকে নজর না দিয়ে বুড়োর পেছন পেছন চললুম। বিরাট বড় বড় সব ঘর, অনেক ভাঙা জিনিষের আবর্জ্জনায় ভরা; সেই ভূষো-মাখা লণ্ঠনের মৃদু লাল আলোয় পলেস্তরা-খসা দেওয়ালের গায়ে যেন অদ্ভুত ধরণের ছায়ারা সব ঘোরাঘুরি করছে! আব্‌ছা আলোয় গোটা তিনেক বেশ বড় বড় ঘর পেরিয়ে অবশেষে বাড়ীর পেছনের অংশে এসে' পৌঁছুলুম। বুড়ো সামনের ঘরের দরজাটা খুলে যন্ত্রের মানুষের মত সেই রকম আড়ষ্টভাবে আগে ভেতরে গেল। বহু পুরোণো বিবর্ণ একটা টেবিলের ওপর বুড়ো লণ্ঠনটা রাখল। ঘরে একটিমাত্র নড়বড়ে তক্তা, ময়লা বিছানা তার ওপর আর আস্‌বাব পত্রের মধ্যে সেই টেবিলটা ছাড়া হাতল ভাঙা মাত্র আর একটি চেয়ার। সেই চেয়ারটায় আমাকে বস্‌তে বলে' বুড়ো কি রকম অস্থিরভাবে খানিক পায়চারি করতে লাগ্‌ল। হঠাৎ সামনের জানলার শাশিটা খুলে অন্ধকার বৃষ্টি-ভেজা আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

কোন রকমে আলাপ জমাবার জন্যে বল্‌লুম, "আপনি তো এতোক্ষণ এ ঘরেই ছিলেন? একা থাকতে..."

আমার স্বর শুনে সে কেমন যেন চমকে উঠলো। কথার মাঝখানেই আমাকে থামতে হল। ধীরে ধীরে সে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালো, কিন্তু আমার যেন কি রকম মনে হল— ঘাড় ফেরাতে পারে না বলেই সমস্ত শরীরটা যেন কলের মত তার ঘোরাতে হ'চ্ছে। "বল্‌ছো কি? না আমি তো এতোক্ষণ বাগানেই পায়চারি করছিলুম। তোমাকে আসতে দেখেই না গিয়ে আলো জ্বেলে আন্‌লুম।"

"এই বৃষ্টিতে আপনি বাগানে ছিলেন?" একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রশ্ন করলুম।

ততোধিক আশ্চর্য্য হয়ে সে বল্‌লে, "বৃষ্টি? বলো কি? কখন থেকে নামলো?"

আচ্ছা পাগল লোক তো! বল্‌লুম, "সে তো অনেকক্ষণ! ঘরে এসে কাপড়-জামা বদলান নি?"

অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে সে বল্‌ল, "না-না! কাপড় জামা যদি ভিজেই থাকে আপনিই শুকিয়ে যাবে!" বুড়ো তক্তাটার এককোণে কি রকম যেন আলগোছে বসল। খানিক চুপচাপ্। "আমি কিন্তু মনে কচ্ছিলুম আজ তারা নিশ্চয়ই আস্‌বে। চুপ্, কিছু শুন্‌তে পেলে কি? কতকগুলো লোকের অস্পষ্ট পায়ের শব্দ? সেই তারা, যারা আমার ছেলেটাকে নিয়ে গেল?" কান পেতে কিছু শোন্‌বার চেষ্টা করতে লাগলুম; তুমুল বৃষ্টির শব্দ, ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্; কিন্তু কেমন যেন মনে হল বাইরে কারা সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে আস্‌ছে! কে তারা? এবারে সত্যিই সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের মত এঁকে বেঁকে একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে স্রোত বয়ে গ্যাল!

"আচ্ছা, এ ঘরেও কি বৃষ্টি পড়্‌ছে?"

তার মুখের দিকে চাইতে চেষ্টা করলুম; আবছা আলোয় কিছুই বোঝা গেল না। সত্যিই সে ঠাট্টা কর্‌ছে না তো? কিন্তু উত্তর দিতেই হল। ছাতের দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "না। কেন, আপনি কি বুঝতে পারছেন না?" বুড়ো আবার সেই রকম আচমকা জোরে হেসে' উঠ্‌ল, "হাঃ-হাঃ, বয়েস হ'লেই যে সব জিনিস ঠিক ঠিক বোঝা যায় ঐ রকম কুসংস্কার মনে রেখো না! এখন যা' স্পষ্ট দেখছ, শুনছ আমার মত হলে অতটা স্পষ্ট আর দেখবে না, শুনবে না।"

আবার খানিক চুপ্‌চাপ্। "আহা তোমাকে তো কিছু খেতে দিতে পারলাম না। রান্নাঘরে কিন্তু সব জিনিসই আছে; কষ্ট করে যদি জল ফুটিয়ে নিতে পারো তা হলেই এক কাপ্ চা অন্ততঃ খেতে পাবে। আমি যখন,"একটু থেমে' সে চুপিচুপি বলতে লাগ্‌ল, "আমি যখন তোমার মত ছিলুম নিজেই চা-টা করতে পারতুম। কিন্তু এখন অনেক দূরে চলে' এসেছি, ভারি অসহায়! তাই...চুপ্‌চুপ্ কিছু শুন্‌তে পেলে কি?"

একটা নতুন সন্দেহ হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌লো! তবে কি, তবে কি...? চেয়ারেতে সমস্ত দেহটা আমার আট্‌কে গিয়েছে যেন, নড়বার শক্তি নেই।

"রাত কটা বাজে, ঘড়ি আছে?" আমাকে সে জিগ্‌গেস্ কর্‌ল।

গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না, তবু কোন রকমে জোর করে বললুম, "সোয়া নটা।"

"তা' হলে এই সবে সন্ধ্যে হল, বল? কখন সূর্য্য ডুবেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কথা তোমায় জিগ্‌গেস্ করব, আজকাল আর সূর্য্য ওঠে কি? নাকি শুধু ঠাণ্ডা কালো রাতের সময় এসেছে?"

কি উত্তর দেবো ? আমার হাত-পা ক্রমশঃ আড়ষ্ট হয়ে আস্‌ছে ! কিন্তু আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে' বুড়ো বিরাট একটা বর্ম্মা চুরুট মুখে দিয়ে দেশলাই জ্বাললো। ভাবলুম মুখটা এবার ভালো করে' দেখা যাবে। কিন্তু এত চট্‌পট্ সে মুখটা নীচু করে' চুরুট্‌টা ধরিয়ে নিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল যে তাতে ভালো করে কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না, তার মুখের জায়গায় শুধু লাল খানিকটা চুরুটের আগুন।

"হ্যাঁ, ততক্ষণ তোমাকে একটা গল্প বলি। গল্প..."আবার বিকট জোরে সে হাস্‌তে লাগ্‌ল, "গল্প ছাড়া আর কি ? কারণ তোমরা, কেউই যে আমার কথা বিশ্বাস করবে না। সাত মাস এখানে আছি ; কিন্তু কেউ কি বিশ্বাস করবে ? এ পথের যে কোনও লোককে জিগ্‌গেস্ করো না কেন, সেই বল্‌বে আমি নাকি বছর তিনেক এখানে আছি। আচ্ছা," সাম্‌নের দিকে খানিক্‌টা ঝুঁকে পড়ে তার নিষ্প্রভ নির্ম্মম চোখ দুটো দিয়ে গভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে সে বল্‌লে, "আচ্ছা, অন্যায় স্বীকার করলে কি পাপের শাস্তি কিছু কমে ?"

"কমে বলেই তো শুনেছি।"

তক্তাটার ওপর খানিক নড়েচড়ে বসে সে ধীরে ধীরে বল্‌লে, "জানো, আমি একজন খুনী ?"

ভয় পেয়ে আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম ; আবার সেই কনকনে ঠাণ্ডা স্রোত সমস্ত দেহের ভেতর বয়ে গ্যাল। আমার দিকে না চেয়েই সে বললে, "ঐ বাড়ীতে আমার আগে যে থাক্‌তো লোকটা ভালোই ছিল। কিন্তু, সত্যি বলতে কি লোকটা ঠিক সুখী ছিল কিনা বল্‌তে পারি না। কিন্তু কেন ?" কি খানিক ভেবে সে বললে, "সুখীই বা ছিল না কেন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশ আনন্দেই ছিল সে। আগে সে থাক্‌তো সহরে। কিন্তু সে শান্তি চাইতো, নির্জ্জনতা চাইতো, তাই হঠাৎ ঐ বাড়ীটা কিনে ছোট একটা ছেলেকে নিয়ে এখানে চলে এলো। ছেলেটা বেশ সুন্দর ছিল হে, আমি দেখেছি তাকে। কিন্তু এক রাত্রে, এই রকমই অন্ধকার আর নির্জ্জন ছিল সে রাতটা, কারা এসে তাকে নিয়ে গেল ! চুপ্‌চুপ্, কারুর পায়ের শব্দ পাচ্ছো কি ?" ভিজে মাঠে শুধু ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে, বাতাসে চাম্‌চিকের গন্ধটা আরও স্যাঁতসেঁতে আর ভারী হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ সে আলোটাকে একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আচ্ছা সামনের জানলার শার্শিতে তুমি নিজের কটা ছায়া দেখতে পাচ্ছো ?" জান্‌লার পাঁচটা কাঁচে আমার পাঁচটা আব্‌ছা ছায়া দেখা যাচ্ছে। ধরা গলায় বললুম, "পাঁচটা।" নিঃশব্দে হাসতে হাসতে কি রকম যেন বেসুরো গলায় বুড়ো বললে, "ঠিক। সে ভদ্রলোকও তার পাঁচটা ছায়াই দেখতে পেতো !"

চুরুটটায় আরও গোটা দুই টান দিয়ে বুড়ো বল্‌লে, "হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম; জানো সব বাড়ী ভালো হয় না। যখনই নতুন কোন বাড়ীতে উঠে যাবে আগে নিশ্চিত জেনে নিও সেটা ভালো বাড়ী কিনা। কারণ কতকগুলো বাড়া আছে......"

এতক্ষণে বাড়ী সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলুম, "ঠিক ঠিক; মেঝে হয়তো খারাপ থাকে, দেওয়ালে মারাত্মক অসুখের বীজাণু থাকতে পারে, ড্রেনে..."

বাধা দিয়ে বুড়ো বল্‌লে, "না না, সে কথা নয়। কতকগুলো বাড়ী আছে যা' সবাইকার সহ্য হয় না। বাড়ীতে যে অপদেবতা থাকে আমি তার কথা বলছি। তুমি কি একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের আভাস পাচ্ছো না এখানে?"

ভয় পেলেই যে ভয় চেপে ধরে তা আমি জানি। তাই বললুম, "কৈ, তেমন আর কি?"

"আশ্চর্য্য, সত্যিই আশ্চর্য্য," উত্তেজিত হয়ে বুড়ো বললে, "আমার আগে যে থাকতো এ বাড়ী সম্বন্ধে প্রথম প্রথম তোমার মত ধারণাই তার ছিল। এই ঘরটাও—কারণ এ ঘরটাই এ বাড়ীর সবচেয়ে অমঙ্গলের ঘর—প্রথমে তার কাছে অদ্ভুত বা ভয়ের বলে' মনে হয় নি। হ্যাঁ, যে কথা বল্‌ছিলুম; তুমি যেখানটায় বসে আছো সে ভদ্রলোক এখানটায় বসেই অনেক রাত পর্য্যন্ত পড়াশুনো করত।" বুড়ো তক্তাটা ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, তারপর যন্ত্রেব মানুষের মত আড়ষ্টভাবে নড়তে নড়তে আমার পেছনে দাঁড়ালো। চম্‌কে উঠে মাথাটা ঘুরিয়ে তার দিকে চাইলুম। বুড়ো যেই হোক, আমার পেছনে সে যে দাঁড়ায় কিছুতেই এটা পছন্দ করতে পারলুম না। আমার গায়ে হাত দিতে এসে কি জানি কেন চম্‌কে খানিকটা সে সরে গ্যালো। একটু সময় নিয়ে বললে, "না না, ভয়ের কিছুই নেই; সামনে চেয়ে দেখো; কি দেখতে পাচ্ছো?" আলোটা কিছু উজ্জ্বল হওয়ায় আমার পাঁচটা ছায়াই ভাল করে দেখা যাচ্ছে। বললুম, "সেই পাঁচটা ছায়া।" কিন্তু ক্রমশঃ আমার পক্ষে এ সব সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠছে। চেয়ার ছেড়ে দৌড়ে বাইরে চলে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছে অনুভব করলুম; এই স্যাঁৎসেঁ্যতে চাম্‌চিকের গন্ধ, ভূষোমাখা লণ্ঠনের আব্‌ছা আলো আর যন্ত্রের মানুষের মত অদ্ভুত এই বুড়োর চেয়ে অন্ধকার মাঠে একা ভেজা ঢের ভালো। কিন্তু বৃষ্টিটা আরও জোরে নেমেছে, আর সেই মুহূর্ত্তেই কাছেই কোথায় একটা বাজ পড়ল; থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল সমস্ত বাড়ীটা।

আমার পেছনে দাঁড়িয়ে বুড়ো কিন্তু বলে' চল্‌ল, "ঠিক তাই। সে ভদ্রলোকও এই রকম পাঁচটা ছায়াই দেখতো; বইয়ের পাতা ওল্টাবার সময় সে দেখতো জান্‌লার ওপাশে সেই পাঁচটা ছায়াও একসঙ্গে পাতা ওল্টাচ্ছে; হুঁকো খাবার সময়—দেখ্‌তো পাঁচটা ছায়া-

মূর্ত্তিও একসঙ্গে হুঁকো টান্‌ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা কথা কিন্তু মনে রেখো, তার নাম ছিল হরেন মুন্সী—মনে থাকবে তো? কেউ যদি তোমায় জিগ্‌গেস্‌ করে ঐ বাড়ীতে কে থাকে,

পাঁচটা ছায়ামূর্ত্তি একসঙ্গে হুঁকো টানছে

বোলো হরেন মুন্সী! কারণ কারণ, অদ্ভুত ফিস্‌ফিসে গলায় সে বলল, "কারণ কেউ জানে না যে...যে...যে...চুপ্‌! কারুর পায়ের শব্দ শুনতে পেলে কি?"

ধীরে ধীরে আরও খানিক পায়চারি করে, চুরুটে গোটা ক'য়েক সুদীর্ঘ টান দিয়ে বুড়ো বললে, "প্রথমে লোকটা ভালোই ছিল এখানে। কিন্তু তার ছেলেটা চুরি যাবার পর এ বাড়ীতে অপদেবতা আছে সে যেন বেশ বুঝতে লাগল! কারা যেন ঘুরে বেড়ায় এ ঘর থেকে ও ঘরে, বারান্দায়, ছাতে, বাগানে, যেন হাসে...যেন কথা বলে' ফিস্‌ফিস্‌ করে...! আর একটা জিনিস এবার থেকে সে লক্ষ্য করল, ওই ছায়াগুলো যেন ক্রমশঃ তার অবাধ্য হয়ে উঠছে; বইয়ের পাতা ওল্টালে সবাই হয়তো আর পাতাই ওল্টায় না; কেমন যেন একটা বেয়াড়া ভাব তাদের মধ্যে! তারপর, তারপর" গভীর ঘন গলায় সে বললে "তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাতে হরেন মুন্সী হুঁকোটায় কয়েক টান দিয়েই ছায়াগুলোর দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠল—সবচেয়ে ডান দিকের ছায়ামূর্ত্তি হুঁকোর বদলে একটা চুরুট ধরিয়ে টান্‌ছে। পর পর

পাঁচ রাত ঐ ধরণের ঘটনা ঘট্‌ল, ছ' রাতের বার আশ্চর্য্য হয়ে সে দেখ্‌ল সবচেয়ে ডানদিকের ছায়ামূর্ত্তিটা একেবারে অদৃশ্য হয়েছে! লোকটা আশ্চর্য্য হয়ে অন্য চারটে ছায়ার দিকে চেয়ে
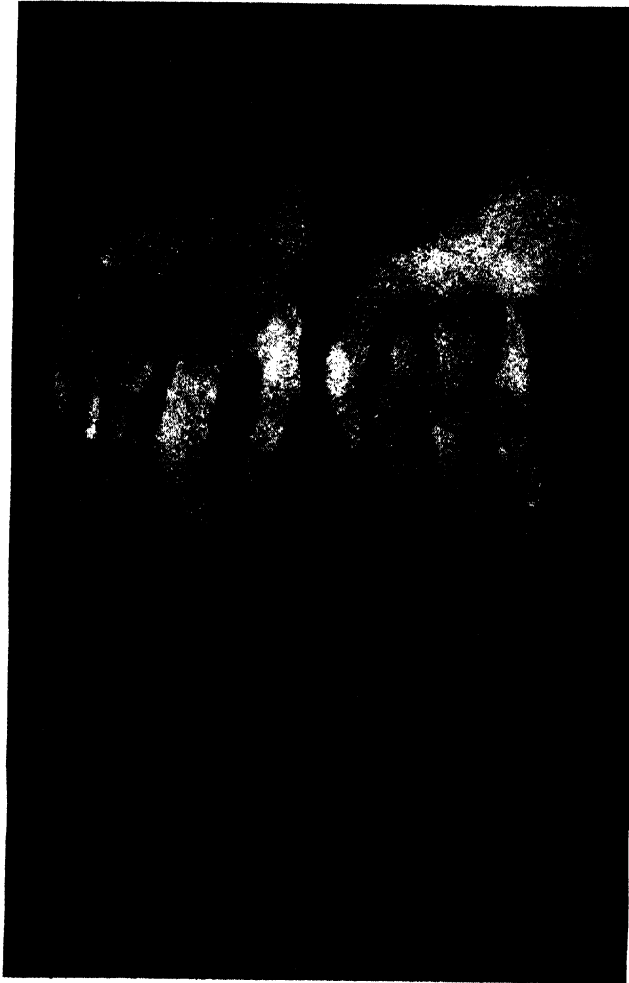
এই সেই হাত দুটো

রইল, আর অন্য চারটে ছায়াও চেয়ে রইল তার মুখে—ঠিক মুখে নয়, তার পেছন দিকে। তার পেছনে তখন বিপদ ঘনিয়ে আস্‌ছিল! তারপর হঠাৎ কে যেন তার গলা টিপে ধরল, নিঃশ্বেস বন্ধ হয়ে এলো, তারা তবু ছাড়ল না। শেষ নিঃশ্বেস ফেলার আগে লোকটার বেশ মনে আছে অন্য চারটে অবাধ্য ছায়া যেন হাস্‌ছিল!" চুরুট্‌টায় গোটা দুই টান দিয়ে

বুড়ো কানের কাছে মুখ এনে খুব ধীরে ধীরে বল্‌ল, "সে হাত কার জানো, সেই পঞ্চম ছায়া মূর্ত্তিটার!" তারপর আমার কাঁধের ওপর দিয়ে দুটো রক্তহীন ফ্যাকাশে হাত টেবিলের দিকে বাড়িয়ে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল, "এই সেই হাত দুটো, যে দুটো হত্যা করেছে; আমারই এই দুটো হাত।" উত্তেজনায় আর ভয়ে বুড়ো ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছে। "আর সেই দেহটা নিয়ে কি করলুম জানো?" আমার পেছন থেকে ধীরে ধীরে সাম্‌নের জান্‌লাটার কাছে এগিয়ে এসে নিজের বুকে হাত দিয়ে বল্‌ল, "এই সেই দেহটা। এ দেহটাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে একটা ছায়া মূর্ত্তি!"

চেয়ার ছেড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালুম। মুখের ওপর একটা আঙুল দিয়ে বুড়ো বল্‌ল, "চুপ্‌ চুপ্‌—বাইরে কার পায়ের শব্দ! তারা এলো বুঝি!"

কিন্তু অনেকটা পাগলের মতই, তার কোন কথায় কান না দিয়ে, ছুটে সেই বাড়ীটা থেকে বেরিয়ে পড়্‌লুম।*

* কোন বিদেশী গল্পের ছায়ায়
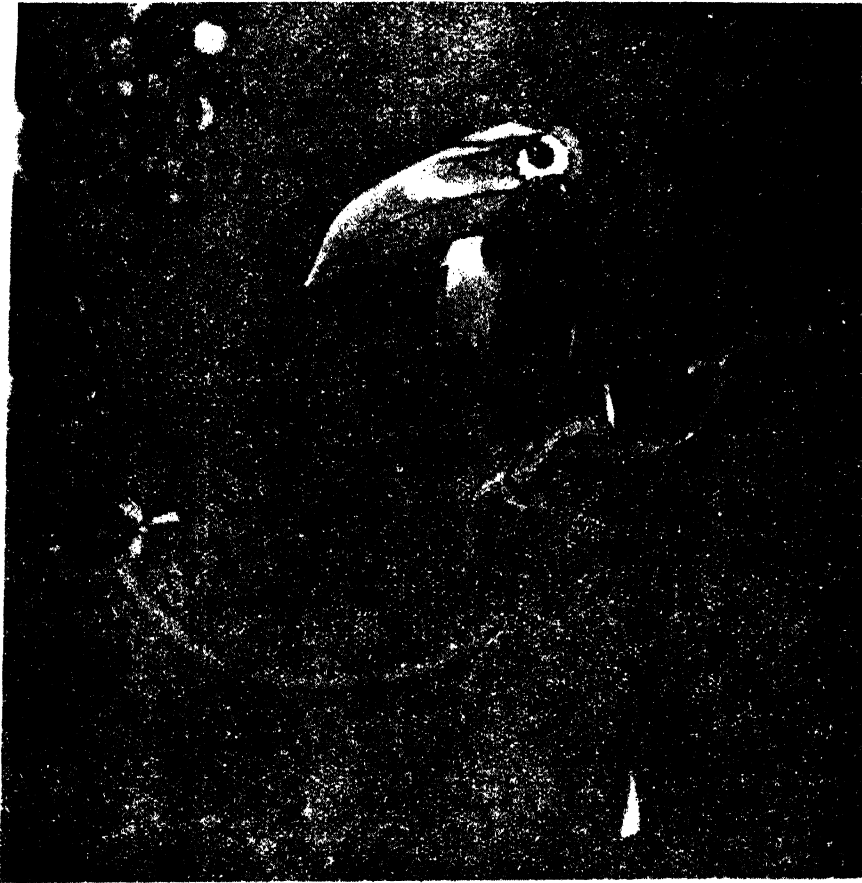
আজব পাখী

আজবদেশের তুমি নাকি পাখী ?
দ্যাখো তো আমায় তুমি চেন না কি ?
নাম কি তোমার ? দিগ্‌গজ্ পাখী
পক্ষীপঞ্চানন !

খোলো খোলো ফল ঝুলছে শাখায়,
সে দিকেতে পাখী ভুলেও তাকায় ?
ভাবছে হয়তো কোন্ ফল খায়
পণ্ডিত সজ্জন !

দুটি চোখ দেখে আঁৎ করে ছাঁৎ
চোখে যেন লেখা আছে ধারাপাত
চশমা এঁটে কি তুমি করে' রাত
পড়ো মোটা মোটা বই !

ঠোঁটটি তোমার বাঁকা তলোয়ার
বুদ্ধিটা বুঝি তাতে দাও ধার
গালটি ফুলিয়ে ভাবো পাখী আর
কে আছে বা তোমা বই !

শের আমি

মহাযুদ্ধের ঘটনা

'কান্ত লাল'

"কি জানি বাপু, ব্যাপার আমি তো সুবিধের বুঝছি না," লড়াই পায়রা 'শের আমি' দুটি ছোট্ট ডানা ঝটপটিয়ে কবুতরখোপে বসতে বসতে বললে। 'শের আমি' কেউ-কেটা পায়রা নয়, তার কথা দলের সবকটি পায়রা কাণ পেতে শোনে। তাছাড়া, তাকে ভালবাসে না, দলে এমন পায়রা নেই। 'শের আমি' নামের অর্থটা তো তুচ্ছ নয়, 'শের আমি' কথার মানে হচ্ছে 'প্রিয় বন্ধু।'

দলের ডানপিটে একটি তরুণ পায়রা গ্রীবা উঁচিয়ে বললে, "অসুবিধের কী দেখলে তুমি শের আমি! দিব্যি আছি। আগেও খেতাম, আকাশে উড়তাম, এখনও তাই।"

একটি আধবয়সী পায়রা গ্রীবা নেড়ে বললে, "নাহে না। শের আমির কথা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সত্যিই, দেশে কী যেন একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।"

আর একটি পায়রা বললে, "আমারও মনটা কেন জানি কদিন ধরে বেজায় খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের ব্যারাকের তলায় যে পল্টন থাকে, তাদের কুচকাওয়াজের আর কামাই নেই। মনে হচ্ছে একটা যুদ্ধটুদ্ধ হবে।"

দলের ডানপিটে পায়রা ভুটি-চোখ পাকিয়ে বললে, "যুদ্ধ! বলো কি খুড়ো! যুদ্ধতে ভয়ের কী আছে? দেখো দিব্যি লড়াই ফতে করে বাড়ী ফিরবো।"

শের আমি হেসে বললে, "আচ্ছা আচ্ছা। দেখা যাবে। কথাটা ভুলবনা।" তারপর শের আমি মাথাটা হেলিয়ে কী যেন ভাবতে থাকল। সন্ধ্যা ফুরিয়ে রাত এসেছে, পায়রাদের চোখের পাতায় ঘুমের সুড়সুড়ি লাগছে। চারিদিক চুপচাপ সুনসান। বক্‌বকম্, বক্‌বকম্ আওয়াজে আর রাতের কালো পর্দা কাঁপছে না।

পায়রাদের সন্দেহ মিছে নয়। সত্যিই দেশে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। ১৯১৪ সালে ইয়োরোপে লড়াইয়ের যে আগুন জ্বলে ওঠে, তার একটি শিখা ১৯১৭ সালে এসে অ্যামেরিকাকে ছুঁয়ে দিলে। অ্যামেরিকা এতক্ষণ আটলান্টিকের ওপারের যুদ্ধটা দেখছিল আর ভাবছিল, 'কি করি, কি করি।' ১৯১৭ সালে অ্যামেরিকা ঠিক করলে "নাঃ, আর চুপ করে' বসে থাকা চলে না। জার্ম্মেনী তো পৃথিবী চষে ফেললে। এবার হাতিয়ার বেঁধে নেমে যাওয়া ভালো।"

অ্যামেরিকা লড়াইয়ের খাতায় নাম লেখালে। শিকাগো সহরের এক পল্টনের উপর হুকুম এলো, "তাড়াতাড়ি জাহাজে চেপে আটলান্টিক পাড়ি দাও। জার্ম্মানীর সঙ্গে খাস ইয়োরোপের জমিতে গিয়ে লড়তে হবে।"

শিকাগো সহরের পল্টন ব্যারাকে যখন 'সাজ সাজ' সাড়া পড়ে গেছে, তখন পল্টন ব্যারাকের ছাদে কবুতরখোপে বসে 'শের আমি' দুঃস্বপ্ন দেখছে—নীল আকাশে যেন কালো কুটে মেঘ কড় কড় বজ্রের ধমক দিচ্ছে, পৃথিবী যেন জ্বলে' পুড়ে' ধোঁয়ায় কালো হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

দলের ডানপিটে পায়রা পা ছটফটিয়ে বললে, "পায়ে চিঠি বেঁধে দেবে সেই চিঠি নিয়ে পৌঁছে দিতে হবে—এতটুকু কাজে কিন্তু ফুর্ত্তি নেই, যাই বলো। কেন, মানুষে মানুষে কেমন যুদ্ধ চলছে, তেমনি পাখীদের একটা যুদ্ধ কি ছাই বাধে না। জার্ম্মাণ পায়রাদের সঙ্গে তাহলে অ্যামেরিকান পায়রাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে যেত।"

আধবয়সী পায়রা বললে, "আঃ চুপ করনা বাপু। শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে চিঠি পৌঁছে দেওয়া কাজটা কি আর তুচ্ছ হল! যে কাজের লোক তাকে যাই করতে দাও না কেন, সে সত্যিকারের কাজ করে যেতে পাবে। থামাখা চ্যাঁচানো তার স্বভাব নয়। "কি বলো শের আমি?"

শের আমি কথার কোন জবাব দিলে না। সে তখন মহাযুদ্ধর স্বপ্ন দেখছে। শত্রুর কালো আগুন আর লাল ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেছে—তার ভিতর ডাকহরকরা পায়রাদের সাদা ধবধবে ডানা চমক দিচ্ছে, এ ছবি শের আমি যেন চোখের সামনে দেখছে।

তারপর, কতদিন, কতরাত। জাহাজের দুলুনি, আটলাণ্টিক মহাসাগরের গর্জ্জন, ছোট্ট খাঁচার দমআটকানো অন্ধকার। মাঝরাতে পল্টনদের লড়াইফতের গান, গেলাসের ঠন্ ঠন্ ঝন্ ঝন্, শেষরাতে হঠাৎ জেগে ওঠা হাওয়ার আর্ত্তনাদ। তারপর একদিন জাহাজের দুলুনি থেমে যায়, ইয়োরোপের মাটিতে এসে জাহাজ আটকে যায়। খাঁচার অন্ধকার থেকে পায়রার দল বেরিয়ে আসে। তারা আবার দেখে নীল আকাশ, আকাশে সাদা মেঘের টুকরো, উড়োপাখীর দল। আকাশে দল বেধে পায়রারা শের আমির পিছু পিছু উড়ে যায়, তারপর তারা এসে নামে রোদেভরা একটা ছাতের উপর। ছাতের উপর বাসা বাঁধে তারা। রোজ সকালে পল্টনরা একবার এসে তাদের দেখে যায়।

একদিন নতুন একটি পায়রা এসে বসল ছাতের উপর। সে দিন রোদে কমলা রং ধরেছে। সেই নরম মিঠে রোদে নতুন পায়রাটিকে দেখে শের আমির মনটা যেন স্বপ্নে ছেয়ে গেল। স্বপ্নে সে দেখলে সে যেন আর একা নয়, একটী অপরূপ সুন্দর পায়রার সঙ্গে সে যেন উড়ে চলেছে অসীম নীল আকাশে। পথে পড়ল নীল পাহাড় আর ঝর্ণা, সবুজ জলের কেশর ফুলে ওঠা নদী, মেঘের ছায়া আঁকা টলটলে জল-ভরা দীঘি। সেই নীল পাহাড়ের চুড়োয় সুন্দর পায়রাটীর সঙ্গে সে যেন পাশাপাশি বসল, যেন চিরকাল পাশাপাশি বসে থাকার কী একটা আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখলে। সেই সুন্দর পায়রার সঙ্গে সে যেন ঝর্ণা নদী আর দীঘির জল খেয়ে একখানা ছায়াভরা মেঘের তলা দিয়ে অনেকদূরে আকাশের শেষে উড়ে' চলে' গেল......তারপর, তারপর......শের আমির স্বপ্ন ভেঙে গেল। সে দেখলে তার নিজের অজান্তে সেই নতুন পায়রাটির একেবারে গা ঘেঁষে পাশে এসে বসেছে সে। শের আমির পানে তাকিয়ে নতুন পায়রাটি যেন কেঁপে উঠল, তার দুটি চোখ বুজে এলো। শের আমি মিষ্টি গলায় তাকে বললে, "এসো আমার সঙ্গে।"

তারপর, একদিন ছাতের উপর শের আমির ছোট্ট খোপটায় কচি বাচ্ছাদের কান্না শোনা যায়। শের আমির দুটি চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই বাচ্ছারা যে তারই সন্তান। এদের মা— কিছুদিন আগের সেই নতুন পায়রা।

একদিন পল্‌টন দলে যেন সাড়া পড়ে' যায়। তারা রাইফেলের নল পরিষ্কার করতে লেগে যায়। খাবারের রসদ বোঝাই হতে থাকে সব বড় বড় লরী। রাক্ষুসে কামানগুলোর বিশাল চোঙার ভিতরটা সাফ করতে লেগে যায় গোলন্দাজরা। হুকুম এসেছে, এবার সীমান্তে গিয়ে লড়াই করতে হবে। জার্ম্মাণরা এগিয়ে আসছে তাদের আর এগোতে দেওয়া নয়।

ডানপিটে পায়রার আর উৎসাহের অন্ত নেই। ডানা ঝটপটিয়ে সেদিন খানিকটা সে ছাতে পায়তাড়া কষে বেড়াল। একটি প্রাইভেট খোলামাঠে বসে সামনে একখানা আয়না রেখে দাড়ী কামাচ্ছে। ডানপিটে পায়রা তার কাঁধে বসে একবার নিজের চেহারাটা দেখে নিলে। হ্যাঁ, চেহারার মত চেহারা বটে। তারপর খোসমেজাজে বাতাসে গা ভাসিয়ে সে উড়ে একেবারে শের আমির কাছে গিয়ে বলল, "শের আমি, জানো, এবার পল্‌টনদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে। কী মজা বলো তো!"

সেদিনও ছাতে কমলাফুলি রোদ। শের আমি তার সংসারটি নিয়ে বসে ছিল ছাতে। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কী একটা কথা বলতে গিয়ে তার কথা আটকে গেল। ডানপিটের মুখের পানে তাকিয়ে সে একবার সামনে তাকাল। তার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। অনেকদূরে শোনা যাচ্ছে গুম্‌গুম্ আওয়াজ, যেন অনেকদূরে পৃথিবী কেঁপে কেঁপে উঠছে—আর দিগন্তে কালো মেঘের মত ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। হঠাৎ সেই ধোঁয়ায় আগুন জ্বলে উঠল, মেঘে যেন বিদ্যুৎ।

জার্ম্মাণরা এসে পড়েছে!

তারপর হুকুমের পর হুকুম। তাঁবু উঠিয়ে, কামান আর রসদগাড়ী সঙ্গে পল্‌টন সীমান্তে এগিয়ে চলল।

শিকাগো পলটনের ৪৮০ জন সৈন্য মার্চ্চ করে চলেছে। তাদের চলার আর শেষ নেই। জার্ম্মাণরা এগিয়ে আসছে, জার্ম্মাণ কামানের আগুন আকাশে জিভ লকলকিয়ে ছুটে আসছে। আর উপায় নেই, একেবারে জার্ম্মানদের সামনে গিয়ে তাদের পথ আটকে খাঁদ খুড়তে হবে।

দুপুররাতে শিকাগো পল্‌টন একটা উৎরাই, একটা ছোট নদী পেরিয়ে খাড়াই একটা পাহাড়ের একটা ধারে পৌঁছে গেল। তক্ষুণি সদরে খবর চলে গেল, "আমরা পৌঁছে গেছি—জার্ম্মাণরা এগোয় তো আমাদের পায়ে না পিষে এগোতে পারবে না।"

শিকাগো পলটনের ৪৮০ জনের একজনের হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে। রাত ফুরিয়ে চারিদিক প্রায় ফর্সা হয়ে এসেছে। কিন্তু দূরে বাজখাই গলায় কে যেন চেঁচিয়ে একটা হুকুম দিলে। শিকাগো পল্‌টনের সেই একজন সৈন্য শিউরে উঠল। এ যে জার্ম্মান গলা! তবে কি, তবে কি তাদের অজান্তে শত্রু এসে পড়েছে?

শিকাগো পল্‌টনে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। ভয়ে দুঃখে পল্‌টন প্রায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে কী নির্ব্বুদ্ধিতাই না তারা করেছে! নিঃসাড়ে জার্ম্মাণ সৈন্যদল খাড়াই পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে

ওপাশ থেকে এসে পল্‌টনকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। জাঁতিকলে ইঁদুরের মত সারাটা দিন শিকাগো পল্‌টন ছটফট্ করল। সারাটা রাত দুঃস্বপ্ন দেখে পরদিন তারা মরিয়া হয়ে জার্ম্মাণদের আক্রমণ করলে। একবার, দুবার, তিনবার—দশবার তারা ক্ষ্যাপা মোষের মত জার্ম্মাণ ব্যূহের পাষাণ দেয়ালে ধাক্কা দিলে কিন্তু সেই জার্ম্মাণ ব্যূহ একটু টলল না,·সেই ব্যূহ ফুটো করে' শিকাগো পল্‌টনের একটি সৈন্যও ওপাশে গিয়ে পৌঁছতে পারলে না।

শিকাগো পল্‌টন মন বেঁধে ফেললে। যতদিন না সদর থেকে নতুন পল্‌টন এসে পৌঁছয়, জার্ম্মাণদের কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তাদের হাতে ধরা দেওয়ার চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো। চারিদিকে জার্ম্মাণ পল্‌টন ঘেরাও হয়ে শিকাগো পল্‌টন প্রাণ হাতে করে বেঁচে রইল। জার্ম্মাণ কামাণের আগুন শিকাগো পল্‌টনের মাথার উপর খাড়াই পাহাড়ের একটা ধারে জ্বলে জ্বলে উঠল, গভীর রাতে শিকাগো পল্‌টনের মাথার উপর হঠাৎ বোমা ফেটে পড়ল, তাদের দিন আর রাত দুঃস্বপ্নে ভরে গেল।

গুলি, গোলা, বারুদ রসদ ফুরিয়ে এলো। শিকাগো পল্‌টনের আর আশা নেই। সদরে খবর পৌঁছে দেবে কে? না হলে' সদর থেকে নতুন পল্‌টন এসে জার্ম্মাণদের হটিয়ে দিতে পারতো। বন্দী পল্‌টনকে মুক্তি দিতে পারতো। চারদিনের দিন খাবার ফুরিয়ে গেল। শিকাগো পল্‌টন ফলফলের পাতা গাছের ছাল খেতে সুরু করলে।

মস্তবড় কতকগুলো খাঁচায় করে' পায়রাদের আনা হয়েছিল। একদিন খাঁচা থেকে চারটে পায়রা বার করে' আনা হল। তাদের পায়ে চিঠি বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হবে। যদি এরা সদরে পৌঁছতে পারে।

চারটি পায়রার ভিতর একটি সেই ডানপিটে পায়রা। অহঙ্কারে তার গ্রীবা ফুলে উঠেছে। শের আমির খাঁচার সামনে দিয়ে তাকে যখন আনা হল, সে চেঁচিয়ে বললে, "শের আমি, কী মজার খেলাই না জানে মানুষ। পায়ে চিঠি বেঁধে এখন আকাশে উড়তে হবে। আগুন আর ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে ওড়া কী মজার বলো তো! যাক, ফিরে এসে সব বলবখন।"

ডানপিটের পানে তাকিয়ে শের আমির দুটি চোখ জলে ভরে উঠল।

ডানপিটে পায়রা আর তিনটি পায়রার সঙ্গে চক্কি দিতে দিতে আকাশে উঠল। তারপর আগুন আর ধোঁয়ায় তারা মিলিয়ে গেল।

কিন্তু সদর থেকে কোনো সাড়া মিললো না পায়রার দল তাহলে হয়তো অর্দ্ধেক পথেই যাত্রা শেষ করেছে। সদরে তারা পৌঁছয়নি।

একদিন শের আমি ভাবলে,···'ডানপিটে পায়রা, সে এখন কোথায়?'

সীমান্ত থেকে কিছু তফাতে সদর ঘাঁটিতে চিন্তার অন্ত নেই। শিকাগো পল্টন গিয়ে সেই যে পৌঁছ সংবাদ দিয়েছে, তারপর একেবারে চুপ। কয়েকটা দিন ফুরিয়ে গেল, শিকাগো পল্টন কোনো সাড়াই দিচ্ছে না।

সদর থেকে উড়ো জাহাজ শিকাগো পল্টনের খোঁজে বার হল। শেষে শিকাগো পল্টন একদিন উড়ো জাহাজের চোখে পড়ল। জার্মানের গোলায় দুটো উড়ো জাহাজ জলে' বিকল হয়ে পড়ে' গেল। কিন্তু উড়োজাহাজদল নাছোড়বান্দা। জার্মাণ গুলি গোলার মাঝেই ভাসতে ভাসতে তারা শিকাগো পল্টনের আস্তানা নিশানা করে' খাবার রসদ ফেলতে থাকল। শিকাগো পল্টনের চারিপাশে পাহাড়ী জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল জার্মাণরা। খাবার পল্টনদের কাছে না পড়ে সেই জঙ্গলে জার্মাণদের আস্তানায় ঝুপ ঝুপ পড়তে থাকল।

শেষে, হতাশায় শিকাগো পল্টনের মন ভেঙে পড়ল। একদিন সাহসে বুক বেঁধে পল্টনের একজন খাবারের খোঁজে পাশের জঙ্গলে চুপি চুপি ঢুকতে গেল। জার্মাণ সান্ত্রীকে সে ফাঁকি দিতে পারলে না। তারই হাতে জার্মাণরা দলের কাপ্তেনের নামে পরোয়ানা পাঠালে—'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ভালোয় ভালোয় আত্মসমর্পণ করো।'

কাপ্তেনের দুটি চোখ জ্বলে উঠলো। বটে! সার্জেন্ট মেজর বল্ডউইনকে ডেকে কাপ্তেন হুকুম দিলেন, "আস্পর্দ্দা ভাখো কুকুরগুলোর। তুমি এক্ষুনি উড়ো জাহাজের নিশানগুলোও নামিয়ে নাও। নিশানগুলোর সাদা রং দেখে আহাম্মকগুলো ভেবে না বসে আমরা সাদা নিশান উড়িয়ে দিয়েছি।"

শিকাগো পল্টন তখন ক্ষুধায় পিপাসায় হাঁপাচ্ছে। অনেকেরই তখন আর কথা কবার শক্তি নেই। তখন আর এক বিপদ সুরু হল। শিকাগো পল্টন খাড়াই পাহাড়ের দেয়ালে আড়াল হয়ে ছিল। ফরাসীরা তাদের দেখতে পাচ্ছিল না। তারা ভাবছে ওখানেও জার্মাণরাই আস্তানা গেড়েছে। ফরাসী কাপ্তেন হুকুম দিলেন, 'চালাও কামান।' আর দেখতে দেখতে ফরাসী কামানের আগুন এসে শিকাগো পল্টনকে সাপের মত ছোবল দিয়ে যেতে থাকল।

একদিন, শেষরাত। শিকাগো পল্টন একটা মুমূর্ষু অতিকায় দানবের মত অন্ধকারে ধুঁকছে। তখন দলের কাপ্তেন পায়চারী করছেন। দুটি চোখ তার কোটরে বসেছে, কপালে কালো রেখা ফুটে উঠেছে। পায়চারী করতে করতে, কাপ্তেন পায়রাদের খাঁচার সামনে হাঁটছেন। সব খাঁচা নিঝুম, চুপ। হঠাৎ একটা খাঁচায় খুব খানিকটা ডানার ঝটপটানি শোনা গেল। একটা পায়রা অস্থির হয়ে খাঁচায় পাখা ঝাপটাচ্ছে। কাপ্তেনের মুখে রহস্যের মত হাসি ফুটে উঠল। কাপ্তেন ভাবলেন, আর কেন, সব তো শেষ। পাখীটাকে ছেড়ে দেওয়া যাক।

খাঁচাটা খুলতেই পায়রাটা উড়ে এসে কাপ্তেনের হাতে বসল। কাপ্তেন তাকে নিয়ে আকাশে ছেড়ে দিলেন। পায়রাটা আকাশে না উঠে আবার তাঁর হাতে এসে বসল। কাপ্তেন পায়রাটাকে চোখের সামনে তুলে' দেখলেন। এই পায়রাটাই শের আমি, দলের সেরা পায়রা। একে কেন চিঠি দিয়ে আকাশে ছাড়া হয়নি—কাপ্তেন বুঝলেন, শের আমিকে লড়াই খেলার শেষ চাল হিসেবে রাখা হয়েছে।

ঠিক সেই সময় রাত পুইয়ে ভোরের আকাশ লাল হয়ে উঠল। কাপ্তেনের মনেও যেন কী একটা দুরাশা খানিকটা রঙের ছোপ ধরিয়ে দিলে। কাপ্তেন শের আমির পায়ে এ্যালুমিনাম মোড়া একটা চিঠি বেঁধে দিয়ে আকাশে ছেড়ে দিলেন। শের আমি চক্কর দিয়ে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে আকাশে উঠতে থাকল।

জার্ম্মাণদের রাক্ষসে কামানটা থরথর কেঁপে গর্জ্জে উঠল গুরুম্, গুম্ গুম্। শের আমির চারিদিকে যেন আগুনের ঢেউ খেলে' গেল। পাখায় যেন কে উষ্ণ বিষ ঢেলে দিলে। আর একটা আগুনের ছোবল

কাপ্তেন শের আমিকে আকাশে ছেড়ে দিলেন

এসে লাগল, শের আমি কাতর চীৎকার করে' চোখ বুজে ফেললে। আকাশে শিস দিয়ে আর একটা গোলা ছুটে এল, কে যেন শের আমিকে আগুনমুষ্টিতে লুফে নিলে। শের আমি অন্ধের মত দুচোখ বুজে উড়ে চলল। কী একটা ব্যথা তার শরীরে পাক দিলে. একবার তার মনে হল কমলাফুলি রোদেভরা ছাত, হঠাৎ পাওয়া নতুন পায়রা সাথী, তার ছোট ছোট বাচ্চারা। নীচের তাকিয়ে সে দেখলে, ছোট নদী। শের আমির বড় ইচ্ছা হল একটিবার নেমে গলাটা ভিজিয়ে নেয়, আগুন ঝলসানো ডানা দুটি জুড়িয়ে নেয়। কিন্তু, না, তা হলে সময় বয়ে যাবে। শিকাগো পল্টনের হয়তো সর্ব্বনাশ হবে।

সদর ঘাঁটির কাপ্তেন দেখলেন একডেলা রক্ত আর মাংস আকাশ থেকে পড়ল। মুমূর্ষু একটা পায়রা। কাপ্তেন পায়ে বাঁধা এ্যালুমিনাম মোড়া চিঠিখানা শশব্যস্তে খুলে নিয়ে পড়লেন: দোহাই আপনার, ফরাসীদের কামান থামান। ফরাসীদের কামানের মুখে শিকাগো পল্টন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ফরাসীদের কামান থামল। আর সেই রাত্রে ৩০৭ নম্বর পল্টন জার্ম্মান ব্যূহ ভেদ করে শিকাগো পল্টনের কাছে রসদ নিয়ে পৌছল। শিকাগো পল্টনের ৪৮০ জনের ১৯৭ জন তখনও নিঃশ্বাস নিতে পারছে। ৩০৭ নম্বর পল্টনের সঙ্গে শিকাগো পল্টন সদরে ফিরে এল।

শের আমি সেরে উঠল। কিন্তু পা তার ভেঙেছে। পাখাও আর হাওয়ায় সাড়া দেয় না। জীবনে সে আর আকাশে উড়তে পারবে না।

কিন্তু তার খাঁচার উপর সোনার তকমা এঁটে দেওয়া হল, বীরদের খাতায় তার নাম উঠলো।

তারপর একদিন, সেদিন কমলাফুলি রোদে আকাশ ছেয়ে গেছে। শের আমির সাথী বাচ্ছাদের নিয়ে এলো। একটা বাচ্ছা তার বাপকে শুধোলে, "তোমার খাঁচার উপর রোদে জলজল করছে, কী ওটা বাবা ?"

শের আমি তার সাথীর পানে তাকালে। সাথী-পায়রা বাচ্ছাকে বললে, "ওটা তোদের বাপের বীরত্বের পুরস্কার।"

ডানপিটে একটি বাচ্ছা তাই শুনে বললে, "এ আবার কী বীরত্ব! শুধু একটা চিঠি বয়ে নিতে গিয়ে ডানা পুড়ে মরা. এতে আর ফুর্তি কতটুকু! এর চেয়ে বাবা যদি লড়াই করতে পেতে তো কী মজার হোতো বলোতো!"

ডানপিটে বাচ্চার পানে তাকিয়ে শের আমির দু চোখ কেন যেন জলে ভ'রে এলো। আর একটি ডানপিটে পায়রার কথা তার মনে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে, ডানপিটে পায়রার কথার জবাবে আধবয়সী একটি পায়রা যে কথা বলেছিল তাও তার মনে পড়ে গেল।

শের আমি স্পষ্ট শুনতে পেলে সেই কমলাফুলি রোদে হাওয়ায় মিলিয়ে কে যেন তার কানে কানে বললে, 'যে কাজের লোক, তাকে সে কাজই করতে দেওনা কেন, সে সত্যিকারের কাজ করে' যেতে পারে।'

বাদশাহি গল্প

তিন

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—"দাদামশায়, ডালমুটের গল্প বল !"

—"ও কাগজের ঠোঙায় কি ?"

—"এক পয়সার মুড়ি !"

—"দাও দুটো মুখে পুরি

শোন এইবার গল্প জুড়ি !—

ডালহারা পটির ডালমুটে—আম ডালের মত মোটা মোটা কালো শক্ত তার হাত পা ! সে সোনা-মুগের ডাল মোটা মোটা গুণচটের থলিতে ভরে, অলিতে গলিতে, এপাড়ায় সে পাড়ায় বিলি করতে করতে যখন একটা থলি বাকী থাকে, আমাদের ফটকের গোড়ায় এসে জিরোতে বসে—দুপুর বেলায় ঘামতে ঘামতে। সোনা-মুগের ডালে ঠাসা চটের থলিটাকে সে একটা লাঠির ঠেকো দিয়ে বসিয়ে, নিজে মাটিতে বসে ঝিমোয়—দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে, যেন তেল চিক্‌চিক্ কন্ধকাটা দৈত্য কালো আবলুষ কাঠে কুঁদে কাটা। ভয়ে কাছে যেতে পারিনে ; একটুখানি খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে তাকে দেখি।

ইস্কুলের তখন ছুটি, গরমের দিনের দমকা হাওয়া রাস্তার ধূলোয় কখনো শুকনো বাদামপাতা, কখনো ছেঁড়াখাতার টুকরো কাগজের ঘুর্ণি ঘুরিয়ে খেলে—ডালমুটে মুখ তুলে চায়না। আমি দেখি !

ছিরে মেথরের পোষা ডালকুত্তো মাটি শুঁকে শুঁকে পায়ে পায়ে এসে ডালমুটেকে ডাক দেয়—"এউ !"

ডালমুটে জেগে উঠে বলে—"হুজুর !" তারপর নিজের ট্যাঁক থেকে সেকেলে তামার ঢিব্‌লে পয়সা বার করে ডাল কুত্তোর সামনে ফেলে দেয়। কুত্তো সেটা মুখে নিয়ে খানিক এ দাঁতে ও দাঁতে সুপুরীর মত চিবিয়ে মাটিতে ফেলে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একদিকে চলে গেল। ডালমুটে ঢিব্‌লেটা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে উঠে দাঁড়ালো গা ঝাড়া দিয়ে, লাঠির ঠেকো সরিয়ে ডালের থলিটাকে মোটা-সোটা একটা ছেলের মত পিঠে নিয়ে হন হন বেরিয়ে যায় !

—"কোথায় যায় ?"

—"তা কি জানি। রোজই দেখি এই ব্যাপার ! ঠিক দুপুর বেলায় ডালমুটেতে ডালকুত্তোতে দেখা হয় ; এ ডাকে 'এউ' একটিবার ; সে ফেলে দেয় একটি পয়সা !

মাটিতে বসে ঝিমোয়

একদিন ডালমুটের হাতে সাহস করে একটি পয়সা দিয়ে বল্লেম—"ডালমুটে আমায় একপয়সার ডাল দাওনা !"

সে বল্লে—"পেট দুখবে। অমিত্ত দাসী বোকবে বাবু !"

—"অমিত্ত দাসীকে তুমি চেনো ?"

—"হাঁ রান্নাঘরে জাঁতা ঘুরায় ঘর্ঘর, ডাল ভাঙে, আটা পিষে !"

—"আচ্ছা ডালমুটে ডালকুত্তাকে তুমি রোজ রোজ পয়সা দাও কেন ?"

—"ধরমরাজ খাপ্পা হোবে তোবে কি হোবে !" বলে সে চলতে চায় দেখে আমি বল্লেম—"ডাল দিলে না তো পয়সা ফিরে দাও !"

সে আমার হাতে পয়সাটি দিয়ে ফিরে চলে গেল। আমারও ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে গেল।

জানলার ধারে বসে দেখছি, তারপরদিন ডালমুটে তখনও আসেনি। ভাবছি পয়সা ফিরে নিতে ডালমুটে রেগেছে—বুঝিবা আর এলোনা ! নিমগাছে একটা কাক কাঠিকুটি কুড়িয়ে বাসা বাঁধছে—একটা কাঠি সে কিছুতে ঠিকমত গছাতে পারছেনা বাসায়। আমি বসে বসে সেই কাণ্ডই দেখছি, এমন সময় কুত্তো ডাকলো—'এউ'। চেয়ে দেখি ডালমুটে গাঁটের গেরো খুলছে। যেমন ঢিব্‌লে ফেলা—'লেও ধরমরাজ' বলে অমনি—"

ডালকুত্তা মাটিতে পড়েই দৌড়

—"অমনি কি হলো দাদামশায় ? চুপ করলে কেন ? বলে ফেলো !"

—"রোসো মনে করি। দাও তো আর দুটো মুড়ি গালে ফেলি !"

—"আর নেই, দেখ খালি ঠোঙা। অমনি কি হলো বলনা !"

—"যেমন্ পয়সাটি ফেলা ডালমুটে, অমনি কোথা ছিল কাক্ টপ্ করে পয়সাটি তুলে

নিল। ডাল কুত্তো—'ভউবউ'—ডেকে তুটো লাফ দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে পড়েই উঠে দৌড়।

ডালমুটে তখন কাকের দিকে চেয়ে বললে—"এ ক্যা কিয়া যমরাজ? ধরমরাজ তো খপ্পু হোগা।"

কাক 'ক্যা' বলে পয়সাটা গাছের তলায় ফেলে দিলে। ডালমুটে খুঁটের থেকে এক চিমটি চাল গাছের তলায় ছড়িয়ে দিয়ে পয়সাটি মাথায় ঠেকিয়ে কোমরে গুঁজে চলে গেল ডালকুত্তো যেদিকে গেছে—"যমরাজ ক্যা কিয়া? ধরমরাজ তো খপ্পু হোগা"—বলতে বলতে।

ডালের থলি যেখানকার সেখানে লাঠি হাতে পাঁচিলে বসে রইলো।

আমার কি মনে হলো থলিটাকে পাঁচিল থেকে উল্টে ফেলে দিই। যেমন মনে হওয়া অমনি কাজ—লাঠি শুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়লো চটের থলি, ভুপ্ করে খানিক ধুলো উড়িয়ে, খানিক ডাল ছড়িয়ে মুখ গুঁড়ে। কাকটা বাসা বাঁধছিল, 'ক্যা' 'ক্যা' বলে উড়ে পালালো। সেই সময় পাঁচিলের ওপারে শুনলেম ডালমুটে বলছে—"আরে এ ক্যা?" শুনে আমি চোঁ চোঁ চম্পট খড়-খড়ির ঘরে দোতালায়। খড়খড়ি খোলবার সাহস নেই, কান পেতে শুনছি ডালমুটে বলছে—"এ যমরাজ এ ক্যা কিয়া? ধরমরাজ খাপ্পা হুয়া! বহুৎ মাল লোকসান্—ক্যা জানে আওর ক্যা হোনেকো হায়—" বলে সে চলে গেল কি পুলিশ ডাকতে গেল জানিনে।

যমরাজের ঘাড়ে দোষ পড়েছে শুনে আমি ভয় থেকে রেয়াৎ পেয়ে সেই যে সরলুম, ডালমুটের দিকে আর মাড়াইনে, খড়খড়িও খুলিনে—পুলিসের ভয়ে!"

—"ডালের থলিটা ফেলতে গেলে কেন দাদামশায়?"

—"আরে কি জানি ভাই, থলিটা বসে আছে উঁচুতে, তাকে যে বয়ে বেড়ায় সে বসে আছে নীচুতে—দেখে সেটাকে ফেলে দিতে কেমন আমার হাত নিস্‌পিস্ করতো!"

—"তুমি তখন কত বড় ছিলে?"

—"এই তোমারই মত বয়েস!"

—"তবে পাঁচিলে হাত পেলে কি করে? এইবার তোমার বাজে কথা ধরা পড়েছে!"

—"বাজে কথা কেন হবে! তুমি পাঁচিলে উঠে বিয়ে বাড়ীর বাজনা বাদ্যি দেখ কেমন করে?"

—"তুমি গাছে চড়তে পারো?"

—"না, কিন্তু গাছে চড়ে পট্‌কান্ খেয়েছিলে সেদিন আমি দেখেছি!"

—"কখনো না. পট্‌কান্ খেতে আমি ভালোই বাসিনে। আমি ঘুড়ি পাড়তে উঠেছিলেম গাছে। আজ আর গল্প থাক দাদামশায় !"

—"আর একটুখানি আছে !"

—"না আমার ঘুম পাচ্ছে. থাক্ আজ।"

—"আরে না না বাকীটুকু না শুনলে খাপ্পা হবে ধরমরাজ। শোন বলি—"

—"না আমি শুনবো না. যমরাজ ধরমরাজ আমার ভালো লাগেনা। আমি কানে আঙ্গুল দিলুম।"

—"বেশ আমিও আর গল্প বলছিনে—নাক মল্লুম।"
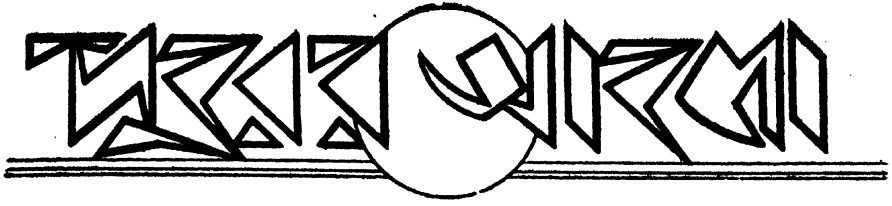
সোনার ডাক

খবরী মানুষ

সীতাদেবী একদিন সোনার হরিণ দেখে ভুলেছিলেন ; কথা উঠতে পারে, যে-সোনার হরিণ চোখ তুলে তাকায়, সবুজ বনের আড়ালে আড়ালে মিলিয়ে যায়, যে-সোনার হরিণ নিরেট পুতুল নয়, সীতা তাকে দেখে ভুলেছিলেন। এক তাল সোনার একটা পুতুল হরিণ কি আর তাঁর মন টানতে পারত ? এখানে লোভের কথা এসে পড়ে, সীতাদেবীর সঙ্গে সাধারণ তোমার আমার তুলনা ওঠে।

সে যা হোক, সোনা মানুষকে চিরকাল টানছে। মানুষের সোনার লোভের আর অন্ত নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ সোনার পিছু পিছু ফিরছে।

মানুষের টাকশালে সোনার পাহাড় জমেছে, কিন্তু তবু তার পিপাসা মেটেনি। ক্ষ্যাপা পরশপাথর খুঁজে ফিরেছে, পাথর ছুঁইয়ে এতবড় পৃথিবীকে খুশীমত সে সোনা করে নেবে ; অবধূত মন্ত্র বেঁধে আগুন জ্বেলেছে, সেই আগুনে তাল তাল লোহা সোনা হয়ে যাবে ; পাহাড় জঙ্গল ঘেঁটে মানুষ ফিরেছে, মাটির বুক থেকে সোনার চাক কেটে তুলবে সে।

সোনার সামনে মানুষের বুদ্ধি ঠিক থাকে নি—কোথায় কোন্ পাহাড়ে কোন্ এক তিথিতে চাঁদের আলোর আশ্চর্য গুণ, এক একটা পাথর চক্ষের লহমায় সোনা হয়ে যায়। বুদ্ধিমান মানুষ, সেও এই অসম্ভব গল্প বিশ্বাস করে একদিন ঘর সংসার ছেড়ে সেই একখানা সোনার পাথর কুড়োতে বেরিয়ে পড়েছে।

সোনার হাতছানিতে যত মানুষ ঘর ছেড়েছে, তাদের ভিতর খুব কম মানুষই বুঝি বা আবার ফিরেছে।

নিশির ডাকের মত সোনা মানুষকে ডেকে বলেছে 'আয়, আয়' : মানুষও কখনো 'যাই' বলতে ভোলেনি।

কালিফোর্ণিয়ায় একদিন সোনা মানুষকে ডেকেছিল, একথা কাহিনী নয় ইতিহাস। কিন্তু কাহিনীর চেয়েও বুঝি তা বিচিত্র।

কালিফোর্ণিয়ায় সোনা! স্পেইনের বুক ভেঙে গেল। কলম্বাসের আবিষ্কারের সময় থেকে, স্পেইন আমেরিকায় সোনা খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু সোনা ধরা ছোঁয়া দেয় নি। মেক্সিকোয় স্পেইনের বংশধররা রাজ্য গড়ে তুলল। তখন ইয়োরোপের পাঁচমিশেলী দল এসে নতুন মহাদেশে আমেরিকা রাজ্য আর আমেরিকান জাতের পত্তন করছে। স্পেইনের বংশধররা যুদ্ধে হেরে একদিন কালিফোর্ণিয়ার দখল ছেড়ে দিলে নতুন এই পাঁচমিশেলী জাতকে। এই ঘটনার অপেক্ষায় যেন ছিল সব—কয়েকটা দিনের ভিতর খবর রটল, কালিফোর্ণিয়ায় সোনা পাওয়া গেছে। পৃথিবীর চারিদিকে এই রটনার সঙ্গে মেক্সিকোতেও খবর পৌছল।

কালিফোর্ণিয়ায় সোনা পাওয়া গেছে! স্পেইনের বংশধররা ওষ্ঠ কামড়ে মাথা ধরে বসে পড়ল। কী বিশ্বাসঘাতক এই সোনা! খবরটা কিছু আগে পেলে তারা কি আর কালিফোর্ণিয়া ছেড়ে দেয়? আরো বেশ কিছুদিন তারা স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ চালাতে পারত।

কালিফোর্ণিয়ার সোনার ইতিহাসের সুরুটা কিন্তু মোটেই জমকাল নয়।

কালিফোর্ণিয়ায় স্যাক্রামেন্টো অঞ্চলে কেল্লা বানিয়ে ক্যাপ্‌টেইন স্যটার সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। ক্যাপটেইন একদিন কেল্লায় বসে চুরুট খাচ্ছে। তখন জেমস্ মার্শাল নামে একটি লোক ক্যাপটেইনের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে এলো।

মার্শাল নিউজার্শির বাসিন্দা, এসেছে মহাদেশের একেবারে ওপার থেকে। আধ ঘন্টার ভিতর মার্শাল আর স্যটারের ভিতর ব্যবসার কথাবার্ত্তা তুমুল জমে উঠল।

মার্শাল একটা চুরুট চেয়ে নিয়ে ধরাতে ধরাতে বললে "স্যান্ ফ্রান্‌সিস্‌কোয় সহর গড়ে উঠেছে, আশে পাশেও মানুষের বসতি বেড়েই চলেছে। কী আন্দাজ বাড়ী না তৈরী হবে! কাঠ আর তক্তার বেজায় চাহিদা, ক্যাপটেইন! কাঠের ব্যবসা ফলাও হতে এখন আর কতক্ষণ? অঢেল মুনফা মিলবে।"

স্যটার চুরুট রেখে পাইপ ধরিয়ে নিলে।

মার্শাল বুঝলে অষুধে ধরেছে। হাত পা ছড়িয়ে কাঠের ব্যবসা সম্বন্ধে খানিকটা শুনতে স্যটারের আপত্তি নেই।

মার্শাল বললে, "মাইল পঞ্চাশ ষাট সামনে এগিয়ে যেতে পারো তো বলো।"

স্যটারের মাথার পাশে কেল্লার একটা জান্‌লা দিয়ে সামনে দেখা যাচ্ছে জঙ্গল, কাছের সবুজ জঙ্গল দূরে নীল জঙ্গলে মিশে গেছে। আর সেই নীল জঙ্গল দিগন্তে যেন অমাবস্যা রাত ঢেলে দিয়েছে।

স্যটার বললে, "সামনে তো জঙ্গল দেখছি।"

মার্শাল বললে, "ঐ জঙ্গলে ঢুকে পড়তে অন্ততঃ তোমার তো ভয় পাওয়া উচিত নয়, ক্যাপটেইন।"

স্যটার ভারী গলায় বললে, "মনে ভয় থাকলেও হাতে বন্দুক থাকবে আমার। জঙ্গলে ঢুকতে বাধা নেই। কিন্তু তোমার মতলবটা কি তাই শুনি।"

মার্শাল বললে, "কাঠের ব্যবসার কথা বলছিলাম, ক্যাপটেইন। ওই জঙ্গলে একবার ঢুকে পড়তে পারলে আমাদের আর চিন্তা থাকে না। ওখানে দেদার কাঠ, কেটে উঠতে পারলে হয়।"

স্যাটার বললে, "কেন, কয়েকখানা করাত সঙ্গে নিয়ে যাবো, তাতে মুস্কিলের কী আছে ?"

মার্শাল হো হো করে হেসে দিয়ে বললে, "তা হলেই আমাদের কাঠের ব্যবসা জমবে ক্যাপটেইন—হাত দিয়ে করাত চালিয়ে কখানা কাঠ তুমি পাবে ? তাতে কটা পয়সাই বা আসবে পকেটে ? শোনো, আমি একটা ফন্দি এঁটেছি। ঐ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড়ী নদী কেটে চলেছে। স্রোতের কি তোড় ! ঐ নদীর স্রোত দিয়ে আমরা করাতের কল চালাবো। করাত শন্‌শন্ চলবে। একদিনে বছরের কাঠ কাটা হবে। চাই কি, সারাটা জঙ্গল ফেঁড়ে ফেলে স্যানফ্রানসিস্‌কোয় চালান দেওয়া যেতে পারে।"

স্যাটার বললে, "ধরে নিলেম করাত কল দিয়ে সারাটা জঙ্গলই তুমি তক্তা বানিয়ে ফেললে। কিন্তু অত কাঠ চালান দেবে কী করে—গাধা ঘোড়া তো আর অত মোট বইবেনা।"

মার্শাল বললে, "ক্যাপটেইন, তুমি কি আমায় আহম্মক ঠাউরলে ? বুদ্ধি ঠিক আছে আমার। শোনো, যে নদী করাত-কল চালিয়ে কাঠ ফেঁড়ে দেবে, সেই নদীই কাঠের চালান পৌঁছে দেবে।"

স্যাটার বললে, "কী রকম !"

মার্শাল বললে, "নদীর স্রোতে কাঠ ভাসিয়ে দেবে। দুর্দ্দান্ত নদী, স্রোত অনেক মাইল সমান চলেছে। যতদূর খুসী, কাঠের চালান অনায়াসে ভেসে যেতে পারবে। নদীর পারে পারে আমাদের ঘাটি থাকবে। কাঠের চালানের গায়ে নম্বর মারা থাকবে। কোন্ ঘাটি কোন্ নম্বর চালান পৌঁছে দেবে, ঠিক হয়ে থাকবে। নম্বর দেখে মাল তুলে ঘাটির লোকরা ঠিকানায় পৌঁছে দেবে।"

স্যাটার একগাল হেসে বললে, "চমৎকার ! আমাদের লাভ মারে কে ?"

মার্শাল বললে, "পাগল ! লাভ আবার মারবে কে ? ক্যাপটেইন, তুমি ফাঁকা পাইপ টানছ।"

মার্শাল বুদ্ধি জোগালে, স্যাটার জোগালে মূলধন আর লোক লস্কর। মার্শাল একদিন সকালে দলবল নিয়ে রওনা হল। পাহাড়ী নদী ইস্পাতের ফলার মত পাথর মাটী কেটে চলেছে, সেই খরস্রোতা নদীর ধারে ধারে মার্শাল সদলে এগিয়ে চলল। পঞ্চাশ মাইল পথের শেষে একদিন মার্শাল দেখলে, দুরন্ত নদীর স্রোত একখানা বাঁকা তলোয়ারের মত খেলছে। নদীর ধারে মার্শাল সেখানে একটা নিশান পুঁতলো। করাত কল সেখানেই বসবে।

নদীর বুকে গাছ উপড়ে, পাথর ফেলে, নদীর স্রোত বেঁধে ফেলা হল। বাধা পেয়ে স্রোত ক্ষেপে গেল, হু হু করে গিয়ে ঢুঁ মারলে করাত কলের চাকায়। চাকা ঘুরতে বিশাল করাত একটা কালো বিদ্যুতের মত খেলল শন্ শন্।

কাজ চলছে। একদিন দুপুরে মার্শাল গাছের ছায়ায় নদীর ধারে পায়চারী করছেন। নদীর স্রোত বাঁধবার সময় প্রথম যেখান দিয়ে জল ছুটে এসেছিল, সেখানটা শুকনো পড়ে আছে। স্রোত এখন ভিন্ন পথে চলেছে। সেই শুকনো নদীর বুক ভরে দুপুর রোদে কী যেন চিক চিক করছে।

মার্শাল চারি পাশে তাকিয়ে দেখে নিলে, ধারে কাছে কেউ আছে না কি। তারপর চুপি চুপি সে নেমে গেল। সোণালী রেণু, যত সম্ভব, মুঠো মুঠো পকেটে পুরে নিলেন। পাছে দলের মজুরদের চোখ পড়ে, মার্শাল সেই খানটাতে খানিক নদীর স্রোত ফিরে পাঠিয়ে দিলেন।

ক্যাপটেইন স্যাটার সেদিনও কেল্লায় বসে চুরুট খাচ্ছে। তারই পাশে টেবিলে আসর জমেছে। তখন মার্শাল এসে উপস্থিত। ক্যাপটেইন স্যাটার ভাবলে, মার্শাল তুদিনেই হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রথমটা, এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। স্যাটার মোলায়েম গলায় বললে, "এসো এসো ইঞ্জিনিয়ার। বোসো। খবর কী! একহাত তাসে আপত্তি নেই তো !"

মার্শালের মুখের 'অস্থির' ভাবটা কিন্তু স্যাটারের চোখ এড়াল না। মার্শাল সকলের অলক্ষ্যে চোখ টিপলে। স্যাটার সঙ্গীদের বললে, "তোমরা ততক্ষণ আসর জমাও। ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমি ব্যবসার কথা সেরে আসি।"

ক্যাপটেইন অফিসঘরে এসে কবাটে তালা এঁটে দিলে। মার্শাল চেয়ারে বসেছে। ক্যাপটেইন টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললে, "ব্যাপার কী মার্শাল! নদীর স্রোত বুঝি করাত-কল চালাতে নারাজ।"

মার্শাল গম্ভীর হেসে বললে, "নদী এখন করাত-কলে হুকুম খাটছে। কিন্তু করাত-কল চালানোয় আমাদের উৎসাহ শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকবে কি না ভাবছি। ক্যাপটেইন, একটা ঘটনা ঘটেছে।"

স্যাটার ভাবলে, ঘটনা—কী ঘটনা!

মার্শাল বললে, "ক্যাপটেইন, তোমাকে আজ আমি বিশ্বাস করতে যাচ্ছি। এতটা বিশ্বাস বন্ধুও বন্ধুকে করে না। ক্যাপটেইন, আমি সোনার সন্ধান পেয়েছি।"

স্যাটার খানিক গম্ভীর হবার পর হো হো করে হেসে দিলে। মার্শাল বললে, "এই হাসো ক্যাপটেইন। রঙে ওজনে হুবহু মিলে যায় সোনার সঙ্গে—বলতে চাও তুমি এগুলো হলদে পাথর কুচি!"

স্যাটার সেই হলদে রেণুর প্যাকেটটা হাতের তেলোয় নাচিয়ে একটা আন্দাজ নিলে ওজনের। সত্যিই তো, ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। মার্শাল তবে কি সোনাই কুড়িয়ে নিয়ে এলো!

স্যাটার গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। খানিক বাদে সে বললে, "মার্শাল, তুমি সোনা চেনো?"

মার্শাল বললে, "সহজ বুদ্ধিতে যাকে চেনা বলে, ততটুকু চিনি। জানোইতো আমার সোনার ব্যবসা নেই। জোর করে বলতে পারি না যে নির্ঘাৎ চিনি।"

স্যাটার জিগ্গেস করলে, "ধারে কাছে কেউ আছে সোনা চেনে?"

মার্শাল হেসে বললে, "কেল্লার মালিক তুমি, খোঁজটা তুমিই ভালো রাখো আমার চেয়ে।"

স্যাটার জবাব দিলে, "ঠিক, ঠিক।"

কাঠের ব্যবসার অংশীদার তুটি হলুদরেণুর প্যাকেটটা সামনে করে অসহায়ের মত বসে রইল।

সহসা স্যাটার বললে, "ভালো কথা! তাক থেকে ঐ মোটা পুরনো বইখানা পেড়ে আনতো ইঞ্জিনিয়ার? ঐ বইয়ে সোনা চেনার কয়েকটা সঙ্কেত আছে।"

বইয়ের একরাশ পাতা উল্টে স্যাটার আসল জায়গায় পৌঁছে গেল। লেখা আছে :—Aquafortis য়্যাসিড যত ঢালোনা কেন, সোনা যেমন তেমনই থাকবে।

স্যাটার লাফিয়ে উঠল। Aquafortis য়্যাসিড তো তার আলমারিতে এক শিশি আছে! য়্যাসিড এনে স্যাটার সেই হলুদ রেণুগুলোর গায়ে ঢেলে দিলে, সেগুলো যেমন তেমন রইল।

স্যাটার ধীরে ধীরে মুখ তুলে মার্শালের পানে তাকাল। মার্শাল একদৃষ্টে স্যাটারের পানে তাকিয়ে আছে।

স্যাটার বললে, "সোনা!"

মার্শাল বললে, "সোনা!"

কাঠের ব্যবসার দুই অংশীদার দুজনের হাত শক্ত করে চেপে ধরল। তারপর দুজনে টেবিলের দুপাশে চেয়ারে বসে পড়ল।

যাদের বুদ্ধি বেশী, প্রতি বিষয়ের খুঁটিনাটি যারা তলিয়ে দেখে, তাদের উৎসাহ সাধারণ মানুষের মত উদ্দাম উৎসাহ নয়। স্যাটার, মার্শাল দুজনেই ভাবলে, হলুদরেণুর প্যাকেটটা নিয়ে তারা এত অস্থির হয়ে পড়ছে কেন। নদীর জলে যে এমন অজস্র সোনা আছে, তার কোন অকাট্য প্রমাণ নেই। হয়তো

পাহাড়ী নদীর জল থেকে সোনা কুড়োচ্ছে

কোনো পাহাড়ের গা থেকে কিছু সোনা নদীর স্রোতে ভেসে এসেছে। কিন্তু কোন্ পাহাড়ে কোথায় সোনার স্তূপ, সে নিশানা তাদের দেয় কে? কাঠের ব্যবসা উঠিয়ে সোনার খোঁজে বার হয়ে পড়লে

হয়তো তাদের সর্ব্বনাশ হবে। হয়তো সারাজীবন মরীচিকার পিছনে ঘুরে হয়রাণ হতে হবে। তার, চেয়ে, এ বিষয়টা আপাততঃ একেবারে চেপে যাওয়া ভালো। কাঠের ব্যবসাই প্রাণপণ তাদের চালিয়ে যেতে হবে।

সেদিনই ঘোড়া ছুটিয়ে মার্শাল জঙ্গলে ফিরে এলো। মার্শাল মন বেঁধে ফেলেছে, আপাততঃ সে সোনার চিন্তা মনে আনবে না। শুতে যাওয়ার সময় রাতে ঈশ্বরকে ডেকে সে বললে, "হে ঈশ্বর, কাঠের ব্যবসা ফলাও হোক আমার। সোনার লোভ থেকে বাঁচাও আমায়।"

কিন্তু সে রাতে মার্শাল স্বপ্ন দেখলে, কোথায় করাত-কল! সেই দুরন্ত পাহাড়ী নদীর ধারে ধারে হাজার হাজার তাঁবু পড়েছে মানুষের। পৃথিবীর চারিদিক থেকে সন্ধানীরা এসেছে সোনার নিশানা পেয়ে। পাহাড়ী নদীর জল থেকে তারা সোনা কুড়োচ্ছে।

আগামীবার শেষ হবে

চুষি-কাঠি

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

গ্রামের পরে ছোট্ট কুটির ঘর,
বাছার আমার কদিন বড় জ্বর ;
কোথায় গেল গাল ভরা সে হাসি,
সোনা যেন ছড়ায় রাশি রাশি।
কতই খেলা ছোট্ট দুহাত দিয়ে,
পোড়া অসুখ ছিনিয়ে গেল নিয়ে।
কাজের ফাঁকে করতে আদর কিছু,
মুখের পরে হতাম যখন নীচু,
আলত করে ছুঁইয়ে দিতে চুমো,
আর বলিতে, 'দুষ্টু, পাজী ঘুমো,'
বন্দী হোত ছোট্ট হাতে তার
চুলের গোছা কিংবা সাড়ীর ধার।
ছাড়িয়ে নেয়া হোত বিষম দায়,
চুলোর পরে তেল বা পুড়ে যায় ;
নরম ব্যথায় 'উঃ' করে যেই উঠি,
সোনা আমার হেসেই লুটোপুটি।
চোখের পরে টলটলে নেই হাসি,
মলিনতা ঘর বেঁধেছে আসি ;
ঘুম পাড়াতে পাগল হতাম যাকে,
চোখের পাতা বুজেই শুধু থাকে।
এই যে বাবা, ওষুধটুকু খাও ;
হরি ঠাকুর, সারিয়ে ওকে দাও ;
এই যে মাণিক চাইছে দু'চোখ মেলে ;
কোথায় সোনার উঠছে ব্যথা ঠেলে !

গ্রামের পরে সাঁঝের বাতাস বয়,
সন্ধ্যা আসে, আর ত দেরী নয় ;
রুণ্‌তী নদীর জল হোল ঐ কাল,
ওপার ত আর যায় না দেখা ভাল।
তেলের প্রদীপ জ্বলছে কোলে ধীরে,
কোলের ওপর খোকা ঘুমায় ফিরে ;
কোন্ বিকেলে চোখ মেলে সেই দেখা,
ঠোঁটের কোলে মিলায় হাসির রেখা ;
সেই হতে সে চক্ষু বুজেই থাকে,
মাঝে মাঝেও দেয়না সাড়া ডাকে।
ঘুমোয় খোকা! আচ্ছা একটু ঘুমোক,
রোগের জ্বালা একটু করে জুড়োক ;
গা'টা এবার ঠেকছে ভাল যেন,
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ুক এবার যেন।

অনেক রাতে তন্দ্রা বোধ হয় ধীরে
এসেছিল চক্ষু দুটী ঘিরে ;
কোলের ওপর কিসের নাড়াচাড়া ?
ওমা! খোকন করছে কেমন ধারা ;
শুনছ, ওগো, কি ছাই ঘুমোও শুধু ?
খোকন সোনা, খাবে আমার দুধু ?
এই যে আমি, চায় না অমন করে,
একটা চুমু দেব ঠোঁটের পরে ?
চোখ থেকে তার মলিনতার ছায়া—
কাটিয়ে সেথা ফুটল হাসির মায়া,
ঠোঁটের কোণে তারি আভাস কত ;
শীতের রাতে আব্‌ছা চাঁদের মত :
উঠল বুঝি হাত দু'টী তার নড়ে,
একটা কথার আভাস ঠোঁটের পরে :-

কী ব্যগ্রতা! কিছুই বুঝি না,
বেরিয়ে এলো একটা কথা, 'মা'।

একটু দূরে রুণ্‌তী নদীর পারে,
হরি ধ্বনি উঠছে বারে বারে।
ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ি ধীরে,
স্বপন দেখি, খোকন এলো ফিরে
রুণ্‌তী নদীর রূপোর ফালি বেয়ে,
চাঁদের আলোয় সব গিয়েছে ছেয়ে।
বল্লে খোকন, 'গেলাম চাঁদের দেশ,
সবার চেয়ে মাগো তুমিই বেশ;
সেথায় আছে নূপুর রুমুঝুমু,
কিন্তু কোথায় পাব তোমার চুমু।'

ঘুম ভেঙ্গে যায়, দেখি খাটের পরে
খোকার 'চুষি কাঠি'ই আছে পড়ে।

শ্রীঅনুবীক্ষণ

ঘরের দেওয়াল বেয়ে একদল পিপড়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে চলেছে এ আমরা প্রায়ই দেখে থাকি। একদল যাচ্ছে আর একদল আসছে। যেমন দ্রুত তাদের গতি তেমনি আবার সুশৃঙ্খল। প্রকৃত পক্ষে প্রাণী জগতে পিঁপড়ের মত এমন সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খল প্রাণী খুবই কম দেখা যায়। পিঁপড়েদের যেন কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই, তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য এবং সকলে মিলে জাতের সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য বেঁচে থাকে। কেমন করে যে পিঁপড়েদের সমাজে এমন সুসংগত নিয়মাবলীর সৃষ্টি হোল সে কথা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়।

বেঁচে থাকাটাই জীবনের সব চেয়ে বড় তাগিদ। সারা বিশ্ব প্রকৃতিতে নানা মরণের খেলা চলছে। গতির যে স্ফুলিঙ্গকে আমরা জীবন বলি নানাদিক থেকে কত ভাবে যে তার পরিবর্ত্তন চলছে বলা যায় না। জীবন একভাবে একরকম প্রাণীর রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এল কিন্তু হয়ত প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলে না—ব্যস তাকে সরে যেতে হবে। এক রকম প্রাণী নিজের বাঁচবার তাগিদে অন্যরকম প্রাণীকে উচ্ছেদ করে ফেলতে পেছপাও হবে না। সমস্ত সজীব জগৎময় এই খেলাই চলছে। এর মধ্যে যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল সেই গেল বেঁচে। এই বাঁচার তাগিদেই বোধ হয় অনুভূতি বলে ক্ষুদ্র প্রাণী পিঁপড়েদের মধ্যে, এই সমষ্টিগত শৃঙ্খলা। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিয়ে এত ছোট প্রাণী বাঁচতে পারে না কিন্তু জাতীয় সমষ্টিতে তারা প্রবল।

যাই হোক, কি কথায় কি এসে পড়ল, বলছিলাম দেওয়ালে একদল পিঁপড়ে আসছে আর একদল যাচ্ছে—বেশ তারা আসুক আর যাক এর মধ্যে আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে ওরা আসা যাওয়ার মধ্যে কি কি করে। প্রথমেই নজরে পড়ে আমরা যেমন পুরোণ বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খোস গল্প আলাপ করে যাই, সাহেবরা যেমন হ্যাণ্ডশেক করে, কোন দেশের লোকেরা যেমন প্রথম সাক্ষাতে পরস্পর নাক ঘসাঘসি করে নেয়, তেমনি পিঁপড়েরা দেখি হঠাৎ দাঁড়িয়ে শুঁড় শেক করছে। ব্যাপারখানা কি? ওরা কি কথা বলে নাকি? সেটা বুঝতে হলে প্রথমতঃ আমাদের পিঁপড়েদের দৈহিক গঠন প্রণালী বুঝতে হবে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যায় পিঁপড়ের শরীরে তিনটে অংশ আছে। প্রথমে মাথা, তাতে দুটো ছোট্ট ছোট্ট অপরিষ্কার চোখ, আর সর্ব্বদা কম্পমান দুটো শুঁড়। তারপরে বুক। বুক থেকে বেরিয়েছে তিন জোড়া লম্বা লম্বা পা, সবশেষে শরীরের সব চেয়ে বড় অংশ পেট। পিঁপড়ের গলা এবং কোমর আশ্চর্য্য রকমের সরু। শরীরের তুলনায় পিঁপড়ের পা গুলো বেশ লম্বা এবং এই পায়ের সাহায্যে তারা ভীষণ দ্রুতগতিতে ছুটতে পারে। দেখা গিয়েছে পিঁপড়েরা সাধারণ ভাবেও খুব দ্রুত চলে।

একদিন আমেরিকার এক পিঁপড়ে মশাই বেরিয়েছেন, খাবারের সন্ধানেই হোক বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই হোক বলতে পারি না। এদিক সেদিক খেয়ালখোলাভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি গিয়ে উঠলেন সামনের টেবিলের ওপর। টেবিলের ওপর পড়ে ছিল একটা একফুট স্কেল। পিঁপড়ে মশায়ের কি জানি কেন স্কেলটা এত ভাল লাগল, সুড় সুড় করে তিনি একবার এদিকে যান আবার ওদিকে যান। মোটের ওপর ঘড়ি ধরে দেখা গেল তিনি এক সেকেণ্ডে যোল গজ হিসেবে ঘুরলেন। ভেবে দেখ ব্যাপার খানা, এ ছাড়া দৌড় আছে, আবার এঁরা নাকি ভয় পেলে লাফও দিয়ে থাকেন।

পিঁপড়েদের মুখ দেখে মনে হয় না যে এরা বেশ বুদ্ধিমান প্রাণী। তার কারণ অন্যান্য পোকা মাকড়ের তুলনায় তাদের চোখ বেজায় ছোট এবং জ্যোতিহীন। হবে নাই বা কেন? পিঁপড়েদের চোখের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। তাদের ঘর, জীবনযাত্রা হোল অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে। শুঁড় দুটোই তাদের অবস্থার পরিপার্শ্ব তাদের জানিয়ে দেয়। ওই শুঁড় দুটোই পিঁপড়েদের জীবনযাত্রার প্রধান সম্বল।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় পিঁপড়েদের এই শুঁড় দুটো সব সময়ে নড়ছে যেন এর দ্বারাই ওরা সব জিনিষ অনুভব করে' নিতে চায়। প্রকৃত পক্ষে শুঁড় দুটোর একটা প্রধান কাজই হোল সব জিনিষ অনুভব করে নেওয়া। পিঁপড়েদের স্পর্শেন্দ্রিয় ওই শুঁড় দুটোর মধ্যে গভীর ভাবে জাগ্রত। অন্ধ যেমন তার আঙুল দিয়ে সব কিছু স্পর্শ করে বোঝে, পিঁপড়েরাও স্পর্শ করে বুঝে নেয় তার পরিপার্শ্ব। তাছাড়া আমাদের নাকের যেমন ঘ্রাণ নেবার ক্ষমতা আছে তেমনি পিঁপড়েদের শুঁড়েরও ওইরকম একটা ক্ষমতা আছে। অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে বা মাটির নীচে, যেখানে নানা রকম প্রাণীরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, চোখের কাজ যেখানে অচল, সেখানে ওই শুঁড়ের ঘ্রাণের সাহায্যে পিঁপড়েরা নিজেদের বাসা চিনে নেয়। ওই ঘ্রাণের সাহায্যে পিঁপড়েরা স্বজাতীয়দের ঠিক করে, এমন কি নিজেদের পায়ের গন্ধও তারা টের পায় এবং বুঝতে পারে যে কোন পথে তারা এসেছে বা গেছে।
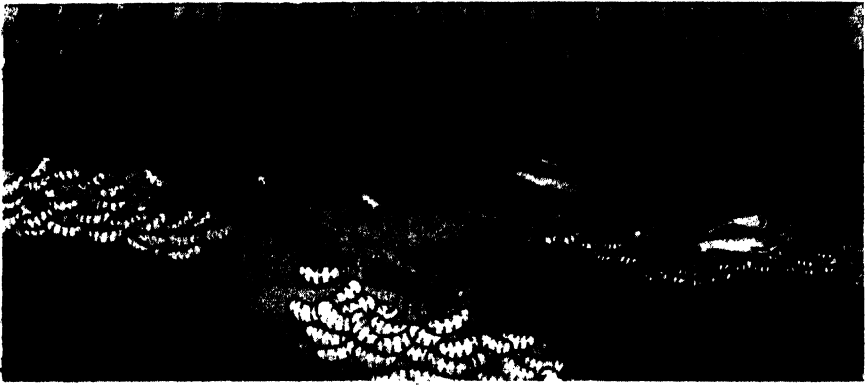
তাই যখন আমরা দেখি দুটো পিঁপড়ে শুঁড়ে শুড় লাগিয়ে আলাপ করতে ব্যস্ত তখন বুঝতে হবে প্রথমে তারা ঠিক করছে যে তারা এক জাতের পিঁপড়ে কিনা। অবশ্য এটাও বোধ হয় ঠিক যে ওই শুঁড়ের সাহায্যে কোন উপায়ে তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান চলে।

এ হেন একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গের নিশ্চয় বিশেষ যত্নের দরকার। এই শুড় দুটো বাদ দিলে পিপড়ের কোন সামাজিক অস্তিত্বই থাকে না, তখন তার বনবাসে চলে যাওয়াই ভাল।

বোধ হয় সকলেই দেখে থাকবে যে গুঁফো লোক যেমন সযত্নে তার গোঁফে তা দেয় তেমনি পিপড়েরা মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের শুঁড়গুলো চুমরে নিচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা শুড়ের গর্ব্বে যে পিঁপড়ে তার শুঁড়ে তা দিচ্ছে তা নয়, সে তার ওই দরকারী অঙ্গটা পরিষ্কার করে নিচ্ছে মাত্র। ওই শুঁড় পরিষ্কার করবার জন্যে পিঁপড়েদের পায়ে একরকম বুরুষ থাকে। সেই বুরুষ দিয়ে শুড় আঁচড়ে নিয়ে, নতুন উদ্যমে পিপড়েরা আবার ছোটে কাজে। পিঁপড়েদের সমাজে অলসতার প্রশ্রয় নেই, সকলেরই কোন না কোন কাজ আছে। এমন কি পিঁপড়েদের রাণী যাঁর ঘর গড়া, খাবার যোগাড় করা প্রভৃতি সাধারণ কোন কাজ নেই তাঁরও কাজ হোল ডিম পাড়া। দিনের পর দিন জাতি বৃদ্ধির আশায় ডিম পেড়ে যাওয়া। যাক সে কথা পরে।

মাথার তুলনায় পিঁপড়ের চোয়াল দুটো বিশাল, তাতে সার সার করাতের মত তিনকোণা দাত। চোয়াল দুটো পাশাপাশি নড়ে। এই চোয়ালই পিঁপড়ের আত্মরক্ষা এবং কাজের প্রধান সহায়। এর সাহায্যে সে খাবার সংগ্রহ করে ঘরে আনে, শক্ত খাবার পিষে ফেলে, মাটী কেটে গর্ত্ত করে, তার ছানাদের আলগা ভাবে বয়ে নিয়ে যায়।

পিঁপড়েরা বেশ উঁচুদরের ইঞ্জিনিয়ার। তাদের সহর গড়া বেশ দেখবার জিনিষ। ভেতরে বড় বড় রাস্তা, ড্রেন, ঘরবাড়ি বেশ সুশৃঙ্খল। এমন কি তাদের ময়লা ফেলার জায়গাও আলাদা।

কিন্তু পিঁপড়েদের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হোল তাদের বাচ্ছা প্রতিপালন করবার ক্ষমতা। পিঁপড়ে সমাজে সব কর্ম্মী-পিঁপড়েরাই স্ত্রীলোক। কিন্তু মাতৃত্বের অনুভূতি থেকে তারা বঞ্চিত কারণ

সব পিপড়েরাই মা হয় না। আগেই বলেছি পিপড়েদের রাণীরই কাজ হোল বংশ রক্ষা করা। ইনি সাধারণ পিপড়ে থেকে আকারে অনেক বড়। সারাদিন ইনি ঝিমোন আর দিনে ত্রুটো করে ডিম সমাজে দান করেন।

ডিম পাড়া মাত্র পিপড়ে কর্ম্মীরা তার ভার নেয় এবং যদিও মাতৃত্বের অনুভূতি তাদের নয় তবু এমন যত্ন এবং অধ্যবসায়ে তারা ডিমগুলি লালন পালন করে যে দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়।

দিনে দুটো করে পর পর ডিম পাড়া হলেও একসঙ্গে অনেক ডিম ফোটে। পিপড়ের ডিম সাধারণতঃ আঠাল। ডিম পাড়া মাত্র তাদের এক সঙ্গে গায়ে গায়ে রেখে দেওয়া হয়। ডিমের আঠাল স্বভাবের জন্যে তারা এক সঙ্গে জুড়ে থাকে, তাতে সরাবার দরকার হলে একসঙ্গে অনেক ডিম পিপড়েরা সরাতে পারে। ডিম ফোটার পর পিঁপড়ে বাচ্ছাদের মানুষ হবার অর্থাৎ পিঁপড়ে হবার আগে দুটো অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রথম অবস্থাকে বলা হয় লার্ভে (larva) এবং দ্বিতীয় অবস্থাকে পিউপে (pupa)।

লার্ভে অবস্থায় পিঁপড়ে বাচ্ছা ভারী অদ্ভুত দেখতে। ছোট্ট একটি মাথা তারপরে শরীর। এই অবস্থায় বাচ্ছাদের গলাগুলো ভীষণ ইলাষ্টিক, টেনে খুব লম্বা করা যায়। পিঁপড়েদের বাসায় বাচ্ছাদের বয়স হিসেবে আলাদা আলাদা রাখা হয় যাতে করে দলে দলে যেন সমান ভাবে বাড়তে পারে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লার্ভের গায়ে সাদা একটা আবরণ পড়ে। এই অবস্থায় তাদের দেখতে সাদা এক একটা ছোট্ট পুটলির মত। মুখের কাছটা কালো কালো, যেন সাদা পুটলির গায়ে কালো ফিতে বাঁধা। এইটাই পিউপে অবস্থা।

পিউপে অবস্থার থেকে সাদা চামড়া কেটে পিপড়ে বাচ্ছা যখন বার হয় তখন তার পিপড়ে নার্সদের মহা উৎসাহ। কেউবা তার গোটান পা গুলো টেনে টেনে সোজা করে দেয়, কেউবা দাঁড়াতে সাহায্য করে কেউবা দেয় খাইয়ে। এই সময় বাচ্ছা পিঁপড়েদের রঙ ফিকে কটা, তুলনায় চোখগুলো ভীষণ কালো। এই সময় বাচ্ছা সম্পূর্ণ অসহায় আর বোকা। কোথাও যেতে হলে পিপড়েরা এই সম্পূর্ণ বাচ্ছাদের শরীরের একটা অংশ কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যায়।

তারপর দিনের গতির সঙ্গে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ় হয়, জাগতিক নিয়ম অনুসারে বুদ্ধি বাড়ে। পিঁপড়ে সমাজে নূতুন একজন কর্মীর অভ্যুদয় হয় যারা সমাজের জন্য, জাতির জন্য মন প্রাণ ঢেলে দেবে। বাঁচার তাগিদেই পিঁপড়েরা এমনি করে দিনের পর দিন বেঁচে চলে।

আজ এই পর্য্যন্ত সাধারণ ভাবে পিঁপড়েদের জীবনযাত্রা দেখা গেল, পরে যদি সময় হয় তখন আরও ভাল করে এদের জীবনযাত্রার প্রণালী দেখা যাবে। মানুষের মত পিঁপড়েদের শ্রেণী বিভাগ আছে। তারা একদল আর একদলের ওপর আক্রমণ করে লুঠপাট করে, বন্দী করে নিয়ে এসে দাস করে রাখে। আবার শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, দল বেঁধে অন্যান্য বড় প্রাণীর ওপর চড়াও হতে পিঁপড়েরা পেছপাও নয়। সে সব ভারী আশ্চর্য্য কাহিনী। কিন্তু থাক সে সব পরে।
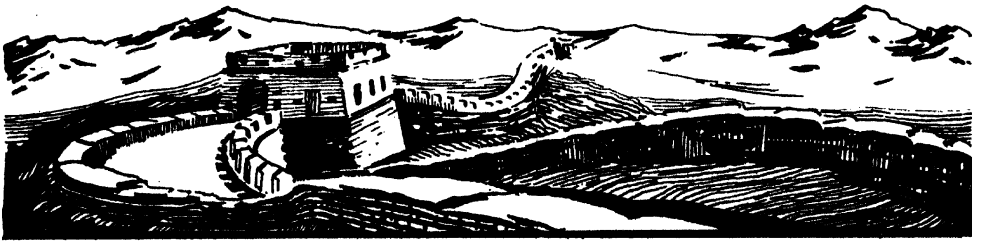
পদ্মরাগ বুদ্ধ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'

একটা অজ্ঞাত, অপার্থিব বিপদের আশঙ্কায় সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল !

এতকালের বদ্ধ আলোহারা বায়ুহারা সুড়ঙ্গপথ, সমাধির চেয়েও যা সুরক্ষিত ও সুদুর্গম, তার মধ্যে বস্তা টেনে শব্দের সৃষ্টি করছে কে বা কারা ? আর এদিকেই বা এগিয়ে আসছে কেন ? যার মধ্যে জীবন্ত জীবের আবির্ভাব অসম্ভব, সেখানে এ-কী অভাবিত ব্যাপার ?

জয়ন্ত চুপি-চুপি বললে, "মাণিক, ব্যাপার বড় সুবিধার নয়, বন্দুক তৈরী রাখো !" সুড়ঙ্গ-পথের ভিতরে তার চুপি-চুপি কথাই শোনালো চীৎকারের মত !

সুন্দরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বন্দুকই তৈরী রাখবে বটে ! এই পাতালপুরে কোন্ কুম্ভকর্ণের ব্যাটা কত শত বৎসর ধ'রে ঘুমিয়েছিল, মজার মজার স্বপ্ন দেখে আরাম করছিল, এখন অসময়ে এখানে অনধিকার প্রবেশ ক'রে দিলুম আমরা তার ঘুম ভাঙিয়ে ! বন্দুক ছুঁড়ে করবে কি ? বন্দুকের গুলিও তো হজ্‌মী গুলির মত কপ্ কপ্ ক'রে গিলে ফেলবে !"

জয়ন্ত ও মাণিক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল !

বস্তাটানার মত শব্দ ক্রমেই বেড়ে উঠছে ! সেইসঙ্গে আরও একটা বেয়াড়া আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। কে যেন মাটির উপরে দুম্-দুম্ করে খুব ভারি ভারি জিনিষ আছড়ে ফেলছে অত্যন্ত অধীর ভাবে !

জয়ন্ত এ সব শব্দের কোন হদিস্ খুঁজে পেলে না ! এ যেন কার আস্ফালনের শব্দ !

অমলবাবু রুদ্ধশ্বাসে বললেন, "জয়ন্তবাবু, সেকালে গুপ্তধন রক্ষা করবার জন্যে যক রাখা হ'ত ব'লে প্রবাদ শুনেছি ! তা কি তবে সত্য ? যে আসছে সে কি যক ?"

জয়ন্ত বললে, "পদ্মরাগ-বুদ্ধ হচ্ছেন অহিংসার দেবতা ! এখানে যক রাখা মানে একটি জীবের প্রাণবধ করা। কোন বৌদ্ধ পুরোহিত সে-মহাপাপ করতে পারেন না। যকের কথা সত্য কি না জানি না,—সত্য না হওয়াই সম্ভব, তবে সত্য হ'লেও এখানে যক কেউ রাখে নি।"

—"তবে ও কে আসছে ?"

—"ভগবান জানেন !"

এইবার ভীষণ একটা গর্জ্জন শোনা গেল ! বদ্ধ সুড়ঙ্গের আবহাওয়ায় বিকৃত হয়ে সেই ভয়াবহ ধ্বনি-প্রতিধ্বনি এমন অদ্ভুত শোনালো যে, সেটা কিসের গর্জ্জন কিছুই বোঝা গেল না।

সুন্দরবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "হুম্ ক্রমাগত চম্‌কে চম্‌কে আজ মারা পড়ব নাকি ? আমার আর সহ্য হচ্ছে না—চললুম আমি উপরে। এর চেয়ে ওপরের অন্ধকারে ব'সে ভয় পাওয়া ভালো, বনের ভাল্লুকের পেটে যাওয়া ভালো !" তিনি সুড়ঙ্গ-মুখের দিকে চোঁচা দৌড় মারলেন।

সুড়ঙ্গ-পথের অনেক দূরে, যেখানকার নিরেট অন্ধকারের গায়ে ঠেকে লণ্ঠনের আলো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, সেইখানে ফুটে উঠল বিদ্যুৎ-খণ্ডের মত দুটো জ্বলন্ত চক্ষু ! সে বিচিত্র চোখ দুটো নিষ্পলক, তার আগুন একবারও নিব্‌ছে না !

জয়ন্ত বললে, "আজ আর গোঁয়ারতুমি করা নয় ! মাণিক আজ আমাদের ফিরতেই হবে—এখনও সময় আছে ! সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে কাল সকালে আবার ফিরে আসা যাবে ! চল, আমরা বাইরে যাই !"

—"কিন্তু ও-সব কিসের শব্দ, ও কার গর্জ্জন ও কার চোখ কিছুই তো বোঝা গেল না।"

—"বুঝতে গেলে প্রাণ দিতে হয় ! শীগ্‌গির উপরে চল !"

সকলে দ্রুতপদে উপরে উঠে দেখলে, ভাঙ্গা বেদীর গায়ে হেলান্ দিয়ে মড়ার মত হল্‌দে মুখে সুন্দরবাবু চুপ করে ব'সে আছেন।

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু আজ আপনারই জয়জয়কার ! পলায়নে আপনি হয়েছেন আমাদের পথপ্রদর্শক।"

সুন্দরবাবুর তখন উত্তর দেবারও শক্তি ছিল না।

জয়ন্ত বললে, "আমাদের এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। সুড়ঙ্গের মুখ খোলা, দপ্‌দপে চোখ দিয়ে যে আমাদের দেখেছে সে এখানেও খুঁজতে আসতে পারে ! চল, আমরা মন্দিরের পিছনে বনের ভিতরে যাই। আজকের রাতটা গাছের উপরে উঠেই কাটাতে হবে !"

অমলবাবু বললেন, "তার চেয়ে পাথরগুলো আবার যথাস্থানে রেখে গর্ত্ত আবার বন্ধ ক'রে দিলে কি হয় না ?"

—"না। পাথর তো এখন আর গেঁথে দেওয়া সম্ভব নয় ! সুড়ঙ্গে যার সাড়া পেয়েছি তার আকার নিশ্চয়ই অসাধারণ ! ঐ আলগা পাথরগুলো তার এক ধাক্কায় হুড়্‌মুড়্ ক'রে ঠিক্‌রে পড়বে।"

সুন্দরবাবু এতক্ষণে ভাষা পেয়ে বললেন, "জয়ন্তের প্রস্তাবই যুক্তিসঙ্গত। পথ খোলা পেলে ও-দানবটা হয়তো গর্ত্ত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেও পারে!"

জয়ন্ত বললেন, "ভগবান করুন, আপনার অনুমানই যেন সত্য হয়! ও-পাপ বিদেয় হ'লে তো সব ল্যাঠা চুকে যায়!"

সুড়ঙ্গের গর্ভ ভেদ ক'রে আবার একটা বুকের-রক্ত-ঠাণ্ডা-করা গভীর গর্জ্জন বাইরে ছুটে এল!

সে গর্জ্জনের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে যেন বিষম ক্রোধ ও বিপুল ক্ষুধার ভাব! যেন আসন্ন মৃত্যুর গর্জ্জন, শুনলেই বুকের ভিতরে জীবনের স্পন্দন স্তম্ভিত হয়ে যায়!

জয়ন্ত সচকিত কণ্ঠে বললে, "সে আসছে, সে আসছে! তোলো সব তল্পিতল্পা, ছোট বনের দিকে!

রাত তখন বেশী নয়, কিন্তু এরি মধ্যে বনবাসিনী নিশীথিনীর নিতুটী-মন্ত্রে চতুর্দ্দিকের নির্জ্জনতা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আকাশে চাঁদ নেই, অন্ধকারের সাম্রাজ্য আজ অপ্রতিহত। বাতাস যেন কাঁদতে কাঁদতে বয়ে আনছে দূর-বনের আর্ত্তধ্বনি।

মন্দিরের পিছনে একটি ছোট মাঠ। তারপর আবার অরণ্য।

সেইদিকে এগুতে এগুতে জয়ন্ত বললে, "মাণিক, ভাগ্যিস্ বুদ্ধি ক'রে সঙ্গে বিষাক্ত বাষ্পের বোমা এনেছিলুম!"

"কেন বল দেখি?"

—"কাল সকালে সুড়ঙ্গের মধ্যেই বোমা ছুঁড়ে দেখব কোন ফল হয় কিনা?"

—"যদি ফল না হয়? যদি ওটা কোন জীব না হয়?"

—"মানে?"

—"ওটা কোন ভৌতিক কাণ্ড হওয়া কি অসম্ভব?"

—"মাণিক, শেষটা তুমিও কি সুন্দরবাবুর দলে ভিড়তে চাও?"

—"ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে পৃথিবীর কোন জীব বাঁচতে পারে?"

—"না পারাই স্বাভাবিক। কিন্তু ও যে পেরেছে, হয়তো তারও এমন কোন স্বাভাবিক কারণ আছে, যা আমাদের অজানা। ভূতের কথা মনেও এনমা মাণিক! ভূতের গল্প পড়তে ভালো, কারণ অসম্ভবের দিকে মানুষের টান থাকে। কিন্তু ভূত নেই।"

বোধ হয় তখন শেষ-রাত। আকাশে চাঁদের আভাস জেগেছে মাত্র। গাছের উপর সকলে ব'সেছিল অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুন্দরবাবুর নাসিকা রাত্রির স্তব্ধতা দূর করবার জন্যে কম চেষ্টা করছিল না। এমন কি মাণিকের মত হচ্ছে, তাঁর

নাকের ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে সে গাছের সব পাখী ও বানর তো দূরের কথা, এমন কি ভূত-পেত্নীরাও নাকি অন্য গাছের সন্ধানে পালিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে!

আচম্বিতে উপর-উপরি দু-দুবার বন্দুকের শব্দে সকলের তন্দ্রা গেল ছুটে!

সুন্দরবাবু বেজায় চমকে বিনা বাক্যব্যয়ে ঝুপ্ ক'রে ডাল থেকে প'ড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ হুঁসিয়ার ব্যক্তি ব'লে ধরাতলে অবতীর্ণ হবার আগেই খপ্ ক'রে আর-একটা ডাল ধ'রে ফেলে দুলতে ও ঝুলতে লাগলেন।

রাতের মর্ম্ম ভেদ ক'রে নানা কণ্ঠের চীৎকার ও আর্ত্তনাদ দূর থেকে ভেসে এল! কারা যেন ভয়ানক আতঙ্কে চীৎকার করছে এবং দারুণ যাতনায় কাঁদছে।

—"জয়! জয়!"

—"কী মাণিক?"

—"শুনেছ?"

—"হুঁ!"

—"আমাদের এখন কি করা উচিত?"

—"চুপ ক'রে এইখানে ব'সে থাকা উচিত। এ অরণ্য এখন মৃত্যুর রাজ্য। নীচে নামলেই মরব।"

—"কিন্তু ও কিসের গোলমাল?"

—"কাল সকালে বুঝতে পারব। এখন আর কথা কোয়ো না। কথা কইলেও হয়তো বিপদকে ডেকে আনা হবে।"

নীচের ডাল থেকে করুণস্বরে শোনা গেল, "হুম্! কিন্তু আমাকে যে কথা কইতেই হবে! গাছের ডাল ধ'রে আমি ঝুলছি। তোমরা সাহায্য না করলে আমি আর বেশীক্ষণ ঝুলতেও পারব না!"

অমলবাবুর সঙ্গে মাণিক কোনরকমে ডাল ব'য়ে সুন্দরবাবুর কাছে—অর্থাৎ মাথার উপরে গিয়ে হাজির হ'ল! মাণিক বললে, "বৈজ্ঞানিকের মতে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা গাছের ডাল ধ'রে ঝুলতে পারতেন। সে অভ্যাস ভুলে গিয়ে আপনি ভালো করেন নি সুন্দরবাবু!"

ডাল ধ'রে ঝুলতে ঝুলতে সুন্দরবাবু বললেন, "মাণিক, তোমার ঠাট্টা শুনলে অঙ্গ জ্বলে যায়! নাও, এখন আমাকে টেনে তুলবে, না বচন শোনাবে?"

উপর থেকে জয়ন্তের বিরক্ত ও গম্ভীর স্বর শোনা গেল, "ফের কথা কয়!"

দূরের কোন গোলমাল আর শোনা যায় না। শব্দগুলো যেন স্তব্ধতা-সাগরের মধ্যে কয়েকখণ্ড ইটের মত প'ড়েই ডুবে কোথায় তলিয়ে গেল! এখন সুধু কালো রাত করছে

থম-থম, মুখর ঝিল্লী করছে ঝিম্-ঝিম্, বনের গাছ করছে মর্-মর্! এবং ম্লান খণ্ড চাঁদ নিবু-নিবু চোখে করছে উষার কোলে মৃত্যুর অপেক্ষা!

গাছে গাছে পাখীর দল বনভূমির সবুজ জগতে দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে রটিয়ে দিলে—জাগো লতা-পাতা, জাগো ফুল-ফল, জাগো অলিপ্রজাপতি! পূর্ব্বের শোভাযাত্রায় দিবারাণীর সোণার মুকুট দেখা দিয়েছে! জাগো সবাই!

সকালের প্রথম আলো কি শান্তিময়! সকালের নূতন বাতাস কি মিষ্টি! এই পৃথিবীতে কখনো যে কালো-কুৎসিত ভয়ময় রাত ছিল, তার কথা যেন মনেও পড়ে না!

সকলে একে একে গাছ ছেড়ে আবার মাটি-মায়ের কোল পেয়ে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলে।

সুন্দরবাবু বললেন, "আগে ষ্টোভে চড়িয়ে দাও চায়ের কেট্‌লি! কি জানি বাবা, যে-জায়গায় যাচ্ছি, জীবনে হয়তো আর চা খেতে হবে না। ওহে, 'এয়ার-টাইট্' টিনে তোমরা রসগোল্লা আর সন্দেশ এনেছিলে না? হুম্, ক্ষমা-ঘৃণা ক'রে গোটা দশ-বারো আমার দিকে ছুঁড়ে মেরো।"

জয়ন্ত বললে, "ঠিক কথা, আমি সুন্দরবাবুকে সমর্থন করি। ভালো 'ব্রেক্-ফাষ্ট্' মানুষের সাহস আর শক্তিকে দ্বিগুণ ক'রে তোলে। মাণিক, নিয়ে এস রসগোল্লা-সন্দেশের টিন।"

জয়ন্তের কাঁধে হাত রেখে সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত-ভায়া, এইজন্যেই তো তোমার সঙ্গে আমার বেশী ভাব। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তোমার মত মনের মানুষ দুর্ল্লভ।"

প্রাতরাশ শেষ ক'রে সকলে আবার ভাঙা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'ল, সুন্দরবাবু আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বার কয়েক 'দুর্গা দুর্গা' বলে চেঁচিয়ে নিলেন।

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, শ্রীদুর্গার কাণদুটি কালা নয়, অমন বিকটস্বরে না চেঁচালেও তিনি শুনতে পাবেন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এই। ঠাট্টা সুরু হ'ল তো? আচ্ছা মাণিক, তুমি আমার পিছনে এত লাগো কেন বল দেখি?"

মাণিক মুচ্‌কে হেসে বললে, "আপনাকে বেশী ভালোবাসি কিনা।"

জয়ন্ত তার প্রিয় বাঁশের বাঁশীটি বার করেছে এবং ভৈরবী রাগিনীর লীলায় প্রভাতকে আরো সুন্দর ক'রে তুলে মাঠের উপর দিয়ে সব-আগে এগিয়ে চলেছে।

মাঠে ফুটেছে অজস্র ঘাসের ফুল—কেউ সাদা, কেউ হল্‌দে। আশেপাশে ঘুরে-ফিরে

ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে খুব-ছোটজাতের একরকম প্রজাপতি। মাঝে মাঝে তাদের কাছে বাহাদুরি নেবার মতলোবে গঙ্গাফড়িং 'হাই-জাম্পে'র নানান কায়দা দেখাচ্ছে।

মাঠ পার হয়ে বাঁশী বাজাতে বাজাতে জয়ন্ত মন্দিরের দরজার উপরে উঠল। বাঁশীতে বাজছিল তখন কোন গানের অন্তরা. কিন্তু হঠাৎ তার সুর বোবা হয়ে গেল একেবারে।

মাণিক দূর থেকেই লক্ষ্য করলে. জয়ন্ত বাঁশীটি তাড়াতাড়ি পকেটে পুরে. পিঠে বাঁধা বন্দুকটা নামিয়ে নিলে। দেখেই সে ঝড়ের বেগে ছুটল।

সুন্দরবাবু বুঝলেন. আবার কোন অঘটন ঘটেছে। একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরাও ছুটে এস।"—ব'লেই তিনি দৌড়তে লাগলেন।

অমলবাবু একান্ত নাচারের মতন বললেন, "হে ভগবান, আবার কি হ'ল? আর যে প্যারি না।"

মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সকলে যে বীভৎস দৃশ্য দেখলে, ভাষায় তা ঠিকমত বর্ণনা করা অসম্ভব।

মন্দিরের মেঝের উপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে প'ড়ে রয়েছে বিরাট এক অজগর সাপ। এতবড় অজগর দেখা যায় না বললেই হয়—লম্বায় সে হয়তো ত্রিশ ফুটের কম হবে না এবং দেহও তার অসম্ভব-রকম মোটা।

কিন্তু এই ভয়াবহ দৃশ্য অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আর এক অভাবিত কারণে। অজগরের বিপুল কুণ্ডলীর ভিতরে প্রায় রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে বন্দী হয়ে রয়েছে দুটো মানুষের মৃতদেহ।...... তৃতীয় একটা দেহ অজগরের ল্যাজের কাছে মেঝের ওপরে হাত পা ছড়িয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে—তার মাথাটা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং তার পাশে প'ড়ে একটা ভাঙা বন্দুক।

অজগরটাও বেঁচে নেই—তারও মাথা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে।

মন্দিরের ভিতরে যেদিকে তাকানো যায় সেইদিকে রক্ত আর রক্ত। কোথাও প'ড়ে আছে চাপ্ চাপ্ রক্ত. কোথাও কোথাও আঁকাবাঁকা রক্তের ধারা। রক্তের ফিন্‌কি মন্দিরের দেওয়ালেও গিয়ে লেগেছে। এত রক্ত অমলবাবু এক জায়গায় কখনো দেখেন নি.—তাঁর মাথা ঘুরে গেল, প্রায় অজ্ঞানের মত তিনি ধপাস্ ক'রে বসে পড়লেন।

অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে থাকবার পর জয়ন্ত ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললে, "তাহ'লে কাল আমরা এই অভাগাদেরই আর্ত্তনাদ শুনেছিলুম?"

মাণিক বললে, "তাছাড়া আর কি।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু কে এরা?"

জয়ন্ত বললে, "বুঝতে পারছেন না ? এরা যে আমাদেরই বন্ধু ! আপনাদের গুলি খেয়েও এদের আশ মেটে নি, পদ্মরাগ-বুদ্ধের উপরে এদের এত ভক্তি যে, আমরা কি করছি দেখবার জন্যে রাত্রে মন্দিরে এসে ঢুকেছিল !"

অমলবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "আমি চ্যান্ আর ইন্‌কে চিনতে পেরেছি। বন্দুকের পাশের লোকটা হচ্ছে ইন্, আর অজগরের কুণ্ডলীর ভিতরে মুখ খিঁচিয়ে রয়েছে চ্যান্। অন্য লোকটাকে চিনি না।"

জয়ন্ত বললে, "সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে !..........সাপ কখনো গর্ত্ত খোঁড়ে না, অন্য জীবের খোঁড়া গর্ত্তে সে আশ্রয় নেয়। কোন জন্তু উপর থেকে গর্ত্ত খুঁড়ে পদ্মরাগ-বুদ্ধের সুড়ঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। অজগর-মহাপ্রভু সেই গর্ত্ত দিয়ে ভিতরে ঢুকে তাকে ফলার করেন আর তারপর থেকে মনের সুখেই সুড়ঙ্গে বাস করতে থাকেন। কাল রাত্রে উনিই আমাদেরও ফলার করবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু আমরা আত্মত্যাগে রাজি না হওয়াতে উনি বেরিয়ে এসে আমাদের অভদ্রতায় অত্যন্ত বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হয়ে মন্দিরের ভিতরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, বা কোন কোণ বেছে নিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলেন। তারপর কখন চ্যান্ আর ইন্ কোম্পানীর রঙ্গালয়ে প্রবেশ। তাদের চোখ তখন আমাদের জন্যেই ব্যস্ত, অজগরকে তারা দেখতে পায় নি, কিন্তু অজগর তাদের দেখেই আক্রমণ করলে ! চ্যান্ আর তার একজন সঙ্গী প্রথম আক্রমণেই তার কুণ্ডলীর ভিতরে ধরা পড়ল, ইনের হাতে ছিল বন্দুক, সে অব্যর্থ লক্ষ্যে অজগরের মাথা টিপ ক'রে দুবার বন্দুক ছুঁড়লে, সঙ্গে সঙ্গে অজগরের বিষম ল্যাজের ঝাপটায় তার মাথা আর হাতের বন্দুক গেল গুঁড়িয়ে ! বাকি যারা ছিল তারা করলে সবেগে পলায়ন ! ব্যাপারটা বোধহয় অনেকটা এইরকমই হয়েছিল।...... অর্থাৎ আমাদের মানুষ-শত্রুর দল নিজেরাই আত্মবলি দিয়ে আমাদের অজগর-শত্রুকে বধ ক'রে আমাদের পথ সাফ ক'রে দিয়েছে ! ভগবানকেও ধন্যবাদ, চ্যান অ্যাণ্ড্ ইন্ কোম্পানীকেও ধন্যবাদ ! আর ধন্যবাদ দি পদ্মরাগ-বুদ্ধদেবকে ! তিনি সত্যই যদি থাকেন, তবে আমাদের হস্তগত হ'লে তিনি বোধ করি খুসি হবেন !"

সুন্দরবাবু এতক্ষণ পরে ভরসা ক'রে মন্দিরের ভিতরে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "হুম্ ! বেটা অজগর ! তুমি আমাদেরই জলযোগ করবার ফিকিরে ছিলে বটে !" ব'লেই তিনি মৃত অজগরের কুণ্ডলীর উপরে বন্দুক দিয়ে একটা আঘাত করলেন।

—এবং যেমন আঘাত করা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে অজগরের মৃত-দেহটা কুণ্ডলী পাকিয়ে লাফিয়ে উঠল।

সুন্দরবাবু মৃত অজগরের এমন কল্পনাতীত ব্যবহার আশা করেন নি, তিনি ভয়ানক ভড়কে হঠাৎ পিছিয়ে আসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে মস্ত ব্যায়াম-বীরের মত আশ্চর্য্য এক ডিগ্‌বাজি খেয়ে মেঝের উপরে সশব্দে আছাড় খেয়ে পড়লেন এবং ষাঁড়ের মত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওরে বাবারে, অজগরটা এখনো জ্যান্তো আছে যে রে, আমার প্রাণ গেল রে!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি সুন্দরবাবুকে অতি-অনায়াসে মাটি থেকে শূন্যে তুলে নিয়ে স'রে এল এবং তাঁকে আবার সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলে।

অজগরের দেহটা তখন ফুলে ফুলে উঠছে এবং কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

সুন্দরবাবু মহাভয়ে আর একবার সেইদিকে তাকিয়েই বেগে পলায়ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু জয়ন্ত হাত ধ'রে তাকে টেনে রাখলে।

সুন্দরবাবু পাগলের মতন ব'লে উঠলেন, "আমাকে ছেড়ে দাও জয়ন্ত, আমাকে ছেড়ে দাও! আমি অজগরের খোরাক হ'তে চাই না!"

জয়ন্ত হেসে বললে, "সুন্দরবাবু, শান্ত হোন!"

—"শান্ত হব? জ্যান্তো অজগরের সামনে শান্ত হব? হুম্ হুম্ হুম্!"

—"ভয় নেই সুন্দরবাবু! অজগরের প্রাণ না থাকলেও তার দেহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে নড়েচড়ে, কুণ্ডলী পাকায়! অবশ্য তখনো ঐ কুণ্ডলীর ভিতরে গিয়ে ঢুকলে কোন জীবেরই রক্ষা নেই, কিন্তু সে আর তেড়ে এসে কারুকে ধরতে পারে না!"

সুন্দরবাবু দুইচক্ষু বিস্ফারিত ক'রে অজগরটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বটে, বটে, বটে? তা'হলে আমি আর পালাব না! কিন্তু আমার ভয়ানক লেগেছে! আমি ডিগ্‌বাজি খেয়ে পাথরের মেঝের ওপর আছাড় খেয়েছি—উঃ!"

জয়ন্ত একপাশ দিয়ে এগিয়ে ভাঙা-বেদীর সুড়ঙ্গ-মুখের কাছে গিয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললে, "এখন দূরে যাক্ সমস্ত দুঃস্বপ্ন, চোখের সামনে জেগে উঠুক পদ্মরাগ-বুদ্ধের প্রতিমা। হাতী সিং, সকালেই আবার জ্বালো রাতের আলো—কেননা পাতালে দিনও নেই রাতও নেই, আছে সুধু রন্ধ্রহীন অন্ধকার।"

হাতী সিংয়ের লোকজনেরা আলো জ্বাললে, সকলে আবার পাতালপুরীর সোপান দিয়ে নীচে নামতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে রবিকরোজ্জ্বল প্রভাতের সমস্ত রং আর সুর আর গন্ধের সঙ্গে ঘটল বিচ্ছেদ।

সুড়ঙ্গের সুদূর অন্ধকারের পানে তাকিয়ে সুন্দরবাবুর কাণে-কাণে মাণিক বললে, "আচ্ছা, অজগরের বিধবা বউ যদি ওখানে থাকে, তাহ'লে আপনি কি করবেন?"

সুন্দরবাবু চম্‌কে উঠে খুব সন্দেহের সঙ্গে সুমুখের দিকে চেয়ে বললেন, "আমাকে আর নতুন ভয় দেখিও না মাণিক।"

অজগরের বিধবা বউয়ের সঙ্গে কারুর আর দেখা হ'ল না বটে, কিন্তু নতুন এক নিরাশায় ভেঙে পড়ল সকলের মন।

সোজা পথ, কোথাও কোন শাখা-প্রশাখা নেই। কিন্তু খানিক পরেই পথ গেল ফুরিয়ে। সুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিথর পাথরের দেওয়াল।

সকলে খানিকক্ষণ হতভম্বের মত পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

অমলবাবু ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, "এই পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে আমাদের সকল আশার আজ অন্ত হ'ল।"

সুন্দরবাবু বললেন, "শেষটা যে এই হবে, আমি তা জানতুম। হুম্, পদ্মরাগ-বুদ্ধ না অশ্বডিম্ব-বুদ্ধ। ধাপ্পা বাবা, ধাপ্পা।"

মাণিক বললে, "তাহ'লে অকারণে এত কষ্ট ক'রে এই সুড়ঙ্গ কাটা হয়েছিল কেন?"

অমলবাবু বললেন, "এ হচ্ছে নাগরাজ্য, নাগ ছিল এখানকার প্রতীক। ওঙ্কারধামের ভাস্কর্য্যে সর্ব্বত্রই তাই নাগমূর্ত্তির ছড়াছড়ি। ভারতের অনেক তীর্থক্ষেত্রে যেমন পবিত্র কুমীর পোষা হয়, বাংলাদেশে যেমন বাস্তুসাপকে ঠাঁই দেওয়া হয়, এই মন্দিরেও তেমনি সুড়ঙ্গ কেটে পবিত্র অজগরকে রাখা হয়েছিল।"

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু আপনার যুক্তি মনে লাগছে না। যে-অজগরকে মনে করা হয় পবিত্র, ভক্তরা সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ ক'রে তাকে কখনো কবর দিয়ে জ্যান্তো মারবার ব্যবস্থা করত না।... আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে। হাতী সিং, তোমার লোকজনদের এগিয়ে আসতে বল। ভেঙে ফেলুক তারা এই পাথরের দেওয়াল। দেখা যাক্ দেওয়ালের ওপাশে কি আছে?" ব'লেই সে রূপোর শামুকের নস্যদানী বার ক'রে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল।

মাণিক জানত, জয়ন্ত খুসি হ'লে নস্য না নিয়ে পারে না। কিন্তু আপাতত আনন্দের বদলে সে আশঙ্কার কারণই খুঁজে পেলে। তাড়াতাড়ি বললে, "জয়, সেই পুকুরের কথা তোমার মনে আছে তো? পুকুরের কোণ থেকে যে পথটা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছেছে, এই সুড়ঙ্গ আছে ঠিক তার নীচে। সুতরাং আমরা এখন হয়তো সেই পুকুরের পাশে বা নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। দেওয়াল ভাঙলে সুড়ঙ্গের ভিতর হুড়্‌-হুড়্ ক'রে জল ঢুকতে পারে! তখন আমাদের কী দশা হবে?"

জয়ন্ত বললে, "সব দেওয়াল তো একসঙ্গে ভাঙা হবে না, জল ঢুকলে পালাবার ঢের সময় পাওয়া যাবে।.......ভাঙো দেওয়াল।"

দেওয়ালের উপর পড়তে লাগলো কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা। শক্ত দেওয়াল। সহজে ভাঙা যায় না। অনেক কষ্টে একখানা পাথর সরানো হ'ল।

কিন্তু জল-টল্ কিছুই ভিতরে ঢুকল না। জয়ন্ত সেই ফাঁকটার ভিতরে হাত চালিয়ে অল্পক্ষণ কি অনুভব করলে। তারপর মহা উৎসাহে ব'লে উঠল, চালাও কুড়ুল। সরাও পাথর! আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়। এ সুড়ঙ্গ অকারণে কাটা হয় নি।"

মাণিকও তাড়াতাড়ি সেই ফাঁকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, "দেওয়ালের ওপাশে কাঠের মত কি হাতে ঠেকছে। বোধহয় দরজা।"

সুন্দরবাবু বিপুল কৌতূহলে বললেন, "অ্যাঃ? বল কি। দরজা? আলিবাবা'র চল্লিশ দস্যুর রত্নগুহা চিচিংফাঁক, চিচিংফাঁক, চিচিংফাঁক।"

ঠকাং। ঠকাং। ঠকাং। চলল সমান কুড়ুলের পর কুড়ুল। খ'সে প'ড়েছে, ভেঙে পড়ছে পাথরের পর পাথর। এক-একখানা পাথর খসে, আর নেচে ওঠে সকলের প্রাণ।

দরজাই বটে! খুব বড় দরজা নয়, ছোট দরজা! তিন ফুটের বেশী উঁচু নয়, কিন্তু বিলক্ষণ মজবুৎ! আগাগোড়া লোহার শিকল মারা! পাথরের চেয়ে কঠিন! আর সেই দরজায় লাগানো রয়েছে একটা পুরাণো মস্ত পিতলের কুলুপ!

জয়ন্ত বললে, "কুলুপের ভিতরে বেশ ক'রে তেল ঢেলে দাও! বহুকাল ও-কুলুপে চাবি ঢোকেনি, তেলে না ভিজলে খুলবে না!"

সুন্দরবাবু বললেন, "তেল ত ঢালছ, কিন্তু চাবি কোথায়?"

মাণিক বললে, "আমার কাছে! নিশ্চয় সেই চাবিটা ঐ কুলুপে লাগবে?"

জয়ন্ত রূপোর শামুকের নস্যদানী বার ক'রে ঘন ঘন নস্য নিয়ে বললে, "কুলুপটা ভাল ক'রে তেলে ভিজুক্! ততক্ষণে আমরা আর-একবার চা তৈরী করলে নিশ্চয়ই কারুর আপত্তি হবে না? সন্দেশ আর রসগোল্লার টিন আর একবার বার করলে আপনি কি রাগ করবেন সুন্দরবাবু?"

সুন্দরবাবু ভুঁড়ির উপরে স্নেহভরে হাত বুলোতে বুলোতে একগাল হেসে বললেন, "রাগ! আমার এ ভুঁড়ি পর্ব্বতপ্রমাণ সন্দেশ-রসগোল্লার স্বপ্ন দেখে। এ ভুঁড়ি কখনো পরিপূর্ণ হয় না। বিশ্বাস না হয়, আজকেই পরখ্ ক'রে দেখতে পারো—হুম।"

মাণিক স্বহস্তে দ্বিতীয় দফা চা তৈরি করতে বসল।

অমলবাবু বললেন, "এইবারে পদ্মরাগ বুদ্ধের সব রহস্য টের পাওয়া যাবে।"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, পদ্মরাগ-মণির সঙ্গে বুদ্ধদেবের সম্পর্ক কি, এইবারেই তা জানতে পারব। অবশ্য এটা আমার জানা আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে সব-চেয়ে-ভালো পদ্মরাগ-মণি ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোথায় জন্মায় না। পৃথিবীতে সব-চেয়ে কঠিন বস্তু হচ্ছে হীরক, তারপরেই পদ্মরাগের স্থান। কিন্তু সমান-ওজনের হীরকের চেয়ে পদ্মরাগ-মণি বেশী মূল্যবান।"
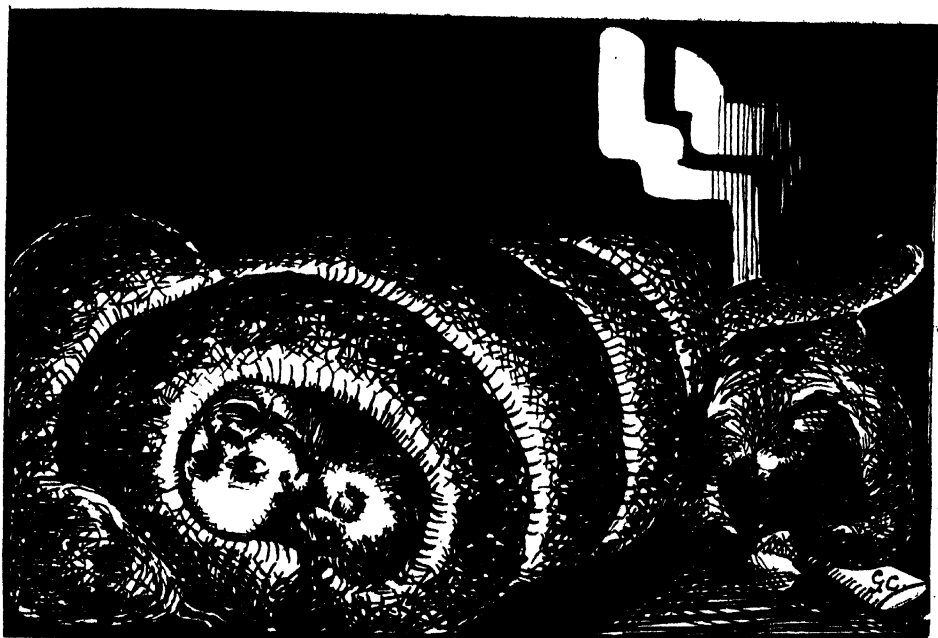
অজগরের কুণ্ডলীর ভিতরে

চায়ের পেয়ালা যখন খালি হ'ল, সন্দেশ-রসগোল্লা যখন ফুরুলো, তখন মাণিক সগর্বে বার করলে তার পকেটের চাবি এবং সেই চাবি ঢুকল কুলুপের গর্ভে। এবং একবার ঘোরাতেই কুলুপ গেল খুলে।

সমস্ত গুহা চীৎকার-শব্দে পরিপূর্ণ ক'রে জয়ন্ত বললে, "জয়, পদ্মরাগ বুদ্ধের জয়।"

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ছোট একটি ঘর। তার মেঝে, তার দেওয়াল, তার ছাত সব পাথরে গড়া। সুতীব্র আধুনিক আলোকের আঘাতে কতকাল পরে সেখানকার প্রাচীন ও নিবিড় অন্ধকারের মৃত্যু হ'ল, তার হিসাব কেউ জানেনা। ঘরে আর কোন আসবাব নেই, কেবল মাঝখানে রয়েছে কোন্ ধাতু দিয়ে গড়া একটি মাঝারি সিন্দুক।

জয়ন্ত ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বললে, "মাণিক, দেখ। পাথরের ঘর, তবু স্যাঁৎসেঁতে। পাথরের জোড়ের ভিতর দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ?"

—"পারছি, জয়। এই ঘরটা আছে সেই পুকুরের নীচে।"

—"এখন এটাও বুঝতে পারছ তো, নক্সায় পুকুরের পশ্চিম কোণে সেই চিহ্নিত জায়গাটা কেন আঁকা হয়েছে? পুকুরের তলায় এই ঘরটা আছে, মন্দিরগামী রাস্তার তলায় এই সুড়ঙ্গটা আছে, বেদীর তলায় সিঁড়ির সার আছে, নক্সা দিয়েছে তারই ইঙ্গিত। সাধারণ লোকে নক্সা দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না—কিন্তু আমরা হচ্ছি অসাধারণেরও চেয়ে অসাধারণ। কারণ অসাধারণ লোক নক্সার রহস্য বুঝতে পারলেও সুড়ঙ্গের দরজা ঢাকা পাথরের দেওয়াল দেখে ফিরে যেতে বাধ্য হ'ত, কিন্তু আমরা ফিরে যাই নি। অতএব অনায়াসেই গর্ব্ব করতে পারি। এখন তোল ঐ সিন্দুকের ডালা।"

সিন্দুকের ডালা তুলেই সকলে অবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।...সিন্দুকের ভিতরে লণ্ঠনের আলো পড়বার আগেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল যেন একটা সুতীব্র রক্তজ্যোতির ঝটকা। তারপরেই দেখা গেল টকটকে লাল ও জ্বল-জ্বলে পাথরে তৈরী একটি অতি-আশ্চর্য্য অতুলনীয় বুদ্ধমূর্ত্তি সেখানে কারুকার্য্যের বিচিত্র সুবৃহৎ স্বর্ণপাত্রে শোয়ানো রয়েছে। মূর্ত্তিটি দৈর্ঘ্যে একহাতেরও কম হবে না।

জয়ন্ত বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বললে, "মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে যেন লাল-আলো ঠিকরে পড়ছে, চোখে লাগছে ধাঁধা। এ মণিময় মূর্ত্তি না হয়ে যায় না। না-জানি এর দাম কত কোটি টাকা। মাণিক মাণিক। এ কি সত্য, না অসম্ভব স্বপ্ন?"

মাণিক আবেগে নিরুত্তর হয়ে মূর্ত্তির মণিময়, দীপ্ত ও মসৃণ গায়ে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

দুইচক্ষু ছানাবড়ার মতন ক'রে সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্। পদ্মরাগ মণি কেটে এত-বড় মূর্ত্তি তৈরী করা হয়েছে? পদ্মরাগ-মণি এত বড় হয়!"

মাণিক বললে, "না সুন্দরবাবু, অনেকগুলো পদ্মরাগ-মণি একসঙ্গে জুড়ে শিল্পী এই মূর্ত্তি গড়েছে। কিন্তু এমনি তার হাতের কায়দা যে, কোথাও জোড় ধরবার উপায় নেই।"

জয়ন্ত কিছু বললে না, অভিভূত প্রাণে মূর্ত্তিটিকে সযত্নে তুলে সিন্দুকের উপরে বসিয়ে দিলে। অপার্থিব আনন্দের মত ঘোররক্তবর্ণ সেই মহামানবমূর্ত্তির প্রভা যেন আধুনিক সমুজ্জ্বল আলোগুলোকেও লজ্জা দিতে লাগল।

সেই জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির সামনে দুইহাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে ব'সে প'ড়ে অমলবাবু ভক্তিভরে বলে উঠলেন—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

বি, সি

ডুরাণ্ড টুর্ণামেণ্ট

নর্দার্ণ ইণ্ডিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল টুর্ণামেণ্ট হল ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা। আই, এফ. এ শীল্ড প্রতিযোগিতার পর নামজাদা মিলিটারী দল শুধু এই টুর্ণামেণ্টেই যোগদান করে থাকেন। আগে সিভিল টীম খুব অল্পই এই টুর্ণামেণ্টে খেলত। কিন্তু যে বছর হতে মোহনবাগান—গোষ্ঠ পাল, সামাদ, রবি গাঙ্গুলি, মনা দত্ত, কুমার, বলাই চাটার্জ্জি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় নিয়েও সেমি ফাইন্যালে বিখ্যাত মিলিটারী দল সেরউড ফরেষ্টারের কাছে হার স্বীকার করে তখন হতেই বাঙ্গলার বহু সিভিল টীম এই টুর্ণামেণ্টে খেলে আসছে কিন্তু কেউ এই প্রতিযোগিতায় গোরাদলকে হারিয়ে শীল্ড নিতে পারে নি। এবার বাংলার কোন নামজাদা দলই সিমলায় খেলতে আসেনি। ফাইন্যালে উঠেছিল সাউথ ওয়েলস্ বর্ডারস্ আর নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে দল। ডিফেন্সের জোরে ভাল খেলে গোরাদল বিপক্ষ দলকে ১-০ গোলে হারায়। চ্যাপম্যান হেড করে গোলটি দেয়। খেলার শেষে মাননীয় বড়লাট বাহাদুর পারিতোষিক বিতরণ করেন।

মানাভাদার দল—

হকিতে ভারতীয় দলের ক্রীড়ানৈপুণ্য সত্যিকার শ্লাঘার বিষয়। কিছুদিন আগে মানাভাদার টীম নিউজিলাণ্ডে খেলতে গিয়েছিলেন। সেবার ভারতীয় দলের উন্নত খেলা সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। এবার মানাভাদার মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় নিয়ে গিয়ে আশ্চর্য্য খেলা দেখিয়েছেন। সবশুদ্ধ ৩১টি খেলা হয়। মানাভাদার অকলাণ্ডে পিচ্ছিল মাঠে একটি গেমে হার স্বীকার করেন। সব টেষ্ট ম্যাচে অতি সহজেই মানাভাদার জয়ী হয়েছেন। ৩১টি খেলায় মানাভাদার গোল স্কোর করেছেন কম করে ২৩১। বিপক্ষ দলেরা মাত্র ১৯টি গোল দিতে সক্ষম হয়।

মানভাদার হকি দল

ডোনাল্ড বাজ

আমেরিকার লন টেনিস টুর্ণামেণ্টে জয়ী হয়ে ডোনাল্ড বাজ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এমেচার খেলোয়াড় হিসেবে গণ্য হলেন। কিন্তু অন্য একটি টুর্ণামেণ্টে বাজ অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় হফ্‌ম্যানের কাছে ৬-২, ৫-৭, ৬-৮ গেমে হেরে গেছেন। বাজ বোধ হয় এই টুর্ণামেণ্টের এমেচার খেলোয়াড় হিসেবে শেষ খেলা খেললেন। শোনা যাচ্ছে, বাজ শীঘ্রই প্রফেসনাল খেলোয়াড় হবেন। টিলডেন, কোসে, ভাইনস, পেরী প্রভৃতি প্রফেসনাল খেলোয়াড়ের পর বোধ হয় বাজের মত সমকক্ষ আর কোন এমেচার খেলোয়াড় রইল না।

অষ্ট্রেলিয়াতে আই, এফ, এ, দল

অষ্ট্রেলিয়াতে আই, এফ, এ, দল

আমরা রংমশালের আশ্বিন সংখ্যায় অষ্ট্রেলিয়াতে আই, এফ, এ দলের খেলার একটি বিবরণ দিয়েছিলাম। তৃতীয় টেষ্ট খেলার ফলাফল তাতে আমরা প্রকাশ করেছিলাম। তৃতীয় টেষ্টে আই, এফ, এ ৪—১ গোলে জিতেছিল কিন্তু চতুর্থ টেষ্টে আবার সিডনী মাঠে আই, এফ, এ ৪—৫ গোলে হেরে যায়। শেষ টেষ্ট ম্যাচেও অষ্ট্রেলিয়া ভারতীয় দলকে ৫—১ গোলে হারিয়ে 'রাবার' জয়ী হন।

পরিচালিকা—— —দিদিভাই

আমার পরম স্নেহের ভাই বোনেরা !

আশ্বিনের আয়ু ফুরোল...কার্ত্তিক এলো।

রৌদ্র ঝলসান বাতাসে শীতের আমেজ এসেছে—বেশ অম্লমধুর লাগে কোনটুক ! পূজোর ছুটী ফুরিয়ে এলো নাকি ? পড়ার বইগুলোতে ধূলো জমে গেছে তো ? আবার ধূলো ঝাড়া সুরু হোক – দেরী করা চলে না—

কার্ত্তিক এসেছে !

তোমাদের ৺পূজার ছুটী কেমন আনন্দে কেটেছে ? ৺বিজয়ার শুভাশীর্ব্বাদ ও অকৃত্রিম ভালবাসা জানাচ্ছি আর এই সঙ্গে ভাইদের জানাচ্ছি—ভাইফোঁটার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।

এবার এসো মিষ্টিমুখ করি।

রেখা (পাটনা) গ্রাঃ ৬৭২

তোমার পুরো নাম নেই কেন ? তোমায় সাদরে ডেকে নিচ্ছি ভাই। গ্রাহক নম্বরটা দু' ভাইবোনের নামে করিয়ে নিও। কার সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছা করে লিখো।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী (পাটনা) গ্রাঃ ৬৭০

তোমার শুভকামনা যেন রংমশালের আশীর্ব্বাদ হয়ে থাকে। তার ঠিকানা চেয়েছ পরে পাঠাচ্ছি।

হামিদা বেগম (বারাকপুর)

তোমার মিষ্টি চিঠি খুব ভাল লেগেছে। গ্রাহক নম্বর দুজনের নামেই করিয়ে নিও তাহলে হবে। গ্রাহিকা না হলে রংমশাল দলে প্রবেশ করা যায় না। তোমাদের এ বৈঠকে বয়সের তারতম্য নেই— ভাল-বাসা নিয়ে কথা—তাছাড়া তুমি তো অনেক ছোট—মনটি আরও ভাল।

আনোয়ারা বেগম (বারাকপুর)

আস্থ ! গ্রাঃ নম্বরটা প্রতি চিঠিতে দিও, না হলে বড় অসুবিধা হয়—সব সময় তো মনে থাকেনা। লীলার খবর পাইনি—পেলেই জানাবো—আর সেও ভাল হলে নিশ্চয় চিঠি লিখবে। পূজার ছুটীর আমোদ কি আর আমাদের মত বড়োর জন্য ? তোমরা কি করলে তাই বলো।

সমরেন্দ্রকমার চৌধুরী (গৌরাবং) গ্রাঃ ৫৩৮

তোমার রচনা এসেছে যথাসময়ে খবর পাবে। সাদা আর্নাদা কাগজে লিখো বুঝেছ ?

সুজাতা রক্ষিত (নাইনীতাল)

তোমার চিঠি ও টি, বি, সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাওয়া গেছে। পরিচালক মশাই বলেছেন—একটু ছোট করে ওটা প্রকাশ করবেন। তুমি সুস্থ হয়ে অগ্রহায়ণ মাসে বাড়ী ফিরে আসছ—এ তো আনন্দের কথা। কলকাতায় আসবে তো ? শ্রীভগবান তোমায় সুস্থ রাখুন ও মনে শান্তি দিন। মানুষের জীবনে কত কাজ—সে তো ব্যর্থ হবার নয়।

নিশানাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা) গ্রাঃ ১০০৯

তোমার রচনা পাঠিয়েছ তো ? যথাসময়ে খবর পাবে। তুমি 'ইন্টার স্কুল' গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছ জেনে আমরা খুব খুসী হয়েছি ভাই।

লেখা বসু (কালিঘাট) গ্রাঃ ১১৪১

তোমার সুন্দর চিঠি পেয়েছি। রংমশাল তোমার ভাল লাগে এ খুব আনন্দের কথা ভাই। তোমার ডাক নামটী মিন্টু, ভারী মিষ্টি। তুমিও বুঝি দিদিভাই ?

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮২৩

তুমি রংমশালের ব্যাজ পেয়েছ তো ? যার যার নাম পাঠিয়েছ তাদের ঠিকানা পরে পাঠাচ্ছি।

বেলা দাশগুপ্তা (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯৫১

বিবি ! চিঠি পেয়ে তবে তো উত্তর দিয়েছি—না হলে কি করে দেবো বলো ? লেখনী বন্ধুর নাম জানালেই পাবে।

শৈলেন্দ্র কুমার নাথ (সিমলা হিল)

তুমি সিমলা সম্বন্ধে কি লিখবে ছোট করে লিখে পাঠিও। হাতের লেখা খারাপ নয়—তবুও হাতের লেখা ভাল করবার চেষ্টা করো।

জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায় (সালকিয়া)

গ্রাহিকা নম্বর কই ? তুমি যে আমায় অনেকদিন চেনো—তার প্রমাণ তো পাইনি ভাই—এত দেরী কেন ? আগে বুঝি লিখতে নেই—আমি খুব রাগ করেছি। তোমার ডাকটী কিন্তু ভারী মিষ্টি। বন্যা সম্বন্ধে যা বলেছ তাতো আমি আগেই জানিয়েছি।

রমা দত্ত, বীণা দত্ত (কলিকাতা) গ্রাঃ ৩৮১

তোমরা চন্দননগর, দানাপুর, মীরাট এখানকার লেখনী বন্ধু চাও—আচ্ছা পরে জানাবো। মন্ত্রমন্ত্র জানি না—তোমরা ভালবাস বলে ভাল লাগে।

জ্যোৎস্নাকুমার সেনগুপ্ত (দিনাজপুর) ১১৬৯

নিয়মাবলী যা জানতে চেয়েছ সে তো রংমশালের পাতাতেই পাবে। তোমার রচনা পাঠিও ভাই। যে যে বিষয় বলেছ পরিচালক মশাইকে জিজ্ঞাসা করে পরে জানাবো।

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ) ১১৯৫

কই আমি তো তোমার উপর রাগ করিনি—কেন করবো বল? তোমরা আমার স্নেহের জিনিষ। প্রীতি সম্মিলনী তোমাদের জন্যই হচ্ছে—এসো সবাই কেমন? তুমি দ্বিতীয় চিঠিতে যা লিখেছ—সে কথার উত্তর পরে জানবে—পরিচালক মহাশয়কে বলা হয়েছে।

রণীশচন্দ্র ঘোষ (রাজসাহী) গ্রাঃ ৩৩৬

তোমরা—'রংমশাল ও অন্যান্য শিশু পত্রিকার পার্থক্য' এই সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা করছ? আচ্ছা ফলাফল জানিও। ওটী প্রকাশ সম্বন্ধে পরিচালক মশাইকে জানিয়ে বলবো।

এস কুণ্ডু (বিদ্যাসাগর কলেজ)

অনেকদিন তুমি রংমশাল নিয়ে আসছ—তাহলে গ্রাহক হয়ে পড়ো না? গ্রাহক না হলে চিঠির উত্তর দেওয়া নিয়ম নয়। লেখনী বন্ধ তো গ্রাহক না হলে দেওয়া হয় না ভাই।

প্রভাত রঞ্জন দে (মজিদপুর) ১১০৫

তোমার আগের চিঠি পাইনি তাই উত্তর দিতে পারিনি। পত্রিকা তোমরা যাতে তাড়াতাড়ি পাও তার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে ভাই।

আজ এই পর্য্যন্ত।

ইতি

শুভাথিনী—

গত মাসে রংমশালে আমরা ইউরোপের আসন্ন যুদ্ধের কথা বলেছিলাম। যুদ্ধ আসন্নই হয়ে আছে আজও. কেবল মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধের দামামা থেমে আছে মাত্র। জার্ম্মানী এবার শুধু কূট বুদ্ধিতে ও হুমকি দিয়েই জেকোশ্লোভাকিয়ার হাতে থেকে সুডেটানলাণ্ড কেড়ে নিলে। মুহূর্ত্তের মিথ্যা শান্তির জন্য সুডেটানলণ্ড বিনামূল্যে জার্ম্মানীর হাতে বিক্রয় হয়ে গেল। ইংলণ্ড আর ফ্রান্সও এই অসৎ ব্যবসায়ে শান্তির দোহাই পেড়ে বেশ দোকানদারী করে নিলে। কিন্তু ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর এই হুমকিতে নিজেদের যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়েছে তা তাদের ইতিহাসে একটা চিরদিনের কলঙ্ক হয়ে থাকবে। তাদের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হল. অপবাদ ঘটল. এর গ্লানি শুধু তাদেরই একদিন হবে না. সমস্ত পৃথিবীর এতে ক্ষতি হবে. আজ হয়েছেও। আজ বুঝি এই প্রথম ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হল। এখন নিত্যনূতন ইউরোপের ম্যাপ তৈরী হবে. দেশের সীমান্তগুলি ভেঙ্গে চুরে নূতন সীমান্ত তৈরী হবে। অসহায় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলিকে কিন্তু আজ কে বাঁচাবে? জার্ম্মানী এতেও সন্তুষ্ট নয়. তেমনি অশান্ত। এখন সে আফ্রিকায় নূতন উপনিবেশ দাবী করেছে। ডাঃ গোবেলস্ বলেছেন— "We get what is ours or we draw sword."

* * * * * *

দেশ কেড়ে নিলে কিন্তু কি সত্যি তাকে জয় করা যায়? জাপান আজ চীনদেশে যে যুদ্ধের আগুন লাগিয়েছে, সহরগ্রাম লোকসংখ্যা যে নিত্য ধ্বংস করছে তাতে করে কি জাপান চীনকে কখনও আপনার করে নিতে পারবে? চীনদেশ আজকের নয় সে বহুকালের, বহুপ্রাচীন তার সভ্যতা। চীন শুধু দেশ নয় সে বিরাট এক মহাদেশ. অসংখ্য তার লোকসংখ্যা; জাপান কি এই নিষ্ঠুর বর্ব্বরতায় সে বিরাট মহাদেশের সমগ্র জয় করতে পারবে? তাহলে তো অনন্তকাল যুদ্ধ চালাতে হবে! যাই হোক, ইউরোপেই হোক আর এসিয়াতেই হোক সমস্ত পৃথিবীতে আজ পশুবলের রাজত্ব। গায়ের জোরে ও চোখ রাঙিয়ে রাজ্য ও মৈত্রী বিস্তার চলছে! পৃথিবীতে সত্যিকারের আন্তরিক মৈত্রী ও শান্তি বোধহয় সুদূর

পরাহত। বোধহয় একমাত্র প্রাকৃতিক বিলয় এই পশুবলকে পরাহত করতে পারে। একমাত্র মহাজ্ঞানী ও মহর্ষিরাই এর শেষ কবে কোথায় বলতে পারেন।

* * * * * *

বর্ত্তমান নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আজ মানুষের যেমন সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও তথাকথিত সভ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি সে সমস্ত আবিষ্কার ঘটিত দুর্ঘটনার ও অন্ত নেই। ১৯৩৪ সালে কেমিষ্ট্রিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন Mr. Urey। তিনি এ বিষয়ে কিরূপ সতর্কতার প্রয়োজন তার কথা বলেছেন। বড় বড় উড়ো জাহাজ, নানা কলকব্জা সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু কোথাও যেন মানুষের সৃষ্টিশক্তির সমাপ্তি ঘটছে। আশা আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে আকাশ ঢেকে মস্ত উড়ো জাহাজ চলল, আর আরাম কেদারায় বসে মানুষ অনেক নীচে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে যখন জয়ের উল্লাসে হাসছে কেজানে ঠিক তখনই হয়তো তারা ধ্বংসের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই সেদিন কুয়াসায় পথ হারিয়ে এক পাহাড় চূড়ায় ধাক্কা লেগে একটি উড়ো জাহাজ তার গর্ব্বিত যাত্রীদের নিয়ে নিমেষে চুরমার হয়ে গেল। জমির ওপর দিয়েও চলা আজ নিরাপদ নয়। রেল দুর্ঘটনা তো ভারতবর্ষে রোজই ঘটছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে তো এই গত কয়েক সপ্তাহেই তিন চারিটি অত্যন্ত শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটল। কিন্তু এগুলি কি বাস্তবিক দুর্ঘটনা? না মানুষেরই ভ্রান্তি ও দুষ্কৃতির ফল? হিংসা দ্বেষ শয়তানী আর মানুষের নিজের দৃষ্টি ও সৃষ্টির অসম্পূর্ণতাই কি এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী নয়?

* * * * * *

কামাল আতাতুর্ক আজ মৃত্যুশয্যায়। তুর্কী দেশ থেকে সম্প্রতি প্রকাশ যে কোন মুহূর্ত্তে এই বিরাট পুরুষের মৃত্যু ঘটতে পারে! বর্ত্তমান ইতিহাসের পাতায় পাতায় কামালের নাম লেখা আছে। আজ তাঁর মৃত্যু হলে তুর্কীর শাসন ভার কে গ্রহণ করবে? কামাল কিছুই প্রকাশ করেন নি, হয়ত কারুর নাম প্রস্তাব করবার আগেই তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন কিনা কে জানে? অনেকে বলছে তুর্কীর প্রধান মন্ত্রী ইসমেৎ পাশাই নাকি হবেন পরবর্ত্তী ডিকটেটর। ইসমেৎ পাশা তুর্কীর সৈনিকদলের খুব প্রিয়। একসময় ইসমেৎ পাশাই নাকি কামালকে হটাবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু একদিন ইসমেৎ নিজেই হঠাৎ কোথায় হটে গেলেন! কেউ কেউ ফেবেল পাশার নাম করছে। ফেবেল পাশা বর্ত্তমান তুর্কীর সৈনিকবিভাগের বড় কর্ত্তা। কিন্তু যেই তুর্কীর অধিনায়ক হোন না কেন, কামাল আতাতুর্কের সমকক্ষ কেউ নন। কামালের মৃত্যুতে তুর্কীর ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। জার্ম্মানী আসন্ন পরিবর্ত্তনের কোন দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়বে না। শকুনি দৃষ্টি নিয়ে অলক্ষ্যে বসে সে সব দেখছে।

রংমশালের পাঠকপাঠিকা ভাইবোন—

পূজোর পর তোমরা সবাই আবার যে যার পড়াশুনো কাজ নিয়ে পড়েছ। সামনেই পরীক্ষা। ছুটির ছাড়া-পাওয়া মনকে আবার লাগাম চড়িয়ে কাজে জুড়ে দিতে একটু সময় বোধ হয় অনেকেরই লাগে। মনটা তাজা হয়ে আসে বটে, অভ্যাসের একঘেয়েমির বাইরে গিয়ে, হাঁফ ছেড়ে, কিন্তু তেমনি কখন কখন একটু ঢিলেও হয়ে যায় অনেক দিন কোন শাসন না মেনে। লাগাম লাগাতেই প্রাণটা তাই উস্‌খুস্‌ করে একটু, একটু বেয়াড়াপণাও করতে ছাড়ে না। ছুটির রঙ যে এখনো তার আকাশে লেগে আছে, ছুটির হাওয়ার মর্ম্মর এখনো থামেনি তার মধ্যে।

ছুটির মর্ম্মর মনের মধ্যে থাক্‌—তাইত চাই! কিন্তু মনের এই ঢিলে হয়ে যাওয়াটাকে ভালো বলা যায় না কোন মতে। যে ছুটি কাজের টান না বাড়াতে পারে, কাজকে যা মধুর করে না তুলতে পারে তার ভেতর কোথায় কিছু গলদ নিশ্চয় আছে। ছুটি হল আমাদের মনের জানলা। ঘরের যেমন জানলা থাকার অত্যন্ত দরকার, বাইরের আলো হাওয়া ভেতরে আসবার জন্যে, ভেতরের দৃষ্টি সুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে যাবার জন্যে,—জানলা না থাকলে ঘরের যেমন কোন মানে বা মূল্য থাকে না, তেমনি মনেরও চাই ছুটির ফাঁক; সাধারণ দরকারের, অতি-কাছের জগৎটাই যাতে প্রধান হয়ে উঠে, আর সব না আড়াল করে দিতে পারে। কিন্তু ঘরের সঙ্গে জানলার সামঞ্জস্যও থাকা চাই। যদি তাদের সম্পর্কটা হয় ঝগড়ার তাহলে ফাঁকটাই বড় হয়ে সব জিনিষটা ফাঁকি হয়ে যাবে।

ছুটি মানে যে মনের আলসেমি নয়, ছাপান বই-এর পাতার 'মারজিনে'র মত তা যে কাজের সঙ্গে গভীর সম্বন্ধে জড়ানো, সেটা বুঝলে আর ছুটির পর মনকে লাগাম লাগাবার কথাই তোলার দরকার হবে না।

—তোমাদের সম্পাদক মশাই

আমরা সকলের জন্য

দলাদলি ব্যাপারটা খারাপ কিন্তু দল বাঁধা নয়। দল বাঁধা মানুষের স্বভাব—মানুষ কেন, আরো অনেক প্রাণীর। দল বেঁধে আমরা অনেক ব্যাপারে এমন আনন্দ পাই একলা যা পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই! দলে মেশার আরো একটা মস্ত বড় ভাল দিক আছে। দলে মিশতে হলেই নিজের নিজের অনেক কিছু বেয়াড়া অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ছেঁটে ফেলতে হয়, নইলে খাপ খাওয়ান যায় না। দলের দলি হতে গিয়ে আমরা নিজের বাইরে পরের জন্য ভাবতে শিখি, একপেশে কাণা দৃষ্টির বদলে সেখানে আমাদের দৃষ্টি হয় উদার, তার সীমা বিস্তৃত হয়।

এতখানি ভূমিকা করবার একটা কারণ যে আছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আসল ব্যাপারটা আমরাও একটা দল বাঁধতে আয়োজন করেছি—**রংমশাল দল।**

রংমশাল যারা পড়ে, রংমশালের জন্য যারা ভাবে, খাটে, এক হিসেবে তারা সবাই এক দলের! দলের বীজ সেখানে আগে থেকেই আছে, সেই বীজকে আমরা বড় গাছ করে তুলতে চাই।

রংমশাল যখন প্রথম বেরোয় তখন তার নাম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল রংমশাল দল সম্বন্ধেও সে কথাগুলি মনে রাখতে হবে। রংমশালের আদর্শ হল **আনন্দ** আর **আলো।** রংমশাল দলেরও আদর্শ পরস্পরের জীবনে আনন্দ আর আলো আনা। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বাইরে একটা প্রতীক দিয়ে ভেতরের জিনিষকে বোঝান অনেক সময়ে দরকার হয় সেই জন্যে রংমশাল দলের ব্যাজ হবে **'মশাল'**। সুন্দর মীনা করা কাজের উপর এই ব্যাজটি তৈরী হয়েছে তোমাদের জন্য; ব্রুচের মত ব্যবহার করবে তোমাদের পোষাকের উপর। পরের পৃষ্ঠায় ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

সকলে আমাদের জন্য

নিয়মাবলী

রংমশাল দলের "ব্যাজ"

(১) রংমশালের সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা এই দলে যোগ দিতে পারবে। তার জন্যে আলাদা কোন চাঁদা লাগবে না, শুধু আমরা যে ব্যাজ পাঠাব তার খরচ এক টাকা দিতে হবে।

(২) রংমশালে একটি করে কুপন থাকবে। সেই কুপনে নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ পিতার বা অভিভাবকের নাম স্কুল কলেজ শ্রেণী, লেখনী বন্ধু চাই কিনা ইত্যাদি লিখে ও ব্যাজ ও ব্যাজ-পাঠানোর খরচ বাবদ এক টাকা পাঠালে দলে ভর্ত্তি হওয়া যাবে।

(৩ ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা বিভাগ থাকবে। মেয়েদের লেখনী বন্ধু মেয়েরা ও ছেলেদের লেখনী বন্ধু ছেলেরাই হতে পারবে।

(৪) শুধু কাগজে কলমে নয়, রংমশাল দলের সাক্ষাৎ ভাবে মাঝে মাঝে মেলা মেশার আয়োজনও আমরা করবার চেষ্টা করব।

(৫) সমিতির সভ্য বা সভ্যা হতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি দরকার। সেজন্য কুপনে তাঁদের স্বাক্ষর থাকলেই চলবে।

(৬) লেখনী বন্ধু পেতে হলে, 'দিদিভাই' c/o. সম্পাদক, রংমশাল, চিঠি দিতে হবে।

(৭) সব বিষয়ে দিদিভাই এর নির্দ্দেশ মেনে নিতে হবে। ঠিকানা দেওয়া বা না দেওয়া অন্য কোনও ব্যাপার—'দিদিভাই' এর ইচ্ছাধীন।

(৮) দিদিভাইর কথার উপর কোন বাদ প্রতিবাদ চলবে না।

(৯) ছেলেমেয়ের শ্রেণী বিভাগ ঘটলেও 'দিদিভাই'এর সবার উপর সমান দৃষ্টি থাকবে।

(১০) নানাবিধ প্রতিযোগিতা মাসে মাসে সমিতির সভ্য বা সভ্যাদের ভিতর হবে। যাদের বয়স বারো বছরের নীচে তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

চন্দ্রকান্ত ৩০।১০।৩৮

রংমশাল দল
কুপন

নাম.. গ্রাঃ নং.....................

জন্ম তারিখ.................. স্কুল বা কলেজ, শ্রেণী..

পিতা বা অভিভাবকের নাম (তাঁর স্বাক্ষর)..

ঠিকানা...

....

লেখনী বন্ধু চাই কিনা..

হবি (Hobby)..

লুকোন নাম

নীচের দুটি লাইনে ভারতবর্ষের পাচজন বিখ্যাত পুরুষ ও মহিলার নাম ও দুজন গ্রাহক গ্রাহিকা যাঁরা রংমশাল প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন (যাঁদের নাম রংমশালে প্রকাশিত হয়েছে) তাঁদের নাম লুকোন আছে। তোমরা এই সাতজনের নাম বার করতে চেষ্টা কর দেখি :—

নবীনইন্দ্রকারআকুঁবরদন্দঘোলজঠাষরহরবরবিপ্রসাশি
নেড়ুলখাজিনীগফঅতুলারুহেরথনারোসনাপ্রস্রেসরশি

পত্রিকা পাবার ১৫ দিনের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে

শ্রাবণ মাসের বাড়ী-করা প্রতিযোগিতার ফলাফল

১ম। কুমারী নীলিমা চক্রবর্ত্তী—শিমলা শৈল।
২য়। শ্রীমান রথীন্দ্র সেন—দিনাজপুর।
বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। পিন্টু, মিন্টু ও স্বরথ বসু—হুগলী

ভাদ্র মাসের জীবন কাহিনী প্রতিযোগিতায়

কোন রচনা পুরস্কার-যোগ্য হয় নাই।

স্থানাভাবে এবার গতমাসের শব্দ-চোকির ফলাফল প্রকাশ করা সম্ভবপর হল না।

নূতন প্রতিযোগিতা

অঞ্জলী স্মৃতি পুরস্কার

রংমশালের গ্রাহিকা ৺শ্রীঅঞ্জলী সেনগুপ্তার স্মৃতি রক্ষার্থে আমরা দুটি পুরস্কার ঘোষণা করছি। এই পুরস্কারের বিষয়—ছোট একটি কবিতা রচনা। কোন একটি ফুল নিয়ে এই কবিতাটি রচনা করতে হবে। ঝরঝরে ভাষায় ও ছন্দে কবিতাটি একটি ছোট্ট মালার মত করে গাঁথতে হবে।

কবিতাটি পাঠাবার শেষ দিন ১৫ই অগ্রহায়ণ। গ্রাহক গ্রাহিকা ও এজেন্টের মারফৎ যাঁরা রংমশাল নিয়ে থাকেন এই প্রতিযোগিতাটি কেবল তাঁদের জন্য। গ্রাঃ নং বা এজেন্টের নাম, বয়স ও পিতামাতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর দিতে হবে।

রংমশাল দলের বন্ধু ভাইবোনেরা—

আগামী ৫ঠা অঘ্রাণ বিকেল ৪টায় ১০, ইন্দ্ররায় রোড (রংমশাল অফিসের পাশের রাস্তা) ভবানীপুরে দলের আসর বসবে। দেখাশোনা আলাপ, পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু আমোদ প্রমোদেরও আয়োজন হবে। দেখো, আসতে যেন ভুল না হয়। সঙ্গে ব্যাজ এনো। তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ভাইবন্ধু একজন করে আসতে পারবেন।

—সম্পাদক

কার্ত্তিকের শেষে রংমশাল অফিস থেকে প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তি

শেষটা এমাসের রংমশালও খানিকটা দেরী করেই বার হল। ছুটিতে সকলে বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে তাড়াহুড়ো করেও সময় ঠিক রাখা গেল না। অঘ্রাণের রংমশাল মাসের গোড়াতেই বার হবে। পৌষ থেকে আমরা আগের মাসের শেষ তারিখেই পত্রিকা বার করে দেব।

তাড়াহুড়োয় কাজ ভাল হয় না। তবু এ মাসের রংমশাল পেয়ে তোমরা খুসীই হবে। অঘ্রাণ পৌষে পত্রিকা দেখে তোমরা চিনতে পারবে না, নতুন রকমের লেখা ছবি ইত্যাদি দিয়ে আমরা পত্রিকাখানা চমৎকার করে সাজাবো। এখন থেকে রংমশাল আমরা সত্যিকারের একখানা মূল্যবান পত্রিকা করতে চেষ্টা করব।

এমাসে সুকুমার বাবুর 'জঙ্গল' উপন্যাস সুরু হল। এদেশের শিশুসাহিত্যে 'জঙ্গল' উপন্যাস সম্পূর্ণ নূতন এক জিনিষ। উপন্যাসের নায়কটি শুধু মানুষ, তার আশে পাশে যাদের দেখা যাচ্ছে তারা কেউ মানুষ নয়—গভীর অরণ্যের প্রাণী। এ মাসে অসুস্থ শরীর নিয়ে সম্পাদক মহাশয় 'পৃথিবী ছাড়িয়ে'র শেষ কিস্তি লিখে উঠতে পারেন নি। আগামী সংখ্যায় 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখা নতুন একটি বিচিত্র উপন্যাস সুরু হবে।
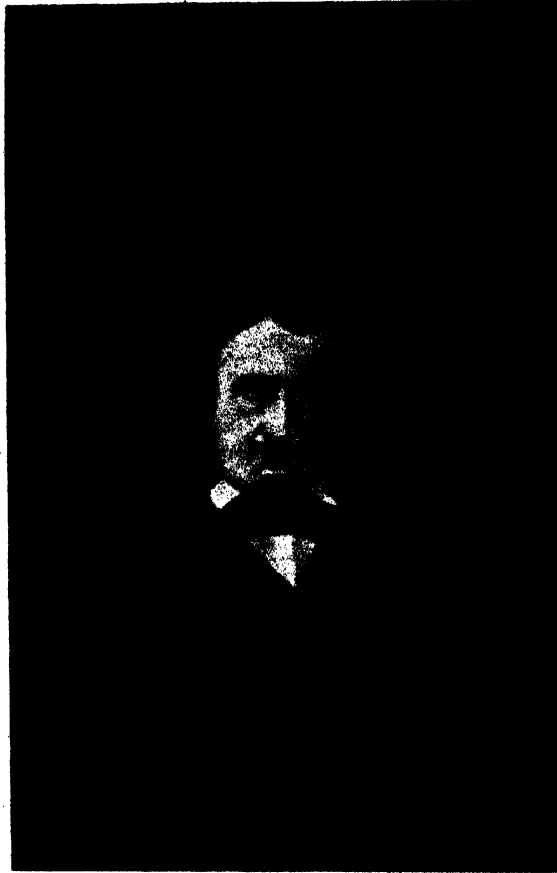
রংমশাল দলের প্রতিযোগিতা

কেবল মাত্র দলের সভ্যদের জন্য

উপরকার ছবিখানা কার? সেই মানুষটির নাম ধাম পেশা ও তাঁর জীবনকাহিনী রংমশালের এক পাতার মতন করে সোজা ঝরঝরে ভাষায় লিখতে হবে।

দুটি পুরস্কার থাকবে। একটি ছোটদের ও একটি বড়দের।

নাম গ্রাঃ নং বা এজেন্টের নাম, অভিভাবকের স্বাক্ষর ও বয়স দিতে ভুলবে না।

পাঠাবার শেষ দিন আগামী ২০শে অগ্রহায়ণ।

ঝুঁটির বাহার (ফুলের না চুলের ?)

ছোট বাক্স ক্যামেরায় তোলা ছবি, বড় আকারে "এনলার্জ" (enlarge) করা হয়েছে। কেমন সুন্দর, স্পষ্ট ছবি উঠেছে দেখ।

১৪৪ পৃষ্ঠা

খুকুর রান্না

প্রেমেন্দ্র মিত্র

খুকুমণি রান্না করে খেলার ঘরে,
মস্তিবাড়ি-ই কাক ওড়ে
আর চিল পড়ে।
—সে কি বিষম যজ্ঞি!

খুকুমণি রান্না করে কি?
কালিয়া, পোলাও, কাবাব, কোর্ম্মা,
সুক্তো, পায়েস, ঘণ্ট, দোর্ম্মা
একটি পাহাড় বাট্‌না লাগে
এক সমুদ্দুর ঘি!
চাকা চাকা তিমির দাগা
হাঙর মাছের পেটি,
জেব্রা, জিরাফ, সিন্ধু-ঘোটক
যাহার ভাল যে-টি;

খুকুমণি রান্না করে কি ?

ডিম এল সেই উট্ পাখীর আর
মুড়ো বোয়াল মাছের,
ভিয়েন হ'ল ভিসুভিয়াস্
তাত কি উনুন আঁচের !
কিস্কিন্ধ্যা ওজাড় করে
এল কলার মোচা,
শাক দ্বীপেতে যত ছিল
এল শাকের গোছা.
কচ্ছ দেশের কচু এল ওলন্দাজী ওল,
আলাস্কার আলু এবং পাটনাই পটোল,
সিমলা থেকে সীম এল আর
নিম্‌কামারীর নিম্ ;
—খুকুমণি হেঁসেলে হিমসিম !

খুকুমণি রান্না করে,

পাত পেতেছে কারা ?

তুমি, আমি, পুসি বেড়াল

ভুলো হতচ্ছাড়া ;

—ওই ভুলো কুকুর !

ভুলো কুকুর

চার

—"পট্‌কান্ ফলে কোন্ গাছে বাদশা মশায় ?"

—"কেন, লট্‌কান্ গাছে। তুমি বলতো দাদামশায় চিৎপটাং ফলে কোন গাছে ?"

—"কেন, তৃপ্‌পতাং গাছে, ফলটি খেয়েছ কি তৃপ্ত হয়ে গেছ, আর খাবার ইচ্ছে হবে না। তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাও আর শুয়ে থাকো বিছানায়।"

—"খাবার ইচ্ছে হবে না ?"

—"না !"

—"চিঁড়ে ভাজা সামনে ধরে দিলেও না ?"

—"না !"

—"চিনে বাদাম ? গোলাপী রেউড়ি ? গরম ফুলুরি ? চকলেট ? বিস্কুট ? লজঞ্জুষ—ইত্যাদি ইত্যাদি ?"

—"কিছুনা !"

—"মিশির বোধহয় আজ সেই ফল খেয়েছে দাদামশায়, আমি দেখেছি খাটিয়ায় পড়ে ভুঁড়িতে হাত বোলাচ্ছে—মটর চলবে না বলে পাঠিয়েছে—আমার ইস্কুল যাওয়া বন্ধ!"

—"আরে সে ফল পেলে তো খাবে ! পৃথিবীতে জন্মায় না সে ফল—দেবলোকের গাছে স্বর্গের বাগানে ফলে। মিশির কাল মটর ভাজা খেয়েছে বেশী করে তাই পেট ফুলে ঢোল হয়েছে, উঠতে পারছে না, কাল ঠিক উঠবে।"

—"কাল রবিবার, ইস্কুলের ছুটি, উঠলেও আমি যাচ্ছিনে। সোমবারের আগে সেই গাছ একটা আনাতে পারো না দাদামশায় ?"

—"আমাদের যুধিষ্ঠির যদি বেঁচে থাকতো তো আনতে পারতো।"

—"যুধিষ্ঠির কে ?"

—"জানো না ?"

—"না, হাঁ মনে পড়েছে, ভীমের দাদা স্বর্গে হেঁটে গিয়েছিল !"

—"আরে সে যুধিষ্ঠির কেন হবে ! এ হল পরীক্ষিৎ মালীর ছেলে যুধিষ্ঠির ? ধর্ম্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির নয়।

—"সে কি করতো ?"

—"উড়ে রামায়ণ পড়তো সন্ধ্যে বেলা, দিনের বেলায় সবজী বাগানে মাটি খুঁড়তো। সূর্য্যিকে বলতো সে 'মহাপড়ভু', আমাকে বলতো সে 'ড়বনীবাবু, অবধাড় নমসকাড়' ; 'অ' বলতে সে বলতো 'ড়', 'র' বলতেও সে বলতো 'ড়'। অড়হর ডালকে সে বলতো 'ড়ড়র ডাল', রামায়ণকে বলতো 'ড়ামায়ণ', 'অ' গুলো সে যোগ করে দিত কথার শেষে। কানন্ বলতে বলতো 'কাননঅ' ; শ্রাবণ বলতে বলতো 'সড়াবনঅ'।"

" 'আ' বলতে পারতো ?"

"এক একবার পারতো, এক একবার পারতো না। আম গাছকে কখনো বলতো 'অমগছ্অ' 'কখনো বলতো 'আম্বগাছ্অ'।"

—"তার পড়াশুনো খুব বেশী ছিল না বুঝি ?"

—"খুব ছিল, রামায়ণ মহাভারত গড় গড় করে পড়ে যেতো কিন্তু নিজের নাম যুধিষ্ঠির বলতে তার চক্ষুস্থির হয়ে যেতো।"

—"কি বলতো সে নিজের নাম ?"

—"আরে সেই নিয়েই তো কথা, শোন না বলি—

ছিরে মেথর ছিল ইংরাজি বলতে পাকা। মদ না খেলে সে সাধু বাংলায় কথা কইতো। মদ খেয়েছে কি বেরিয়েছে কুইক ইংলিশ ফর্ ফর্—ড্যাম্ ইউ রাস্কেল, গো টু হেল, ব্লাডী—এক্স নম্বর ওয়ান, ব্লডি ফুল।

আমি তখন ভালো ইংরিজি শিখিনি। বিদ্যে ফলাতে গেলাম তার কাছে, শুধোলেম ইংরিজিতে—'ছিরে মেথর, হোয়াট নেম ইউ ?'

সে খাঁটি ইংরিজিতে জবাব দিলে—'মাই নেম্ ইজ শ্রীরাম—নট্ ছিরে মেথর।'

আমি বল্লেম—"মেথর নয় তো হোয়াট্ ইউ !"

সে হেসে বল্লে—"গো এণ্ড রীড—ফাষ্ট বুক, প্যারিচাঁদ সরকার—আপন্ গড্ আই এম নট্ মেথর, হাইকাষ্ট স্কেভেঞ্জার। দীন দরিদ্রকে উপহাস করিয়া লজ্জিত করিবেন না—আমি অতি অজ্ঞ।"

—"তুমি কি করলে দাদামশায় ?"

—"আরে ভাই কি ইংরিজি কি বাংলাতে হার মেনে আমি বোকা বনে গেলাম—কান লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়।"

—"তারপর ?"

—"তারপর বলি শোন। ইস্কুলে আমার পাশে যে বসতো, সে ডবল প্রমোশান পেয়ে ক্লাস উঠে গেল—আমি ইংরেজি বাংলা ছুয়ে ফেল হয়ে হেডমাষ্টারের হাতে পায়ে ধরাধরি করে ক্লাসের সেকেণ্ড বেঞ্চিতে বসবার হুকুম আদায় করে পূজোর ছুটিতে বাড়ি এলেম যখন তখন হাফ হলিডের লেজুরটুকু আছে বাকিটা বাদ।"

—"মার খেলে না বাড়ীতে এসে দাদামশায় ?"

—"ক্ষিদে ছিল না ভাই, ছুটো কুচো গজা খেলাম, রামলাল বল্লে 'হয়েছে তো প্রমোশন ?' আমি বল্লেম—'হয়েছে, দুধ খাবো না, নিয়ে যাও।' প্রমোশান নিয়ে আর কিছু গোলমাল হল না।"

—"কেন ?"

—"আবার কেন ? দুধের বাটি চাপা পড়ে গেল।"

—"তারপর ?"

—"কত আর দুধের বাটি চাপা দিই। মাষ্টার গেল টের পেয়ে—সেকেণ্ড বেঞ্চির উপরে আর উঠতে প্রমোশান হয় নি। 'দী র‍্যাম' একশোবার তার মানে একশো বার লেখার হুকুম দিয়ে পূজোর ছুটিতে বাড়ী গেল। ইস্কুল ঘোড়া পূজোর ছুটি পেলে, আক্কেল সহিস সেও পেলো—কেবল আমিই পেলেম না ইস্কুলের পড়া থেকে ছুটি। রামলাল চাকর খাতা বেঁধে আনলে রুল টেনে।

—"কি মুস্কিল, দাদামশায় কি করলে ?"

—"কি আর করবো ! রুল টানা খাতার পাতা তো নয়, যেন ইঁদুর কলের শিক পরানো দরজা !"

প্রথম পাতায় 'দী র‍্যাম' ভর্ত্তি করতে, আর 'দী র‍্যাম' কটা পড়লো খাঁচাকলে গুনতে বষ্টির সকাল কাটলো। দ্বিতীয় পাতা লিখবো, গেছি ভুলে 'দী র‍্যাম্' মানে। দী র‍্যাম মানে আর কিছুতে মনে পড়ে না—'দী র‍্যাম' মানে কি লিখি ! মানের পাতা খালি রেখে 'যাই' বলে এক হাঁক দিয়ে মরিয়া হয়ে দৌড়—বই সেলেট খাতা ফেলে। এমনি রোজই হয়, 'দী র‍্যাম্' পর্য্যন্ত এগিয়ে মানেতে গিয়ে ঠেকি। হাই তুলছো যে বাদশা বাবু, ভালো লাগছেনা গল্প ?"

—"লা-গ-চে বলে যাও।"

—"ঐ খাতা লিখতে লিখতে কোন দিন ঘুম পায়, কোন দিন মানে ভেবে ঘুম হয়না রাতে। পাছে হঠাৎ ছুটি ফুরিয়ে যায় মাষ্টার এসে পড়ে—এই ভাবনায় ছুটোছুটি করতে

পারিনে ভালো করে, ক্ষিদেও হয়না, দুধের বাটি ভর্ত্তিই থাকে পড়ে রাতের বেলায়। এই অবস্থায় একদিন ছিরে মেথরের শরণ নিলুম।

—'দী র‍্যামের' মানে বাংলায় বলতো দেখি, কেমন পারো?'

—'কেন ছাগলীর মায়ের ভর্ত্তা।'

—বস্ আর পায় কে! পাতাজোড়া গোটা গোটা 'দী র‍্যাম' আর ছাগলীর মায়ের ভর্ত্তাতে খাঁচা কল ভর্ত্তি করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ভাই তোমার দাদামশায়।"

—"তারপর?"

—"দিন দিন মোটাতে থাকলেম, দুধের ক্ষিধে বেড়ে গেল। রামলাল থেকে থেকে ভয় দেখায়—'খাতা লিখছ না বলে দেবো।'

—'দিও বলে, আমি খাতা লিখে শেষ করে দিয়েছি—দেখে নাও।'

'এক পাতায় একশোটা করে লেখা দরকার, এ যে একটাতেই পাতা ভর্ত্তি করে রেখেছ। এ খাতা চলবেনা আমি আবার খাতা আনবো।'

—'বারে আমি দুবার করে খাতা লিখবো নাকি?'

—'চল খাতাঞ্চিখানায়, যোগেশ দাদা এর বিচার করবেন।'

—'চল, চলনা তুমি আগে চল, আমি যাচ্ছি সঙ্গে।'

—"গেলে না সরলে মাঝপথ থেকে দাদামশায়?"

—"আরে ভাই সে রামলাল তাতে কদিন দুধ না পেয়ে চটেছে—গ্রেপ্তার করে হাজির করলে খাতাঞ্চিখানায় বিচারকের সামনে। কদম ছাঁটা পাকা চুল বুড়ো বাঘের মত পাকা গোঁফ গলায় শাদা সাপের মত পৈতে, বড়ো বড়ো চোখ সামনে খাতা বাক্সো পাশে রূপো বাঁধা হুঁকো—ফরাসে বসে উঁচু বৈঠকের পরে।

—'কি রামলাল, ছোট বাবাকে ধরেছ কোন অপরাধে?'

—'আজ্ঞে খাতা লেখায় ফাঁকি দিচ্ছেন।'

—'খাতা দাও, এক কল্কি তামাক সাজো দেখি। বোসো ছোটবাবা তক্তায় উঠে বসো।'

আমি উঠে বসতে বল্লেন—'গোবর্দ্ধন দাও তো তোমার চশমাটা, ভালো করে বিচার করে দেখি খাতা।'

আমি বল্লেম—'চশমা যে তোমার নাকেই রয়েছে যোগেশ দা।'

—'ছোট বাবা হাসালে। সুক্ষ্ম বিচার করতে হলে ডবল চশমার দরকার।'

—আমি বল্লেম—'আমার দোষ নেই, দুধের বাটি দিইনি বলে রামলাল রেগেছে।'

—'আচ্ছা সে বিচার পরে, দেখি খাতা, কি লিখতে দিয়েছিল মাষ্টার?'

—'দী র‍্যাম আর তার বাংলা মানে।'

—'বেশ, দী র‍্যাম—এতো দিব্বি হয়েছে, পাতা জোড়া খাতা দেখিতো মানেটা—'ছাগলীর মায়ের ভর্ত্তা' বলেই বাক্সতে এক চাপড়। রামলাল হুঁকো হাতে হাজির ঠিক সময়ে। যোগেশদা তেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন—হুঁকো হাতে পেয়ে ঠাণ্ডা।'

—'রামলাল ছোট বাবার দুধ কতটা বরাদ্দ ?'

—'আজ্ঞে দেড় সের দুবেলা।'

—'গোবর্দ্ধন দেখতো খাতা।'

গোবর্দ্ধন খাতা ধরে দিলে কিছু না বলে।

—'যাও ছোটবাবা তুমি খালাস—লেখা খুব ভালো হয়েছে। আমি দৌড়।"

—"তারপর দাদামশায় রামলালের কি হল ?"

—"তা দেখবার ইচ্ছেও হলনা সময় ও হলনা। বৈকেলে দেখি দুধের বাটিতে পুরু সর—'ও রামলাল আমি সর খাইনে যে।'

—'হুকুম হয়েছে ঘন দুধ খাওয়াতে যোগেশ মজুমদারের।'

—'সর তুলে নাও।'

—'এক দিক ভেঙ্গে চুমুক দাওনা—দুধ আছে তলায়।'

চুমুক দিই' দুধের গন্ধ পাই দুধ পাইনে।

—'একি হল ? দুধ কোথা গেল ?'

—'দুধ ঘন করতে করতে মরে গেছে—সরটা খেয়ে ফেল।'

—'না কাল থেকে বল্‌কা দুধই দিও।'

—'তাই হবে কিন্তু মজুন্দার মশায় আর না টের পায়, আমার তা হলে তোমার চাকরী করা চলবেনা।'

—'কোথায় যাবে রামলাল ?'

—'জবাব হলে আর কোথায় যাবো ?—বর্দ্ধমানে দেশে চলে যাবো।'

—'তা হলে সীতে ভোগ এনে দেবে কে ?'

—'তবে আর নালিশ করোনা দুধের।'

—'করি তো আমার নাম নয়—

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাজী মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক

গত ৯ই নভেম্বর ইস্তাম্বুল সহরে সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরেই তুরস্কের প্রভাতসূর্য্য অস্তমিত হ'ল। ঐ দিন প্রভাতে ৭—৫ মিনিটে বর্ত্তমান তুরস্কের সৃষ্টিকর্ত্তা ও অধিনায়ক, গাজী মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক দেহত্যাগ করেন।

কামালের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত তোমরা আগেই রংমশালের পাতায় পড়েছ। তাঁর নামের মধ্যে দুটি শব্দ লক্ষ্য করবার বিষয়—গাজী ও কামাল। 'কামাল' নাম তাঁর অঙ্কের মাষ্টার-মশায়ের দেওয়া, অর্থ, সাবাস্! 'গাজী' অর্থে বিজেতা। ১৯২১ সালে ২২ দিন ক্রমান্বয় যুদ্ধের পর কামাল যখন গ্রীক সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত করেন এবং তুরস্কের জাতীয় গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জাতীয় মহাসভা তাঁকে 'গাজী' উপাধিতে বিভূষিত করেন।

যে তরুণ ছাত্র তার গণিত-শিক্ষকের কাছ থেকে 'কামাল' আখ্যা পান, উত্তর জীবনে মুগ্ধ পৃথিবী তাকেই আবার বলেছিল, কামাল—সাবাস্। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় গৌরবের বস্তু বোধ হয় আর নেই। বাল্যকালে কামাল তাঁর পিতাকে হারান, কিন্তু মায়ের স্নেহ এবং শাসন থেকে বঞ্চিত হন নি। যুবক এবং প্রবীণ কামাল হতাশ হয়ে অনেকবার ছুটে এসেছেন মায়ের কাছে সান্ত্বনা পেতে। তাঁর পিতা ছিলেন কাঠের ব্যবসায়ী এবং কামাল নিজেও জীবন আরম্ভ করেন অখ্যাতনামা সৈনিকরূপে। কিন্তু জীবনের শৈশবকাল থেকেই আরম্ভ হয় ভাগ্যের পরীক্ষা। যেদিন তাঁর সেনাবিভাগে নিয়োগের বার্ত্তা প্রকাশিত হয় সেদিনই তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের জন্য তিনি গ্রেফ্‌তার হন এবং ড্যামাস্কাসে নির্ব্বাসিত হন।

ড্যামাস্কাসে নির্ব্বাসন কামালের জীবনে বৃথা হয় নি। এখানেই কামাল প্রথম দেখেন, বিরাট অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধোগতির চিহ্ন। তরুণ সৈনিক কামালের রাজনীতির প্রতি চিরকালই টান ছিল, কিন্তু ড্যামাস্কাসে তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবনের গোড়াপত্তন হ'ল। আরম্ভ হ'ল গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির প্রতিষ্ঠা, তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথ থেকে উদ্ধারের জন্য। আরম্ভ হ'ল কামালের বহুমুখী প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ।

সাধারণতঃ দেখা যায়, বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতিভা একমুখী হয়। অর্থাৎ তাঁদের প্রতিভা যুদ্ধক্ষেত্রে বা সামরিক কার্য্যকলাপেই আবদ্ধ থাকে। রাজনৈতিক ব্যাপারে বা রাষ্ট্রশাসনে খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করবার অভিলাষ বা ক্ষমতা তাঁদের প্রায়ই থাকে না।

সামাজিক সংস্কার কার্য্যে তো নয়ই। তুরস্কের সৌভাগ্যের বিষয় যে কামাল আতাতুর্ক'এর প্রতিভা একমুখী ছিল না। কামালের প্রতিভা যদি সামরিক ব্যাপারেই আবদ্ধ থাকত, একথা নিঃসন্দেহ যে তুরস্কের স্বাধীনতা এতটা স্বস্তিকরী হত না। কামালের যুদ্ধকৌশলে দেশ হয় তো বিজাতীয় পরাধীনতার নাগপাশ হ'তে মুক্তি পেত, কিন্তু দেশের ভিতরকার শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেত না।

তোমরা হয় ত জিজ্ঞাসা করবে, ভিতরকার শত্রু কে? এ প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া যায় না। ভিতরের শত্রু আমরা নিজেরা। আমাদের চরিত্রের অবনতি, সামাজিক কুসংস্কার, জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব, গতানুগতিকতা—দেশের উন্নতির পথে অন্তরায় এর চেয়ে বেশী কি আছে? কামালের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে তুরস্কের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সভ্য-জগতের কাছে সেদিন সে অবহেলার—হয় তো অবজ্ঞার পাত্র; বিংশ শতাব্দীর প্রগতির যুগে সে-ছিল অপাংক্তেয়। রাজনীতি ছিল ঘরোয়া কলহ-বিবাদ-হিংসার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। জাতীয় স্বার্থ ও রাজ-স্বার্থ ছিল বিপরীত ভাবাপন্ন। কামালের জীবনে বহুবার এইরূপ প্রভুর কর্ম্মে ও বীরের ধর্ম্মে সংঘাত লেগেছিল। কিন্তু প্রতিবারই কামাল বীরের ধর্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলে বরণ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই একনিষ্ঠতা, একান্ত আত্মনির্ভরতা লক্ষ্য করবার বিষয়। যখন সমগ্র তুরস্ক তাঁকে সন্দেহের চক্ষে, ভয়ের চক্ষে দেখছে, অবিশ্বাস করছে, হয়তো তিনি নিরাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন, তবুও তিনি তাঁর পথ হারান নি। সেই পথ তুরস্কের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পথ। কামাল শুধু বীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। সাধারণতঃ রাজনীতিক বললে যা আমরা বুঝি—অর্থাৎ "বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ, রয়েছে রেশ কাণে, কি যেন করা উচিত ছিল কি করি তা কে জানে" এই ধরণের রাজনীতি যাঁরা প্রচার করেন ও বক্তৃতা দেন, কামালকে এই ধরণের রাজনীতিক বললে তাঁর স্মৃতির অবমাননা করা হবে। কামাল ছিলেন তুরস্কের জাতীয়তা গঠনকারী। দশ বৎসরে তিনি শতাব্দীর চেষ্টা সফল করেছেন, একথা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। অপাংক্তেয় তুরস্ককে তিনি জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন না হোক, অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে অধিকার দিয়ে গেছেন।

এই চেষ্টার প্রতীকরূপে কামালকে আমরা পাই দুইটি বিভিন্নরূপে। প্রথমতঃ বীর কামাল, দ্বিতীয়তঃ রাজনীতিক এবং সমাজগঠনকারী কামাল। দার্দ্দেনালিশ যুদ্ধে যখন কামাল শক্তিশালী ব্রিটিশবাহিনীর প্রতিরোধ করেন—শুধু প্রতিরোধ নয়, বিধ্বস্ত করেন তখন বিস্মিত য়ুরোপ তাঁকে বলেছিল—কামাল—সাবাস্! *আবার ১৯২১ সালে য়ুরোপীয়

---

* Chonuk Bair (-Dardenelles) এর যুদ্ধে তুরস্কের ৮ম এবং ১৯শ বিভাগীয় সৈন্য ব্রিটিশ সৈন্যদল 6th North Lancashires এবং 5th Wiltshires সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।

সম্মিলিত শক্তির প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ গ্রীকবাহিনীকে যখন তিনি সাকারিয়ার যুদ্ধে পরাজিত করে' স্মার্ণায় গ্রীক অত্যাচারের প্রতিশোধ নেন, তখন তাঁর দেশবাসী তাঁকে বলেছিল, গাজী কামাল, সাবাস বিজেতা! বীর কামালের নাম তুরস্কের ইতিহাসে এই দুটি স্মরণীয় ঘটনায় অমর হয়ে থাকবে।

ছোট ছোট ঘটনা থেকে মানুষকে চেনা যায়। দার্দ্দেনালিশ যুদ্ধের কথাই বলি। সত্য কথা, গল্প নয়। তাঁর সৈন্যদলকে সাহস দেবার জন্যে কামাল অনেক সময় অযথা বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, প্রতিবারই যেন কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছে। একবার যুদ্ধকালে কামাল একটা নূতন ট্রেঞ্চের নিকট বসেছিলেন এমন সময় শত্রুপক্ষ সেই ট্রেঞ্চ অভিমুখে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। গোলার উপর গোলা পড়তে থাকে চারিধারে. আর কামাল সেখানে বসে নিশ্চিন্তমনে ধূমপান করছেন! তাঁর সহ-সেনানায়করা বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন সেখান থেকে তফাতে আশ্রয় নেবার জন্য। কামাল হাসিমুখে তাঁদের বল্লেন. "আমি যদি এখন ভীরুর মত আশ্রয় খুঁজি, আমার সৈন্যদল কি মনে করবে? তারা কি প্রাণ দিচ্ছে না?" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কামালের চারিধারে গোলাবর্ষণ-সত্ত্বেও কামালের কেশাগ্র পর্য্যন্ত আহত হয় নি।

আরেকবার কামাল গ্যালিপলি থেকে মোটরে আসছিলেন, এমন সময় একটা ব্রিটিশ হাইড্রোপ্লেন (এরোপ্লেন যা' জলেও ভেসে যেতে পারে) তাঁর গাড়ীর উপর বোমা ফেলে। ফলে রাস্তায় সম্মুখ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ বিধ্বস্ত হয়, গাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী কাচ ভেঙ্গে যায়, ড্রাইভার নিহত হয়, কিন্তু কামালের কোন ক্ষতি হয় না। ব্যাপারটা আশ্চর্য্য নয় কি? আরেকবার রাত্রি ৩ টায় চোনুক বেয়ারের বিখ্যাত যুদ্ধে কামাল তাঁর ট্রেঞ্চ থেকে বাইরে আসছেন এমন সময়ে ইংরাজ কামান নিঃসৃত একটি গোলা ঠিক তাঁর অনতিদূরেই পড়ে। গোলার একটা টুকরা লাগে কামালের হাতঘড়ির উপর। হাতঘড়িটি অবশ্য চূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু কামালের একটি কেশাগ্রও জখম হয় নি। তুরস্কের ভাগ্যবিধাতা হয় তো নিজে কামালের জীবনরক্ষার ভার নিয়েছিলেন।

যুদ্ধ জয় করে কামাল স্থির থাকতে পারেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তুর্কীকে নূতন করে গড়ে তোলা। সুলতানী রাজত্বে তুরস্ক হয়ে উঠেছিল বিদেশী শক্তির ক্রীড়নক, কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌ হয়ে উঠেছিল বিদেশী শক্তির প্রতিভূদের লীলাভূমি। দেশের সর্ব্বত্রই গুপ্তচরের হুমকিতে লোকে সন্ত্রস্ত থাকতো, তিনটি লোক জমা হলেই সেখানে আসতো একটি চতুর্থ লোক, গুপ্তচর। সুলতান নিজে প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষে বিদেশী শক্তির বশ্যতা স্বীকার করায় তুরস্ক জাতির বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তারা খুঁজছিল এমন কাউকে

যার মন্ত্র হবে দেশের স্বাধীনতা এবং চাইবে তুরস্কের ভীরু, কাপুরুষ স্বার্থান্ধ সুলতানকে সরিয়ে প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা। কামাল দেশবাসীর কাছে সেই মন্ত্র নিয়ে এলেন। কিন্তু এই মন্ত্রের সাধন যুদ্ধ জয় অপেক্ষাও কঠিন। বাহিরের শত্রুকে চেনা যায়, কিন্তু ঘরের শত্রুকে চেনা যায় না। কিন্তু কামাল ছিলেন দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সাধক, তাঁর লক্ষ্য হতে ক্ষণকালের জন্যও বিচ্যুত হন নি। কামালের চরিত্রের একটা গুণ ছিল যে, যে কার্য্যে যত বিপদ বেশী, যে কার্য্য যত বেশী কঠিন, সেই কার্য্যেই তার উৎসাহ তত বেশী। অনেক বাধা বিপত্তির পর, ২৯শে অক্টোবর, ১৯২৩—ঠিক পনর বৎসর পূর্ব্বে, কামাল তুরস্কে গণতন্ত্রের ঘোষণা করলেন। সুলতান-খলিফার রাজত্ব তুরস্কের ইতিহাসে নির্ব্বাপিত হন।

দেশে প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা হলেও কামালের কাজ শেষ হল না। বরং তাঁর সত্যকারের কাজ—জাতীয় জীবন পুনর্গঠন—আরম্ভ হল। কামাল আতাতুর্ক নূতন গণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি হলেন। নব-উদ্‌বুদ্ধ প্রজাশক্তির প্রথম অধিনায়করূপে তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিকের উন্মেষ হল। তুরস্ক কামালকে পেলে সমাজসংস্কারক রূপে। মুসলমানের মত সংরক্ষণশীল জাতির মধ্যে সমাজসংস্কার যে কী কঠিন কাজ তা বর্ণনা করা যায় না। কামাল সেই কার্য্যে অগ্রণী হলেন। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির! আরম্ভ হ'ল সমাজসংস্কার। আরম্ভ হ'ল দশ বৎসরের মধ্যে একশ' বৎসরের ইতিহাস লেখা। কামালের আদর্শ হ'ল য়ুরোপীয় সভ্যতা। মধ্যযুগ প্রয়াসী অ-সভ্যতার কবল থেকে মুক্ত ক'রে তুরস্ককে য়ুরোপের অঙ্গীভূত করা হ'ল কামালের সংকল্প। রাষ্ট্রশাসনের খুঁটিনাটি কামাল হাতে নিলেন। আলস্যপ্রবণ সুলতানী রাজত্বের পরিবর্ত্তে এলো একটা বিরাট শক্তির প্রেরণা। য়ুরোপীয় আচার ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে' তুরস্কের নবজীবন আরম্ভ হল। জাতীয়তাকে মৌলানা মৌলভীদের অন্ধ কারাগার হতেঁ উদ্ধার করে আনা হল য়ুরোপীয় সভ্যতার আলো হাওয়ার মাঝখানে। প্রতিবাদ হল, বাধা হল, কামালের উপর অতর্কিত আক্রমণও হ'ল। কিন্তু যে ব্যক্তি দার্দ্দেনালিসের উপান্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে ভয় পায় নি, সে কি ভয় পায় এই প্রতিবাদ এবং বাধায়?

দ্রুত চললো কামালের সংস্কারকার্য্য। নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি হলো। বিস্তৃত ভূমিকা বা আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। কারণ কামালের হুকুমই হ'ল আইন! হুকুম হল, কেউ ফেজ পরতে পারবে না। হ্যাট পরতে হবে। প্রতিবাদ হল, হ্যাট কাফেরে পরে। কেউ ফেজ ছাড়লো, কেউ ছাড়লো না। হুকুম হলো যারা ফেজ ছাড়বে না তারা হাজতে যাবে এবং পুলিশের হাতে মার খাবে। গেলো সব ফেজ! এদিকে আবার হ্যাট পাওয়া

যায় না। শেষকালে লোকে মেয়েলি হ্যাটও পরতে লাগলো। দোকানীদের খুব মজা! চড়াদরে হ্যাট বিক্রী হতে লাগলো।

হুকুম হলো, মেয়েদের বুরখা ছাড়তে হবে, জুজুবুড়ী সেজে বেড়ালে চলবে না। নারী পুরুষের সমান অধিকার হবে। আজ তুরস্কের নারী য়ুরোপের যে কোনো দেশের নারীর সমকক্ষ। মেয়েরা ব্যায়াম শিখছে, টেনিস খেলছে বক্তৃতা শুনছে, ঘরের বাইরে যে জীবনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে যোগ রাখছে। গ্রামে গ্রামে বসেছে Peoples' House —সেখানে পুরুষ মেয়ে শিল্পসাহিত্যকলা আলোচনা করছে, তুরস্কের নূতন সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। দেড় হাজার বৎসরের পুঞ্জীকৃত সামাজিক আবর্জ্জনা বৃহত্তর পৃথিবীর সভ্যতার হাওয়ায় তুরস্কের অতীত ইতিহাসে বিলীন হয়ে গেছে। আজ প্রায় কুড়ি লক্ষ নারী ভোটের অধিকার পেয়েছে। শুধু তাই নয়, নব-নির্ব্বাচিত আইন সভায় ১৫ জন নারী সভ্যা নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দশজন স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, চারজন টাউন কাউন্সিলের সদস্য, একজন ডাক্তার এবং দুজন কৃষিজীবিনী।

তুরস্কের ভাষা থেকে আরবী এবং ফার্সী শব্দ উচ্ছেদ করা হয়েছে, এবং সেই সমস্ত শব্দের তুর্কী প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। আরবী হরপ উঠিয়ে তার বদলে রোমান হরপ (অর্থাৎ যেমন ইংরাজী হরপ) বসান হয়েছে। কামাল নিজে ব্ল্যাকবোর্ড এবং খড়ি হাতে ঘুরেছেন রোমান হরপের উপকারিতা দেখাবার জন্য।

কামাল যখন প্রথম এই সংস্কারকার্য্য গ্রহণ করেন, তখন তুরস্কের শতকরা ৯৫ জন অধিবাসী ছিল অশিক্ষিত। আজ ঘরে ঘরে শিক্ষার প্রসার হয়েছে। আজ তুরস্কের সহর যে কোন য়ুরোপীয় সহরের সমকক্ষ। অথচ তুরস্কের প্রধান সহর এঙ্গোরা আগে ছিল কাদায় ভরা, পর্ণকুটির ছিল সাধারণের আস্তানা। সে এঙ্গোরাকে আজ আর চেনা যায় না। শিল্পে, বাণিজ্যে, চারুকলায় আজ তুরস্ক প্রাচ্য প্রগতিবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে।

৬০ বৎসর বয়সে কামাল আজ ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। রেখে গেছেন তাঁর বিরাট কর্ম্মশক্তির উদাহরণ। যে য়ুরোপীয় শক্তিসমুদয় তুরস্ককে অবজ্ঞা করত, আজ তারা তুরস্ককে তাদেরই একজন বলে মেনে নিয়েছে। বিদেশী আচার ব্যবহার গ্রহণ করেও তুরস্ক তার সত্ত্বা হারায় নি। আজ তুরস্কের দিকে চেয়ে এবং তার অতীত ইতিহাসের কথা স্মরণ করে' বলতে ইচ্ছা হয় না কি— কামাল! তুনে কামাল কিয়া ভাই!

ব্যাঙের পাতা

ঘ্যাঙর ঘ্যাক্ ঘ্যাক্

অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যাঙলা থেকে চলতি বাংলায় তর্জমা করলে এর মানে হয়—এ পাতাটা আমার।

শুনেই বুঝি চোখ কপালে উঠলো, মুখটা হয়ে উঠল, হাঁড়ির মত!

কেন বলত বাপু? আমাদের কি একটা পাতা থাকতে নেই?

তোমাদের ত কত কাগজ আছে—কাগজের কত ভাগ বিভাগ—গোটা রংমশালটাই তোমাদের। আর আমাদের ত খালি একটি পাতা বই ত নয়। তাতেই এত হিংসে!

আমরা কি এতই ফেলনা?—আমরা মানে, আমি, আর গঙ্গাফড়িং আর ঝিঁঝিঁ পোকা, আর.. ইত্যাদি!

আমরা দস্তুরমত সম্পাদক মশাইয়ের কাছে দরখাস্ত করে এ পাতাটা চেয়ে নিয়েছি। এখানে শুধু আমাদের কথা লেখা হবে,—আমাদের গল্প কবিতা, প্রবন্ধ খবরাখবর—এইসব।

বুঝতেই পারছ বোধহয় সম্পাদনাটা আমাকেই করতে হবে। আর আমি ছাড়া সম্পাদক হবার মত আছে-ইবা কে। গলার জোর যে আমার সব চেয়ে বেশী এবারের বর্ষার পালার পাল্লায় তা ভালো রকম প্রমাণ হয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁপোকা হয়ত একটু আপত্তি করত, কিন্তু তাকে সহকারী সম্পাদক করে নেওয়ার পর থেকে আর
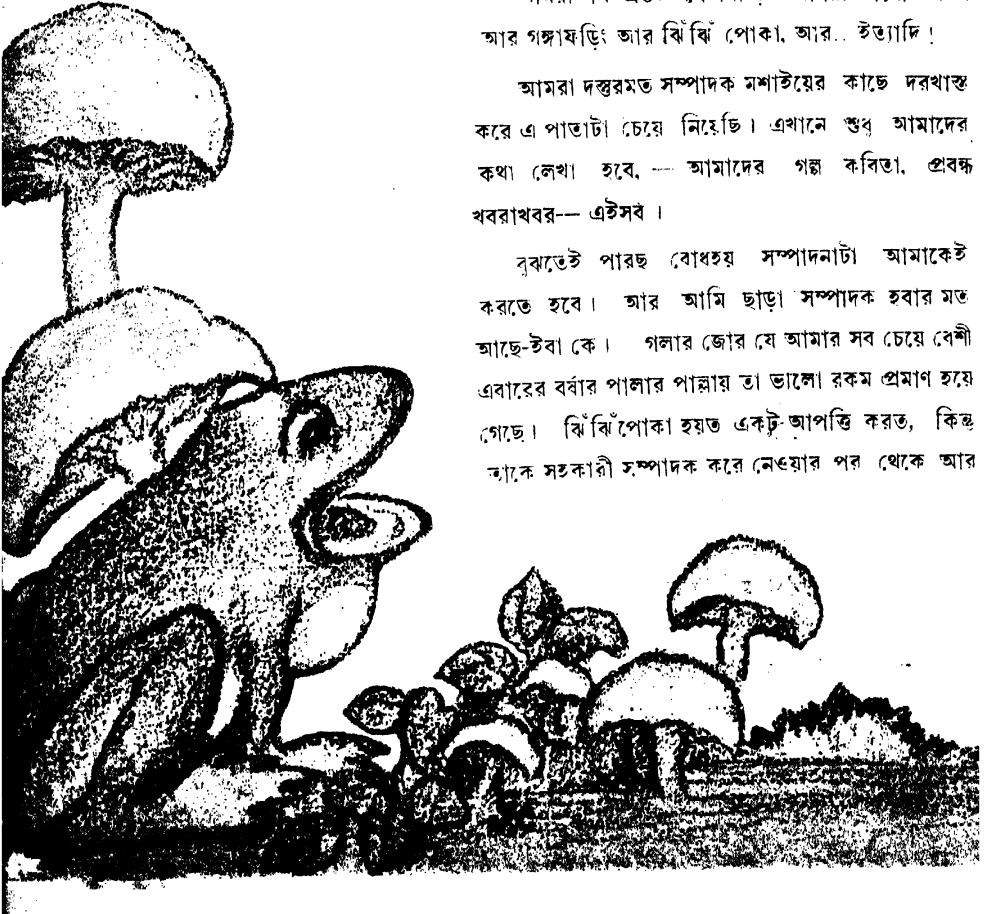
সে গোলমাল করেনি। ঝিঁঝিঁ পোকার ওপর আমার অবশ্য বিশেষ ভরসা নেই। তার স্টাইলটা আমার, একদম পছন্দসই নয়—কিন্তু একজন কাউকে নেওয়া ত দরকার। ঝক্কি অবশ্য সব আমাকেই পোয়াতে হবে।

তোমাদের কিরকম লাগবে অবশ্য জানি না! তোমরা আমাদের মানতেই চাও না। ছাপাখানায় ত আর একটু হলেই ব্যাঙের পাতাকে ব্যাঙের ছাতা করে বসেছিল! ভাগিস শেষ প্রুফটা দেখেছিলুম।

ব্যাঙের পাতাকে ছাতা ভাবা কিন্তু অত্যন্ত অন্যায়! আর এ অন্যায় ভুলটা দেখি তোমরা সবাই কর। ব্যাঙ হলেই যেন ছাতা থাকতে হবে। কেন হে বাপু? আর কিছু যেন থাকতে নেই।

আমি সাফ জানিয়ে দিচ্ছি, ও ছাতার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

আসলে আমাদের কোন ছাতা-ই নেই। ছাতা ব্যবহার করা আমাদের শাস্ত্রে বারণ। জল কাদায় কেউ ছাতা নিলে আর ব্যাঙ সমাজে মুখ দেখাতে হবে না তাকে। তখখুনি একঘরে!

সুতরাং ব্যাঙের ছাতা বল্লে যে আমাদের গালাগাল দেওয়া হয় একথাটা মনে রেখো।

আমাদের সম্বন্ধে তোমাদের আরো অনেকগুলো অত্যন্ত ভুল ধারণা আছে। না জেনে শুনে তোমরা যা খুসি বলে বসো—যেমন কথায় কথায় আমাদের অপমান করে বল—ব্যাঙের আধুলি!

পরের বারে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। আজ এই পর্যান্ত!

পুঃ—স্থানাভাবে এবার ঝিঁঝিঁ পোকার কবিতাটা ছাপা হ'ল না বলে সে অত্যন্ত দুঃখিত।

আমি কিন্তু নয়।
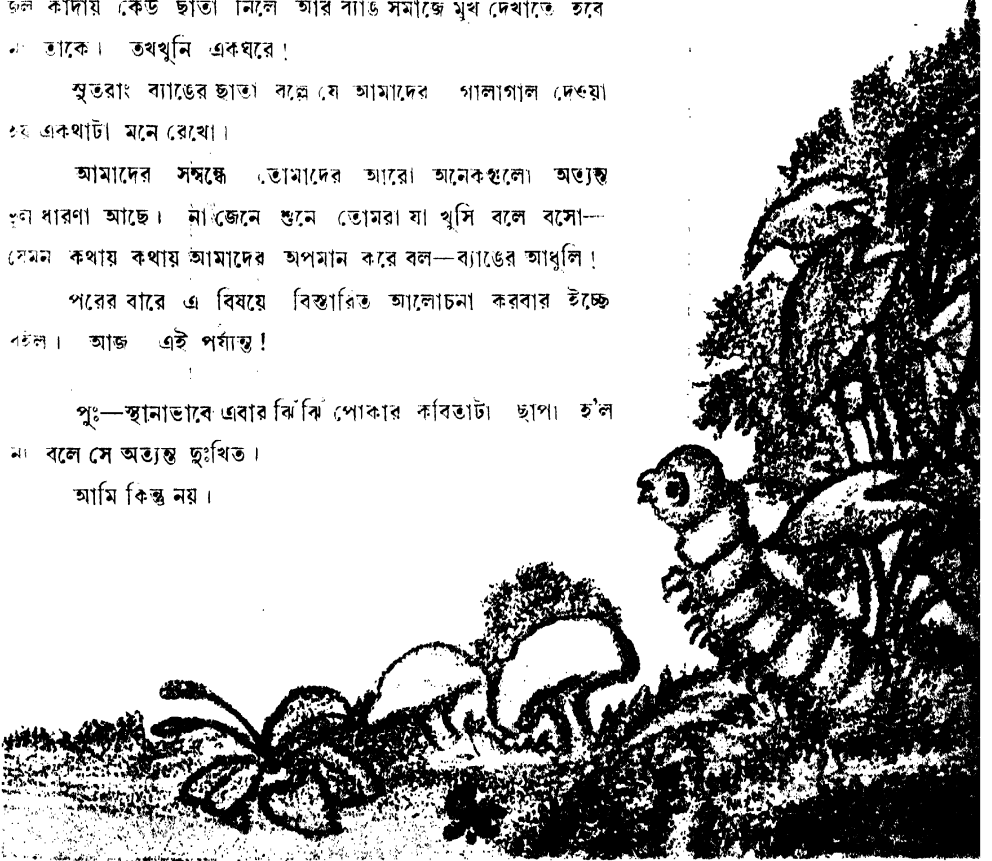
সোডার বোতল

বোতল হুঁ হুঁ বোতল নয়
ফোঁস ফোঁসিয়ে কোন্ কথা কয়
থামরে বাপু থাম
ছেঁই ছেঁই ছেঁই শোন্‌না মানা
বে-আক্কেলে ভূতের ছানা
ছুটল কালো ঘাম।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

এরপর কয়েকটা দিন কেটে গেছে। দেখতে দেখতে বনে বর্ষা এসে গেল। গারো পাহাড়ের মাথা ডিঙ্গিয়ে পাগলা হাতীর মত দলে দলে এল কালো মেঘ, শালের দলের হাত ছানিতে বাঁশঝাড়ের ইসারায়। সেই সঙ্গে এল টিয়া পাখীর দল আর বন কবুতর। তারপরে কোথা থেকে কোন বনান্তর থেকে, কত পাহাড় পার হয়ে এল নালুখ।

ভাল্লুকদের যখন বাচ্চা হয় তখন ভাল্লুক আর ভাল্লুক গিন্নীর একবছরের ছাড়াছাড়ি। সেই একটা বছর ভাল্লুক গিন্নী তার ছানাদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ছানাদের চোখ ফোটান, মানুষ করা তার তখন কত কাজ। ভাল্লুক মশাই তখন বিস্তৃত পৃথিবীটা একটু দেখবার জন্যে, বনান্তরের স্বাদ পেতে দূরে সরে যান। আবার একবছর পরে পুরোণ বাসায় ফেরা। তখন থেকে বাচ্ছাদের ভার বাপের উপর। তখন থেকে কর্ত্তা ভাল্লুকের হাতে ছানারা বনের পথ একা একা চিনতে শেখে, বড় জানোয়ার শিকার করতে শেখে, বনের নিয়ম কানুন মুখস্থ করে। পৃথিবীকে একা মুখোমুখী চেনবার একটা শিক্ষা দরকার। মায়ের কাছে সেটা হয় না—মায়েদের মন বড় নরম, বড় স্নেহশীল, কঠোরতা শেখাবার শক্তি তাদের নেই। তখন দরকার হয় বিজয়ী বীর পুরুষের।

গুহার সামনে এসে তাই নালুখ বর্ষার বিদ্যুৎভরা মেঘের মত একটা গম্ভীর গর্জ্জন ছাড়ল প্রথমে তারপরে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে হাঁক দিল—কই গো গিন্নী বাচ্ছারা কতবড় হোল ? আলাপ টালাপ করিয়ে দাও।

ভাল্লুকমা গুহার মুখ থেকে মুখ বার করে বলল—অর্‌র্ ভাল্লুক জবাব দিল—হ্‌র্‌র্।

ভাল্লুক গিন্নী বেরিয়ে এল। তার পরে কর্ত্তাগিন্নী কাছাকাছি এসে নাক শুঁকে পরস্পরের পুরোণ আলাপ ঝালিয়ে নিল। তখন ভাল্লুকমা ডাকল—কইরে বাছারা বেরিয়ে আয়! গুহার মুখ থেকে প্রথমে বেরোল কালা তার পেছনে দুই ভাই।

এই দেখ তোদের বাপ।

নালুখ আপাদমস্তক তার ছানাদের একবার দেখে নিল তারপরে এগিয়ে গিয়ে কালাকে তার প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে মারল এক ঠেলা। কালা গড়িয়ে গিয়ে একপাশে পড়ল, মুখ দিয়ে একটা শব্দ ও করল না। নালুখ বলল—সাবাস বেটা জোয়ান হবে।

ভাল্লুক মায়ের বুক গর্ব্বে ভরে উঠল।

ঠিক সেই সময় গুহার মুখে হামা দিতে দিতে বেরিয়ে এল মংলু। গুহার মুখে মুখ বার করে ভাল্লুক মায়ের দিকে চেয়ে সে বলল—তা-তা-তা।

নালুখ তার দুই থাবা দিয়ে কালাকে কুস্তির আর একটা প্যাঁচ মারতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল।—ও কে ?

ভাল্লুকগিন্নী জবাব দিল—ও মংলু টিকটিকি, আমার ছেলে।

—সে কি ? আমার বাচ্ছা ?

নালুখ অবাক হয়ে ভালুক গিন্নীর মুখের দিকে তাকাল।—না গো-না ও মানুষের ছানা। ওর মা মরে গেছে, মানুষের গ্রাম থেকে ওকে কুড়িয়ে এনেছি। আমার বুকের দুধ খেয়ে ও বড় হচ্ছে। ওকে কিছু বোল না।

নালুখ বলল—তাই ত!

—জান ? শেয়াল ওকে খেয়ে ফেলতে যাচ্ছিল, তার মুখ থেকে ওকে আমি কেড়ে এনেছি তাই শেয়াল শাসিয়ে গেছে।

—বটে ?

নালুখ ঘাড় ফুলিয়ে দাঁড়াল।

—পাজী বদজাত শেয়াল! দেখিরে টিকটিকি তোর সাহস!

নালুখ মংলুর কাছে এগিয়ে গেল। মংলু ভালুকমা ছাড়া এত বড় জানোয়ার আর দেখেনি। নালুখ এগিয়ে আসতে সে অবাক হয়ে তার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

শিকার কোথায়? ১১৮ পৃষ্ঠা

মানুষের সেই অগাধ রহস্যময় চোখের দৃষ্টি নালুখ সইতে পারল না, চোখ সরিয়ে নিল। মংলু মুখে অস্ফুট একটা শব্দ করতে করতে নালুখের বুকের কাছে হামা দিয়ে এগিয়ে এল। নালুখ তার থাবা দিয়ে মংলুর পিঠে এক চাপ দিল। মংলু সেই চাপে মাটিতে চেপ্টে গিয়ে খল খল করে হেসে উঠল। তারপরে তার কচি হাত দিয়ে নালুখের গোঁফ ধরে মারল এক টান। নালুখ একলাফে পেছিয়ে এল।—ওরে বাপ্ টিকটিকির সাহস আছে।

নালুখ থাবা দিয়ে মংলুকে এক ঠেলা মারল। মংলু গড়িয়ে গেল একপাশে।

ভাল্লুকমা হাঁ হাঁ করে উঠল।

নালুখ বলল—শক্ত হবে, বাচ্চা শক্ত হবে। ভাল্লুকের দুধ যখন খেয়েছে, ভাল্লুকের সঙ্গে যখন ছুটতে হবে তখন শক্ত হওয়া দরকার। চিরকাল ত টিকটিকি থাকলে চলবে না। আয়রে বাচ্ছা আয়।

মংলু আবার হামায় ভর দিয়ে উঠে জুল জুল করে তাকাতে লাগল।

ভাল্লুকমা বলল—চিনে রাখ মংলু টিকটিকিকে চিনে রাখ কক্ষণ যেন ভুল কোর না—। আমাদের ঘরে যখন ও এসেছে—

নালুখ বলল—তখন আজ থেকে ও ভাল্লুকদের মংলু।

—আজ থেকে ওর যে শত্রু...

—সে আমাদেরও শত্রু!

নালুখ বন কাঁপিয়ে একটা হুঙ্কার দিল—শুনে রাখ, বনের সব জানোয়ার। আমি নালুখ ভাল্লুকদের কর্ত্তা বলছি। আমার তিন বাচ্ছা ভাল্লুক আজ থেকে বনে চরবে আর মংলু টিকটিকি আজ থেকে ভাল্লুকদের মংলু হোল। এই বনে ভাল্লুকদের সমান অধিকার ওর।

ভাল্লুকের সেই ডাক আকাশের চীল শুনে তারস্বরে চেঁচিয়ে আকাশে আকাশে ঘোষণা করে দিল। বনের ওপারে লঙ্গুর বাঁদররা হুপ হুপ করে লাফাতে লাফাতে সে ডাক শুনে চমকে উঠল। গাছের আড়ালে শেয়াল সে ডাক শুনে অস্থির হয়ে উঠল কারণ পাজী শেয়াল তখনও মংলুর আশা ছাড়েনি। অনেকবার নিঃশব্দে ফাঁকে ফাঁকে এসে সে গুহার মুখে ঘুরে গেছে। একবার মংলুকে একা পেলে হয়। কিন্তু প্রতিবারই সে দেখে গেছে ভাল্লুকমা বুক দিয়ে মংলুকে আগলে আছে। তখন একা ছিল ভাল্লুকমা এখন আবার নালুখ ফিরে এসেছে। তার একার দ্বারা আর মংলুকে পাওয়া সম্ভব নয়। শেয়াল মন ঠিক করে ফেলল। দেখা যাক ভাল্লুকদের কতদূর আস্পর্দ্ধা। মানুষের ওই ছানার কচি হাড় সে চিবুবে তবে তার নাম শেয়াল। শেয়াল লম্বা লম্বা পা ফেলতে ফেলতে দূর বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উচ্চ আসামের কালো বাঘ বড় ভয়ঙ্কর জানোয়ার। যেমন ক্রূর তেমনি ক্ষিপ্র আর তেমনি বলবান। বিশেষতঃ কালকেতু যেন সাক্ষাৎ যম। সে যখন চলে তার পায়ের শব্দ হয় না, তার নমণীয় ইস্পাতের মত পেশীগুলোতে ঢেউ খেলতে থাকে। তার এক থাবার ঘায়ে প্রকাণ্ড বুনো সম্বরও লুটিয়ে পড়ে। এই কালো বাঘগুলো গাছে চড়তেও ওস্তাদ।

হিজল গাছের শাখায় শাখায় বন যেখানে দুর্ভেদ্য সেইখানে একটা ডালে বসে কালকেতু তার থাবা চাটছিল। বর্ষার সময় হরিণগুলো আর বিশেষ দল ছিটকে পড়ে না তাই শিকার একটু দুষ্প্রাপ্য। এমন সময় গাছের তলায় শেয়াল এসে বলল—কালো বাঘদের ভালো হোক শিকার টিকার বেশী করে জুটুক!

কালকেতু রাজার মত ঘাড়টা ঈষৎ হেলিয়ে শেয়ালকে দেখে নিয়ে বলল—শিকার কোথায়?

কালকেতু রাজার মত মড়াটা ঈষৎ হেলিয়ে শেয়ালকে চামে নিয়ে হল—শিকার কোথার? সম্বরটম্বর একটা দেখেছ?

শেয়াল বলল—কাল জলার পাড়ে একদল নেমেছিল কিন্তু তারা ওপরে উঠে গেছে।

—তবে শিকার?

শেয়াল বলল—আছে

—কি রকম?

—আছে একটা মানুষের ছানা—

—মানুষের ছানা? তবে তুমি শিকার করনি কেন?

—ভাল্লুকদের কাছে আছে তাই ভয় পাই—

কালকেতু ঘাড় বেঁকিয়ে বল—কালো বাঘ ভাল্লুকদের ভয় পায় না। কোথায় আছে?

নালুখের গুহায়? তাহলে একটু ভয়ের কথা বটে নালুখের আবার অসীম ক্ষমতা কিন্তু তবু কালকেতু ভয় করে না।

শেয়াল বলল—তাইত এসেছি তোমার কাছে। হাজার হোক জ্ঞাতি ত?

কালকেতু বল—হুঁ, চল দেখি, একটু সাবধানে যেতে হবে।

একলাফে গাছের ডাল থেকে নেমে এল কালকেতু।

শেয়াল বলল—আমার পেছনে এ-সো।

ক্রমশঃ

সারথিস্থর বন্দর

শ্রীনিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য

পাহাড়ের কোলে ছোট সুন্দর সারথিস্থুর দেশ। সোণার মত দেশ—সারথিস্থুর।

কিন্তু পাথরের ফাটলে শস্য হয় না। গরীব দেশ সারথিস্থুর।

সারথিস্থুরের পশ্চিমে সমুদ্র। পুরো একদিনের পথ। এত কাছে সমুদ্র—তবু সে দেশের লোক কখনও সমুদ্রের পথ মাড়ায় নি। এ পথে গেলে নাকি আর ফিরে আসা যায় না। তাই পশ্চিমে, যেখানে পাহাড়ের হু'টো চুড়ো উঁচু হ'য়ে উঠেছে, তারই মধ্য দিয়ে যে সঙ্কীর্ণ পথ---সে পথে কখনও মানুষের পায়ের চিহ্ণ পড়েনি।

আর উত্তর দিকে যে পথ নেমেছে, সেই হ'ল নীচে নামবার আর একটা পথ। সেই পথ ঘুরে ঘুরে গিয়ে মিশেছে পাহাড়ের শেষে, বহুদূরে সমতল ভূমির আর একটি দেশে—সে দেশের নাম ছিল অনিন্দস্থুর।

পাশাপাশি হুটি দেশ—যাওয়া আসা নেই। পাহাড়চুড়োয় সারথিস্থুর আর পাহাড়ের নীচেয় অনিন্দস্থুর। পাহাড়ের ব্যবধানে হুটি দেশে ছাড়াছাড়ি। ওপর থেকে নীচে নামা সহজ, কিন্তু নীচের থেকে ওপরে ওঠা সহজ নয়। সারথিস্থুরের লোকেদের পক্ষে যেটুকু সহজ ছিল অনিন্দস্থুরে যাওয়া, অনিন্দস্থুরের লোকেদের পক্ষে সারথিস্থুরে আসা ঠিক ততটা সহজ ছিল না। সহজও ছিল না, দরকারও ছিল না। কেন না অনিন্দস্থুরের টাকা ছিল, কাজ ছিল। কাজ করে সেখানে টাকা পাওয়া যেত। কাজ আর টাকা—এ হুটি জিনিষের যে দেশে অভাব নেই, তার আবার হুঃখ কী! খাওয়াপরার সুখ অনিন্দস্থুরের বাসিন্দাদের ছিল– দেশান্তরে যাওয়ার প্রয়োজন কখনো তাদের হয়নি।

কিন্তু ধনীর দেশে গরীবদেশের লোক দেখতে পাওয়া আশ্চর্য্য নয়। অনিন্দস্থুরে আসত সারথিস্থুর থেকে লোক, কাজ করে হু'পয়সা রোজগার করতে। এই দলে ছিল উপল, সে সারথিস্থুরের ছেলে। কাজ করত অনিন্দস্থুর দেশে। বিদ্যুৎপর্ণা নদীর স্রোত বেঁধে বিরাট কল চালানো হয়। সেখানে জলচক্র কলে মজুর খাটে সে।

কিন্তু সমস্ত মন তার সারথিস্থুরে পড়ে থাকত। সারথিস্থুর—সারথিস্থুর দেশের জন্য কি সুরই না তার হৃদয়কে কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভরিয়ে তুলত। সারথিস্থুরের প্রত্যেক লোকের সরল মুখ, সে দেশের প্রত্যেকটি গেঁয়ো পথ, সে দেশের প্রত্যেক পাখীটিও যেন তার পরিচিত। সকল কল্পনা তার পাখীর মত সারা গ্রামের পথ আর বনের উপরের আকাশে

উড়ে বেড়াত। সব চেয়ে সে কাতর হ'ত দেশের দুর্দশার কথা ভেবে। অবসর সময়ে সে এ বই সে বই নিয়ে ঘাঁটত—দেখত কি ক'রে এক একটা দেশ বড় হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে সে ছুটি নিয়ে সারথিস্থুরে যেত বটে। কিন্তু তবু, তার যেন আর ভালো লাগে না। একদিন সন্ধ্যায় কারখানার মালিককে সে জানালে যে আর সে কাজ করবে না।

মালিক গম্ভীর হয়ে বললেন,—"বলো কি! হঠাৎ কাজটা ছেড়ে দেবে?"

"ভাল লাগে না"—উপল বললে—"অনেকদিন দেশে যাইনি"।

"ওঃ—এই"—সস্নেহে মনিব হেসে বললেন,—"বেশ ত,' তুমি এক মাসের ছুটি নাও। এক মাস পরে আবার ফিরে এসো।"

চঞ্চল ঝরণার মত হাল্কা পায়ে পাহাড় ভেঙে ভেঙে পথ চলেছে উপল। মনে তার কি স্ফূর্তি—কি আনন্দ। গান সে গাইচে কি না—কি গান—তা সে বলতে পারে না। সে যে কঠিন বন্ধুর পথ পেরিয়ে, পাথরের অগণ্য সিঁড়ি ডিঙিয়ে চলছিল তা তার খেয়াল ছিল না। তিনদিন পথ হাঁটার পর, সে সারথিস্থুরে পৌঁছল।

ওগো সারথিস্থুর! বনে তোমার কি ফুল ফোটে, ঝরণায় তোমার কোন্ জলের ধারা—যাঁকে ভুলতে পারলে না ছোট একটি কিশোর প্রাণ! সে এল—এই ঝরণা জল ধারার সঙ্গে সমস্ত দিন তার কত হল কথা! ফুলের বনে তার হ'ল গান! কিন্তু সব আনন্দের মাঝে একটা কথা কাঁটার মত তার মনে বারবার বিঁধলো। তার মনে হল, হায়! তার দেশ গরীব! তার দেশের মানুষদের কত দুঃখ!

পশ্চিম দিকটা তার প্রায়ই মনে পড়ত। উঁচু পাহাড়ের দু'টো চুড়োর মধ্য দিয়ে সরু একটা রাস্তা। কত নীচে নেমে গিয়েছে—কত নীচে। তারপর আর দেখা যায় না, উপল পড়েছিল কত দেশের কাহিনী, সমুদ্রের বুকে বাণিজ্যের বহর ভাসিয়ে যারা উধাও হয়। তারপর একদিন ফিরে আসে বহর, অর্থ আর শস্যে বোঝাই হয়ে। অর্থ আর শস্য মানুষকে দেয় সাহস, সুখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা। সেই সঙ্গে দেশে আসে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য। উপল স্বপ্ন দেখে, নীল জল—অথৈ নাচে কূলে কূলে—হেসে ওঠে পাহাড়ের ধারে ধারে আঘাত খেয়ে খেয়ে—সাদা সাদা ফেণা তার গলায় সাদা ফুলের মালার মত দোলে বুঝি।

সকলে বলে: "বলো কি উপল? পশ্চিম পথে সেই যে আদিত্যদেব গিয়েছিলেন তিনি তো আর ফিরে আসেন নি'। ওপথ বড় ভয়ঙ্কর—তুমি যেও না।"

অনেকে মাথা নেড়ে বললেন, "সুড়ঙ্গের পথ ধরে চার ক্রোশ হেঁটে পাথরের বড় বাঁধে পৌঁছবে। কিন্তু তারপর ?"

বুড়োরা আতঙ্কে উঠে বললেন, "কী সর্ব্বনাশ। ওই পাথুরে বাঁধের পথে তুমি যেওনা বাপু।"

সকলেই উপলকে ভালবাসতো।

কিন্তু উপল মনে মনে বললে—"না, আমি যাব। ঐ পথে আনব লক্ষ্মীকে।

দুই

পরদিন ভোরবেলা

সারথিসুর উপত্যকার পশ্চিমদিকের পথটা এসে উতরাইয়ে নেমেছে। পথ হয়েছে সঙ্কীর্ণতর। পথের দু'পাশে পাহাড়ের মাথাগুলো আদিযুগ থেকে জটলা করেছে। অত্যন্ত ঢালু পথ—এত ঢালু যে পা ফস্কালে গড়াতে গড়াতে সামনে পাহাড়ের মাথায় এসে ধাক্কা খেতে হবে। ঠিক দুপুরে সেখানে বুঝি সূর্য্যের আলো এসে পড়ে।

অন্ধকার সেই সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে, কোমরে দু'টো বোতল আর পিঠে পোটলা ঝুলিয়ে, একটি লোক সন্তর্পণে পথ চলছিল। সামনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে সে চলছিল। পেছন থেকে মনে হয় আদ্যিকালের বুড়ো। কার সাধ্য চিনবে সে বালক উপল।

উপল চলছিল। চোখে মুখে তার উৎসাহ। উপল পথ চলছিল—ঢালু পথ।

রূপকথার রাজপুত্রের মত উপল আজ সোণার কাঠি নিয়ে চলে বুঝি পাতাল পুরীতে। নিস্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম পথে চলতে চলতে সে হঠাৎ থেমে যায়—আর কত দূর সে ঘুমন্ত পুরী যেখানে সোনার পিদিম জ্বলে, মনিমাণিক্য দেওয়ালের গায়ে ঝিক্‌মিক্ করে, সোণার পালঙ্কে কুচবরণ রাজকন্যা ঘুম যায়।

প্রথম মোড় ঘুরতেই, অনেকদূরে দেখা গেল পাহাড়ের মাথায় রোদ্দুর ঝলমল করছে। ঐ বুঝি সেই পাথরের বাঁধ !

কাঁধটা তার ব্যথা হয়ে গেছে। কাঁধ বদলিয়ে একটা যেন মুক্তির হাওয়া লাগল তার মনে। একটু দ্রুত সে নামতে লাগল। ঐখানে পৌঁছাতে পারলে সে হয়ত একটা নতুন পথের সন্ধান পাবে।

কিন্তু হঠাৎ পথ যে আরও ঢালু হয়ে চললো! মানুষের পক্ষে এই পথে হাঁটা

পাড়া ঘুরবেন না।

একবার নিচের দিকে চাইল ১২২ পৃষ্ঠা

দুঃসাধ্য। উপল সেখানে একটা পাথরের গা ধরে অতি কষ্টে দাড়িয়ে পুঁটলিটি মাথা গলিয়ে সামনের দিকে ছুঁড়ে ফেললে। গড়াতে গড়াতে পুঁটলিটি কোথায় চলে গেল।

অনেকক্ষণ—প্রায় এক প্রহর সেই পথ চ'লে পিছন ফিরে সে দেখলে আর্দ্ধেক এগিয়ে এসেছে সে, তখন আর একবার মরিয়া হয়ে নামতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ—এবার সে পাহাড়ের সেই উন্মুক্ত চুড়োটায় নেমে এসেছে। উঃ—দর দর ঘাম ঝরছে। উপল কপালটা মুছে নিলে। সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে দেখলে বেলা একপ্রহর কেটেছে।

অসম্ভব ক্ষিধে পেয়েছে। ঢালুপথে নামবার জন্য পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পুঁটলিটা এখন থাকলে ভালো হত। কিন্তু. হাঁা তাইতো, ঐ না পুঁটলি। উপল সামনে ছুটে এলো।

একটু বিশ্রামের পর উপল আবার নামবার জন্যে তৈরী হল।

জায়গাটা সেখানে বেশ সমতল। কিন্তু এই সমতল জমি ঘিরে তিনধারে বাঁধের মত ছোট পাহাড়। পুঁটলীটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে একটা পাথরের কয়েকটা ধাপ বেয়ে সে বাঁধটার ওপর উঠল।

ওপরে উঠে সামনে সে দেখতে পেলে খানিকদূরে ক্রোশ পাঁচেক তফাতে ধূধূ সমুদ্র দিগন্তে মিশে গেছে। মনে হচ্ছে পাহাড়ের ঠিক নীচেই আছড়ে পড়ছে। কিন্তু বাঁধটা একটা দেয়ালের মত খাড়া দাড়িয়ে রয়েছে—কোথাও এতটুকু বাঁক খায় নি, ঢালু হয় নি।

এখান থেকে নামতে পারলেই সমুদ্র—যে সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে দেশান্তরে যায় জাহাজ, দেশে আসেন লক্ষ্মী। কিন্তু সে নামবে কি ক'রে? জায়গাটি বিশ হাত উঁচু তো হবেই।

সে তার পুঁটলীর ছোট কাপড়টা খুলে নিজে পরল; পরণের কাপড়টা খুলে নিয়ে এক প্রান্ত একটা ছোট পাথরের সঙ্গে বেঁধে বাঁধের গায়ে একটা পাথরের ফাটলে আটকে রাখলে। খাবারগুলো পাগড়ীতে জড়িয়ে সে সেই কাপড় ধরে তার শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত নেমে এসে একবার নীচের দিকে চাইল। বেশ দূর—এখনও নীচের জমি দশ হাত তফাৎ। ঠিক মত লাফ দিতে না পারলে পাথরে গুড়ো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। উপল আদিত্যদেবের নাম স্মরণ করে হাত ছেড়ে দিলে! এক মুহূর্ত্ত। তারপর শরীরে একটা ভয়ানক ঝাঁকুনি। শরীরে ব্যথা, পা শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ছে। তবু উপল এগিয়ে চললো। ধীর গতি। ছোট ছোট পাথরের উচুঁ নীচু পথ—কাঁকর আর নুড়ি ছড়ানো জমি। তারপর—সন্ধ্যায় সূর্য্য যখন আকাশ রাঙিয়ে অস্ত গেলেন উপল তখন সমুদ্রের বিস্তীর্ণ কিনারায়।

কিনারাটি আঁটা মাটির—ভিজে। জলের কাছে লম্বা লম্বা ঘাস—মধ্যে তার নীল নীল ফুল ফুটে। শুক্তিতে এই বুঝি মুক্তো—মুঠো ভরে সে ঝিনুক কুড়োল।

কিন্তু উপল আর ফেরে নি'।

সেই দিনই রাত্রের ঘন অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে সে যখন তার ব্যথাবিবর্ণ শরীর নিয়ে সেই খাড়াইয়ের কাছে এলো, ভয়ে সে করুণ হ'য়ে উঠল। তাই ত, ওখানে উঠবার পথ কৈ, শক্তি কৈ—আলো কৈ? একটা পাথর নিয়ে একটা পাথর ঘ'ষে, সে তা'তে লিখলে—নামবার আগে উঠবার ব্যবস্থা কোরো।

তারপর পাথরটা সে ওপরের চূড়োর দিকে ছুড়ে দিলে।

তিন

জলচক্রের মালিক বাস্তবিকই উপলকে ভালবাসতেন।

এক মাস হ'য়ে গেল, অথচ উপল এলো না। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মনিব বিচিত্র-বান্ সারথিস্থুর রওনা হলেন।

দিন যায় রাত আসে। রাত যায় আবার আসে দিন। এমনি, তিন রাত পোহালো। তারপর একদিন দলবল নিয়ে বিচিত্রবান্ সারথিস্থুরে পৌঁছলেন। এসেই জিজ্ঞাসা করলেন উপলের কথা। কোথায় থাকে, তার খবর কি?

বাড়ীর নিশানা দিয়ে সারথিস্থুরের একটি লোক বললে, "কিন্তু সে ত' পশ্চিমদিকের পথে রওনা হয়ে গেছে। আদিত্যদেব যে পথে গিয়েছিলেন সেই পথে—আদিত্যদেব ফেরেন নি, সে কি আর ফিরে আসবে?"

"বটে"—চিন্তিতভাবে বিচিত্রবান্ বললেন, "আচ্ছা তার বাড়ীতে গিয়ে পরামর্শ করে' দেখি।"

উপলের বুড়ো বাপ আগাগোড়া ব্যাপারটা খুলে বললেন। আদিত্যদেবের পথে গেছে সে, আদিত্যদেব তাকে আর ছেড়ে দেবেন না।

বিচিত্রবান্ বললেন "আমরাও কাল ঐ পথে যাত্রা করব। উপলের মুখে শুনেছিলাম ওখানে না কি বেশ ভাল বন্দর হতে পারে। আমরা যাব। উপল বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে দেখা হবে।"

"আপনারাও যাবেন"—উপলের বুড়ো বাপ গম্ভীর হয়ে গেলেন। "আদিত্যদেব ঐ পথ ধরে একদিন গিয়েছিলেন। ওপথে গেলে মানুষ আর ফেরে না।"

"ঐ পথেই দেশের লক্ষ্মী আসবেন" বিচিত্রবান্ বললেন। "আপনার ছেলে পথ দেখিয়েছে। ঐ পথে আমরা সমুদ্রে পৌছে যাবো।"

লোকলস্কর, যন্ত্রপাতি, দড়ি মই নিয়ে পরদিন ভোরে আর একদল যাত্রীকে সেই পশ্চিমদিকের পথে যেতে দেখা গেল। দড়ির মই ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে, পাথরের ধাপ বানিয়ে বানিয়ে—তাঁরা প্রথমে সেই বাঁধের ধারে নামলেন। বাঁধের ওপর উঠে হঠাৎ একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে পেয়ে বিচিত্রবান্ চেঁচিয়ে উঠলেন—"শিগ্‌গির এই পথে দড়ির মই ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে পড়।" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মইটা হাতে ক'রে কিনারার কাছে এসে অবাক হয়ে গেলেন। একখণ্ড কাপড় ঝুলছে—তাহ'লে এই পথে সে নেমেছে। কিন্তু উঠতে পারে নি। অবোধ কিশোর!

তিনি নীচে নামলেন! "উপল—উপল"—কোথাও যদি মুমূর্ষু উপলের সাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় উপল! তার কঙ্কাল শুধু পড়ে আছে। শুধু এক জায়গায় কতকগুলি ঝিনুক আর মুক্তো সূর্য্যের আলোয় ঝিকমিক্ করছে।

বিচিত্রবানের চোখ জলে ভরে এলো। "মুক্তো হারিয়ে গেছে"—বলে মাথার পাকাচুল মুঠো করে ধ'রে তিনি বসে পড়লেন। আরও তিনটে মই ঝুলিয়ে দলের লোকেরা নামছিল, কাছে এসে তারা বললে,—"কি বললেন?"

"কৈ, কিছু না—কিন্তু দেখ সমুদ্রের কিনারাটি বড় সুন্দর। উপল আমাদের এই জায়গাটি দান ক'রে গেছে।" একটু নিঃশব্দ থেকে তিনি বললেন,—"কিন্তু উপল আর নেই।"

দলের লোকেরা মাথা হেঁট করে রইল। বিচিত্রবানকে কী তারা বলবে? কী কথা ভেবে তারা সান্ত্বনা পাবে?

বিচিত্রবান্ বললেন,—"ওখানে ওই সমুদ্রের কিনারায় একটা বন্দর তৈরী করার বড় ইচ্ছা ছিল উপলের। তার বিশ্বাস ছিল এতে করে তার দেশের উপকার হবে। আমি তার ইচ্ছা পুরণ করতে চেষ্টা করব। চল—আজ আমরা ফিরে যাই।"

তারপর পশ্চিমের সঙ্কীর্ণপথ বেয়ে একদিন একদল লোক সারথিস্থুর গ্রামে ফিরে এলো।

তারপর—সারথিস্থুর দেশে লক্ষ্মী এসে বাসা বেঁধেছেন। দেশদেশান্তর হতে জাহাজ আসে সারথিস্থুরের বন্দরে, দেশদেশান্তরে জাহাজ যায় বন্দর হতে।

লক্ষীর পুজা ঘরে ঘরে। সমুদ্রের পথে প্রথম গিয়েছিলেন আদিত্যদেব, তাঁর পরেই উপল। আদিত্যদেবের সঙ্গে উপলের পুজো হয়।

চাঁদের দেশে যায়রে ভেসে

'স'

যায়রে যায় যায়
চাঁদের দেশে যায়রে ভেসে জাহাজ ভেসে যায়
রাজপুত্তুর সাতপুত্তুর চাঁদের দেশে যায়।
সাতপুত্তুর রাজপুত্তুর—
কার পুত্তুর সাতপুত্তুর?
চম্পাদেশের পারুলদিদির সাতটি কি ভাইরে?
চাঁদের দেশে খুঁজতে এলো পারুল কি তাইরে?

নাইরে নাই নাই
চাঁদের বুড়ি হেসেই বলে পারুল কোথায় পাই?
সাতপুত্তুর হঠাৎ হাসে, কে বলে যাই যাই।
তারার দেশে টিপ পরিতে
এলেম হাওয়ার পাল্‌কিটিতে—
বলেই আসেন পারুলদিদি ফুরফুরে হাওয়ায়,
পারুল দিদি সাতটি চাঁপা জাহাজ চেপে যায়।

জাহাজ কোথায় যায়?
জাহাজ ফিরে যায়।
ঘুম্ ঘুমাঘুম্ সাতটি চাঁপা
পারুলদি গান গায়।

মানুষেই যোগ বিয়োগ করতে ভুল করে। কিন্তু কখনও শুনেছ যে কুকুর যোগ বিয়োগ করতে পারে আর কখনও ভুল করে না। অন্ততঃ একটি কুকুর পণ্ডিতের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এই কুকুরটার নাম ভাইকাউণ্ট এবং তার মনিবের নাম মারকাস। যখন হয়ত তাকে জিগেস করা হয় ৪ আর ৩ যোগ করত—তখন সে ৭ বার চেঁচিয়ে তার জবাব দেয়। যখন আবার তাকে হয়ত প্রশ্ন করা হল ১০ থেকে ৭ বিয়োগ করলে কত থাকে—সে তিনবার ডাক দিয়ে তার নির্ভুল উত্তর দিয়ে সবাইকে অবাক করে। বাড়ীতে এই রকম একটা কুকুর পণ্ডিত থাকলে মন্দ হয় না।

ঘটোৎকচ গুহার নাম শুনেছ কখনও ? অজন্তা গুহার নাম শুনেছ ত—ঘটোৎকচ গুহা তার থেকে বেশী দূর নয়। কিন্তু ঘটোৎকচ গুহা কেন এর নাম হল সেটাই আশ্চর্য্য—কারণ অজন্তায় তো বুদ্ধ মূর্ত্তিই পূজার দেশ। শোনা যায় বৎসরে একবার যখন সেখানে মেলা হয় তখন লোকেরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ঘটোৎকচ বলে পূজা করে। বুদ্ধদেব ও ঘটোৎকচ—একজন দেবতাতুল্য আর একজন রাক্ষস—সেখানকার লোকের চোখে কেমন করে এক হল ! কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম !

ছোট্ট মানুষ বামন টম্ থাম্ব এর গল্প তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। কিন্তু ইতিহাসে সত্যিকারের এক টম থাম্ব ছিল সেই টম ছিল এমেরিকান তার নাম ছিল জেনারেল টম্ থাম্ব। অবশ্য এই টম থাম্ব এর আসল নাম ছিল চার্লস ষ্ট্রাটন। ষ্ট্রাটনেরা চার ভাই ছিল কিন্তু একমাত্র চার্লসই হয়ে রইল ছোট এতটকু ২৫ ইঞ্চি। ৬ মাসের পর আর সে বাড়ল না। যাই হোক এই ২৫ ইঞ্চি চার্লস সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছিল ও রানী ভিক্টোরিয়ার খুব প্রিয় ছিল। এই বামনটি বিয়ে করেছিল তার তিনগুণ লম্বা একটি মেয়েকে। ১৮৮৩ সালে চার্লস এর মৃত্যু হলে তার স্ত্রী আর একটি বামনকে বিয়ে করে।

সিসিলী ও দক্ষিণ ইটালীর মধ্যে মেসিনা জলপ্রণালীতে একরকম অদ্ভুত মরীচিকা দেখতেও পাওয়া যায়। জলের মধ্যে নানা প্রাসাদতুল্য বড় বড় ঘরবাড়ি দুর্গ এসব দেখা যায়। এই মরীচিকার নাম ফাতা মর্গানা। সেখানকার লোকেদের বিশ্বাস মর্গান লি যে বলে এক পরী ছিল—রাজা আর্থারের এক বোন সেই নাকি জলের মধ্যে যাদুবলে এক ঐন্দ্রজালিক দুর্গ সৃষ্টি করে। কেউ কেউ বলে লি কে যে দুর্গে বাস করত তারই প্রতিচ্ছায়া এগুলো। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই মরীচিকা দেখে বলেছেন যে আলোক তরঙ্গ বাতাসের নানা স্তরের মধ্যে দিয়ে এই জলে গিয়ে পড়ে ঐ মরীচিকার সৃষ্টি করে। সিসিলীর লোকেরা কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের এ ধারণা মোটেই বিশ্বাস করে না।

এ্যাসিরিয়ার রাজা ইসারহাডন

এ্যাসিরিয়ার রাজা ইসারহাডন লয়লী রাজাকে লড়াইয়ে হটিয়ে দিলেন। ইসারহাডনের হুকুমে এ্যাসিরিয়ার সৈন্যরা লয়লীর রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিলে, রাজধানীর বাসিন্দাদের পায়ে বেড়ী দিয়ে দলে দলে গাড়ী বোঝাই করে এ্যাসিরিয়ায় চালান দিলে। পাত্রমিত্র মন্ত্রী সেনাপতিরা কেউ শূলে চড়লেন, কেউ জীবন্ত পুড়ে মরলেন। লয়লীর রাজ্য ছারখার হয়ে গেল। স্বয়ং লয়লী খাঁচায় বন্দী হলেন।

একদিন দুপুর রাত। ইসারহাডন একা শুয়ে ভাবছেন. লয়লীকে কোন্ নিষ্ঠুর উপায়ে হত্যা করেন। হঠাৎ বিছানার পাশে খস্‌খস্ একটা আওয়াজে চোখ মেলে ইসারহাডন দেখেন এক বুড়ো সেখানে দাঁড়িয়ে; লম্বা শাদা দাড়ী তার, চোখ দুটির ভাব বড়ই কোমল।

বুড়ো জিগেস করলে, 'তুমি লয়লীকে মেরেফেলতে চাও, না?'

রাজা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ. কী ভাবে যে লয়লীকে মারি কিছুই স্থির করতে পারছিনা।'

বুড়ো বললে, 'কিন্তু তুমিই তো লয়লী।'

রাজা বললেন, 'সে কী কথা! লয়লীই হচ্ছে লয়লী, আর আমি তো আমিই।'

বুড়ো মুচকি হেসে বললে, 'তুমি আর লয়লী একই মানুষ। তুমি লয়লী নও, সে-ও তুমি নয়, এ তোমার মিছে কথা।'

রাজা হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, 'তোমার কথার কী অর্থ? এই তো, আমি শুয়ে আছি নরম বিছানায়: আমার চারপাশে দাসী বান্দারা ভিড় করে আছে; আজ ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে যেমনটি ধুমে ধামে ভোজে বসেছিলাম, আগামী কালও তার কোনই ব্যতিক্রম হবেনা। আর লয়লী—লয়লী যে এখন পাখীর মত খাঁচাবন্দী হয়ে ঝটপট করছে। আসচে কাল তাকে শূলে চড়ানো হবে, তার জিভ বেরিয়ে আসবে, যতক্ষণ প্রাণ না বেরুবে সে নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করবে: তারপর—তারপর তার শবটা ডালকুত্তোর দল খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে।'

বুড়ো দাড়ীতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'কিন্তু তুমি তো জীবন লোপ করতে পারো না।'

ইসারহাডন চটে মটে বললেন, 'বটে! গণে গেঁথে লয়লীর চোদ্দ হাজার সৈন্য আমি হত্যা করিনি! বলতে চাও, তারা এখনো বেঁচে আছে? আমি বেঁচে আছি, তারা কেউ বেঁচে নেই—এতেই কি প্রমাণ হয় না আমি জীবন লোপ করতে পারি?'

'কী করে জানলে তুমি তারা বেঁচে নেই ?'

'কী করে—কেন, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছিনা, এতেই তো বোঝা যাচ্ছে তারা আজ বেঁচে নেই। তারা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে কষ্ট পেয়ে মরেছে, আর আমি —আমি তো মোটেই কষ্ট পাইনি।'

'কষ্ট পাওনি —মিছে কথা। আসল কথা, তাদের কষ্ট দিতে গিয়ে তুমি নিজেকেই কষ্ট দিয়েছ।'

রাজা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'তোমার কথা আমি ঠিক বুঝছিনা।'

বুড়ো হেসে বললে, 'বুঝতে চাও তুমি ?'

'না বুঝে লাভ কী !'

একট বিরাট চৌবাচ্ছা দেখিয়ে বুড়ো রাজাকে বললে, 'এসো।' রাজা বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন।

বুড়ো বললে, 'এখন পোষাক ছেড়ে চৌবাচ্চায় নেমে পড়ো।'

রাজা কথামত চৌবাচ্চায় নেমে গেলেন।

'আমি তোমার মাথায় জল ঢালবো, সঙ্গে সঙ্গে তুমি চৌবাচ্চার জলে ডুব দেবে।'

রাজার মাথার উপর ঝাঁকুনি দিয়ে বুড়ো এক কলস জল ঢেলে দিলে। যতক্ষণ না জলে মাথা তলিয়ে যায় ইসারহাডন মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

ইসারহাডনের মাথা ছাপিয়ে জল উঠলো। তখন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল। ইসারহাডনের মনে হল, তিনি যেন ইসারহাডন নন, তিনি যেন আর কেউ। মনের এই বেয়াড়া আশ্চর্য্য ভাবটা কিছুতেই তিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। ইসারহাডন বুঝলেন তিনি ইসারহাডন নন।

ইসারহাডনের নাকে এলো একটা নরম মিষ্টিগন্ধ, কাণে এলো তারের বাজনার টুংটাং। ইসারহাডন দেখলেন, তিনি কিংখাবের বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর শিয়রে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বসে। এই মেয়েটিকে তিনি আর কখনও দেখেননি, তবু—তবু ইসারহাডন বুঝলেন, এই মেয়েটি তাঁরই স্ত্রী।

ইসারহাডন চোখ মেলতে মেয়েটি উঠে বসে বললে, 'লয়লী, স্বামী আমার ! কালরাতে কি খাটুনি-ই না গেছে তোমার ! যাতে তোমার ঘুম না ভাঙে, রাতজেগে আমি পাহারা দিয়েছি। এখন ঘুম ভেঙেছে তোমার। ভাল আছো তো তুমি ? রাজ্যের নায়করা সভাঘরে এসে জুটেছেন। নাও, পোষাকটা পরে নাও।'

ইসারহাডন বুঝলেন তিনি লয়লী। কিন্তু ইসারহাডন কিছুমাত্র বিস্মিত হলেন না, বরং এতকাল একথা তিনি যে জানেননি ভেবে তিনি চমৎকৃত হলেন। ইসারহাডন বিছানা ছেড়ে উঠে বেশভূষা করে নিলেন। তারপর তিনি সভাঘরে গেলেন।

'মহারাজ লয়লীর জয় হোক' বলে নায়করা ইসারহাডনের সম্বর্দ্ধনা করলেন। সবার চেয়ে যিনি বয়সে বড়, হাতজোড় করে তিনি ইসারহাডনকে জানালেন, 'মহারাজ। ইসারহাডন ক্ষান্ত হবার পাত্রটি নন। এক আধটা লড়াইটড়াই ছাড়া তাঁকে ঠাণ্ডা করা যাবে না।'

ইসারহাডন কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না। হুকুম দিলেন, ইসারহাডনকে বিষয়টা বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য দূত পাঠানো হোক।

সেদিনকার মত *লয়লী মন্ত্রণাসভা থেকে নায়কদের ছুটি দিলেন। কয়েকটি বুদ্ধিমান নাগরিককে ডেকে বললেন, 'যাও তোমরা ইসারহাডনের সভায়, তাঁকে বুঝিয়ে বলো খামাখা একটা যুদ্ধ বাধিয়ে লাভ কী?'

তখন ও কিন্তু ইসারহাডন ভাবছেন, 'তিনি লয়লী।'

ঘোড়ায় চড়ে লয়লী বুনো গাধা শিকার করতে গেলেন। নিজহাতে দুটো বুনো গাধা শিকার করলেন। প্রাসাদে ফিরে এসে লয়লী বন্ধুদের নিয়ে ভোজে বসলেন। তখন ওড়ণা উড়িয়ে বাঁদীর দল নাচতে এলো, লয়লীর মনে হল, খাসা নাচ।

রাত ভোর হল। লয়লী সভায় গেলেন। আবেদন নিবেদন অভিযোগ অনুযোগ নিয়ে একদল লোক মহারাজের অপেক্ষায় ছিল। বিচারের জন্য আসামীরাও হাজির আছে। লয়লী রোজকার মত উপস্থিত বিষয়গুলির মীমাংসা করলেন। সভার শেষে তিনি আবার তাঁর সখের শিকারে বার হলেন। নিজহাতে দুটো সিংহ মেরে তিনি প্রাসাদে ফিরে এসে খুব খানিকটা ঘটা করে ভোজ দিলেন। নাচে গানে আমোদে ভোজ শেষ হল। তারপর—সেইরাতে তিনি তাঁর স্ত্রীর নাম ধরে ডাকলেন, বেছে বেছে মধুর কথা বলে তাকে খুশি করলেন, তিনি তাকে ভালোবাসলেন, কী আশ্চর্য্য সে ভালোবাসা! জেগে জেগে তার সঙ্গে লয়লীর দুইপ্রহর রাত কেটে গেল।

রাজকাজ আর মৃগয়া, এই দুই কাজে আধা আধি ভাগ হয়ে তাঁর দিন কাটতে থাকল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এককালের ইসারহাডন, আজকালের লয়লী, তাঁর নিজেরই রাজ্যে পাঠানো রাজদূতদের পথ চেয়ে কাল কাটাতে থাকেন। একমাস বাদে

* ইসারহাডন এখন থেকে লয়লী নামেই চলবেন

রাজদূতেরা ফিরে এলেন। ইসারহাডন রাজদূতদের নাক কাণ কেটে রেখেছেন—এর চেয়ে স্পষ্ট উত্তর আর কী হতে পারে!

রাজা ইসারহাডন বলে পাঠিয়েছিলেন, রাজদূতদের অদৃষ্টে যা ঘটেছে মহারাজ লয়লীর কপালেও তার বেশী কিছু ভালো জুটবেনা। ভালো চান তো মহারাজ লয়লী ভাট ভেট সমেত মহারাজ ইসারহাডনের সভায় হুজুরে হাজির হোন।

লয়লী মন্ত্রণাসভা জুটিয়ে বসলেন। রাজ্যের নায়কেরা একগলায় বললেন, যুদ্ধ ছাড়া মান বাঁচে না। অগত্যা লয়লী রাজী হলেন। মহারাজ লয়লী নিজে সেনাবাহিনী চালিয়ে নিয়ে এ্যাসিরিয়ার দিকে ঝড়ের মত চললেন।

সাতদিন লয়লীর সেনাবাহিনী আকাশে ধূলোর ঝড় তুলে ছুটে চলল। সাতদিনের দিন পাহাড়ী জমিতে নদীর ধারে ইসারহাডনের বিশাল বাহিনী দেখা গেল।

লয়লীর সৈন্যরা প্রাণপণ যুঝল। স্বয়ং লয়লী জীবন তুচ্ছ করে লড়লেন। একসময় লয়লী দেখলেন, পাহাড়ের গা বেয়ে অগণিত শত্রুসৈন্য পিঁপড়ের মত পিলপিল করে নেমে আসছে। মহাসমুদ্রের মত বিশাল চঞ্চল শত্রুবাহিনীর সামনে পড়ে লয়লীর সৈন্যদল একবার টলমল করে হটে এলো। লয়লী ক্ষেপে গেলেন, রথ চালিয়ে যুদ্ধের কেন্দ্রভাগে তিনি ছুটে গেলেন, তাঁর উন্মত্ত তলোয়ারের কোপে শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। এক সময় লয়লী বুঝলেন, তিনি মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন, তাঁর হাত আর চলছে না। লয়লীর সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তিনি যুদ্ধে হারলেন। ইসারহাডনের সৈন্যঘেরাও হয়ে পায়ে হেঁটে সাধারণ বন্দীদের সঙ্গে ভিক্ষুকের মত বন্দী হয়ে লয়লী চললেন। দশদিনের দিন তিনি নিনেভায় পৌঁছলেন। সেখানে তাঁকে খাঁচায় আটক করা হল। ক্ষুধায়, শরীরের যন্ত্রণায় তাঁর ততটা কষ্ট হল না, যতটা লজ্জায় আর নিস্ফল আক্রোশে। তিনি বুঝলেন, তিনি আর কেউ নন, শত্রুর লাঞ্ছনার জবাব দিতে তিনি অক্ষম।

শত্রুরা তাঁকে কষ্ট পেতে দেখে আমোদ পাবে, ভেবেই না মহারাজ লয়লী দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে মুখ বুজে রইলেন। এমনি করে নিশ্চয় মৃত্যু সামনে করে বিশদিন তিনি পশুর মত খাঁচাবন্দী হয়ে রইলেন। তাঁর চক্ষের সামনে তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের মশানে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁদের মৃত্যুচীৎকার দূর থেকে খাঁচায় বসে তিনি শুনতে পেলেন। তাঁদের কারো হাত পা কেটে দেওয়া হল, জীবন্তে কারো গায়ের চামড়া তুলে নেওয়া হল, কিন্তু লয়লী একটুও অধীর হলেন না, ভয় অনুকম্পার একটা রেখা তাঁর মুখে ফুটলনা। তাঁর স্ত্রী, যাকে ভালোবেসে তিনি নিজেকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন,

তাঁর খাঁচার সামনে দিয়ে দুটো নপুংসক তাকে বেঁধে নিয়ে গেল। লয়লী বুঝলেন, ইসার-হাডনের হারেমে তাকে বাঁদী করে রাখবার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এও তিনি একটি কথাও না বলে সহ্য করলেন। কিন্তু লয়লীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙল। খাঁচার সামনে একদল সিপাই মোতায়েন ছিল। তাদের একজন বললে, 'মহারাজ লয়লী, দয়া হয় তোমাকে দেখে। একদিন তুমি রাজা ছিলে, আজ তোমার একী হাল হয়েছে! এ কথা শুনে লয়লী বুঝলেন, তিনি কী হারিয়েছেন। খাঁচার গরাদ বজ্রমুষ্টিতে তিনি আঁকড়ে ধরলেন, গরাদে পাগলের মত মাথা ঠুকে তিনি খুন হতে চাইলেন। কিন্তু নিজেকে মেরে ফেলার মত শক্তিও

গরাদ আঁকড়ে ধরলেন

তাঁর নেই। থরথর করে তিনি কাঁপতে থাকলেন। নিস্ফল আক্রোশে উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠে তিনি খাঁচায় আছাড় খেয়ে পড়লেন।

তারপর একদিন—তুজন জহ্লাদ এসে খাঁচার কবাট খুললে। পিছনমোড়া করে তাঁর হাত বেঁধে তারা তাঁকে মশানে নিয়ে গেল। লয়লী দেখলেন তীক্ষ্ণ একটা লোহার ফলা থেকে টস্ টস্ করে রক্ত ঝরছে। তাঁরই এক বন্ধুকে এই মাত্র লোহার ফলা দিয়ে বেঁধা হয়েছে। লয়লী বুঝলেন, বন্ধুর রক্তে তাঁরও রক্ত মিশবে। লয়লীর শরীর থেকে তাঁর শেষ পোষাক খুলে নেওয়া হল। লয়লীর সুডৌল নধর শরীর কঙ্কালসার হয়ে গেছে—নিজেকে দেখে তিনি চমকে গেলেন। সেই জহ্লাদ তুজন তখন তাঁকে ঝাপটে ধরে তুলে ধরলে। তারা তাঁকে শূলে চড়াতে যাচ্ছে দেখে লয়লী আতঙ্কে এতটুকু হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, 'মৃত্যু, তারপর—তারপর সবশেষ।' মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত সাহসে ভর করে তিনি নীরব থাকবেন, মহারাজ লয়লী এ সংকল্প ভুললেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি সেই জহ্লাদ তুজনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু হুকুমের চাকর তারা—পাষাণগম্ভীর তারা সেই রক্তাক্ত শূলের দিকে এগিয়ে চলল।

'না, না, এ হতে পারেনা, এ একেবারেই অসম্ভব' লয়লী ভাবলেন। 'নিশ্চয়ই আমি ঘুমিয়ে আছি, স্বপ্নে সব ঘটছে।'

একি সত্যিই ঘুম? তাহলে তো জেগে পড়লেই হয়! ভয়ঙ্কর সেই ঘুম হতে লয়লী উঠতে গেলেন। লয়লী জেগে পড়লেন, কিন্তু জেগে দেখলেন তিনি ইসারহাডন নন, লয়লীও নন—তিনি যেন একরকমের জন্তু। তিনি তবে জন্তু? লয়লী বিস্মিত হলেন। আরও বিস্মিত হলেন তিনি, এ বিষয় আগে জানেন নি বলে।

পাহাড়ের ঢালু জমিতে তিনি চড়ে বেড়াচ্ছেন। দাঁতে নরম ঘাস কাটছেন আর লেজ দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। একটা লিকলিকে লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা গাধার বাচ্চা, গভীর ধূসর রঙ, পিছনে চক্কর বেচক্কর আঁকা। বাচ্চাটা ঠ্যাঙ ছুড়তে ছুড়তে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো ইসারহাডনের কাছে। নরম মুখ দিয়ে বাচ্চাটা তার পেটের তলায় ঠোক্কর দিয়ে তুধের বাঁট খুঁজতে লাগল। তুধ চুষতে চুষতে বাচ্চাটা ঠাণ্ডা হল। ইসারহাডন বুঝলেন তিনিই এই বাচ্চার মা। ইসারহাডন বিস্মিত হলেন না, তুঃখিতও হলেন না, বরং তাঁর একটা আশ্চর্য্য রকমের আনন্দ হল। তাঁরই সন্তান এই বাচ্চা গাধা, তাঁদের তুজনের ভিতর একই জীবন বয়ে চলেছে—এ অনুভূতি তাঁর বড়ই মধুর ঠেকল।

হঠাৎ শন্ শন্ শব্দে উড়ে এসে একটা তীর তাঁর শরীরের একধারে বিঁধলো, তীরের তীক্ষ্ণ ফলাটা তাঁর চামড়া ফুড়ে মাংসে ঢুকে গেল। দল ছাড়া হয়ে তাঁরা অনেকটা দূরে

চলে এসেছেন, নিষ্ঠুর শিকারীর হাতে পড়েছেন। বাচ্চাকে সামনে তাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চললেন ইসারহাডন।

গাধার দলও ছুটে চলেছে। ইসারহাডন বাচ্চা নিয়ে দলের কাছাকাছি এসে পড়েছেন। তখন আর একটা তীর ছুটে এসে বাচ্চার গলায় বিঁধলো। চামড়া ফুঁড়ে মাংস বিঁধে দিয়ে তীরটা কাঁপতে থাকল। বাচ্চাটা কাতরস্বরে ডাকতে ডাকতে মাটিতে বসে পড়ল। নিষ্ঠুর শিকারী ছুটে আসছে, না পালালে রক্ষা নেই। তবু ইসারহাডন বাচ্চাকে ছেড়ে যেতে পারলেন না, তার শরীরটা আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাচ্চাটা একবার উঠে দাঁড়ালো। তারপর লম্বা সরু ঠ্যাঙগুলো তার কাঁপতে থাকল থরথর, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আবার বাচ্চাটা।

'এ কিছুতেই সত্য হতে পারে না, আমি এখনও স্বপ্ন দেখছি' ভাবতে ভাবতে ইসারহাডন ঘুম ভাঙবার চেষ্টা করলেন। 'আমি লয়লী নই, গাধাও নই—আমি ইসারহাডন' —ইসারহাডন চেঁচিয়ে উঠলেন। চৌবাচ্চার জলের তলা থেকে তখন তিনি মাথা তুলেছেন। ইসারহাডন দেখলেন সেই বুড়ো চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে, তার হাতের কলস থেকে তখনও বিন্দু বিন্দু জল ঝরছে।

'কী দুর্ভোগ! এ রকম কতক্ষণ?' ইসারহাডন জিজ্ঞাসা করলেন।

'কতক্ষণ আর!' বুড়ো জবাব দিলে। 'জলে মাথা ডুবিয়েই তো তুমি তুলে নিয়েছ। দ্যাখো কলস থেকে এখনও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। যাক, যা বুঝতে চেয়েছিলে বুঝেছো তো এখন?'

বুড়োর এ কথার কোনো জবাব ইসারহাডন দিতে পারলেন না। তার পানে তাকিয়ে তার মন কী একটা গভীর ভয় আর অনুভূতিতে ভরে এলো।

বুড়ো বললে, 'বুঝেছো ইসারহাডন, তুমিই লয়লী, লয়লীর যে-সৈন্যদের কাটামুণ্ড মশানে পাহাড় হয়ে আছে, তারাও তুমি-ই। শুধু কি তারাই? শিকারে বার হয়ে যে পশুদের তুমি হত্যা করেছ, যাদের মাংস মহানন্দে ভোজে বসে খেয়েছ, তাদের থেকেও তুমি আলাদা নও। তুমি ভেবেছিলে তুমি একা বেঁচে আছ। একা বেঁচে থাকতে পারো—কী ভয়ঙ্কর ভুল তোমার! আমি তোমার মোহ-যবনিকা তুলে ধরেছি, তোমাকে দেখিয়েছি, সকলের সঙ্গে তুমি বেঁচে আছো, যাকে মারছ তার সঙ্গে তুমিও মরছ। একই জীবন সকলের ভিতর বয়ে চলেছে। কারো প্রাণ নিতে যাওয়া মানে সেই জীবনকে আঘাত করা, অর্থাৎ নিজের টুটি টিপে ধরা। পরকে ঠকিয়ে, দুঃখ দিয়ে সুখী হওয়া যায় না—কারণ যে-পর সে তোমার কত আপন। সে যে তুমি-ই। তাছাড়া, তুমি মারছো কাকে?

কার গায়ে হাত তুলছ? বিরাট জীবন, যার শতকোটি অংশের এক অংশও তুমি নও, সেই জীবন কি মারবার না মরবার? যাকে মারছ, চোখে দেখছ বটে সে নেই, কিন্তু সে তখন বেঁচে উঠছে অন্য মূর্ত্তিতে, ভিন্নরূপে। মানুষ মাটী হচ্ছে, আর মাটী হচ্ছে মানুষ। রূপের অদলবদল চলছে, কিন্তু জীবন যা তাই আছে, একতিল ক্ষয় হয় নি। এক কণা জীবন চুরি করে নেওয়া, জীবনের গায়ে একটা আঁচড়কাটা মানুষের সাধ্য নয়। জীবন চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে—তার সুরু নেই, শেষ নেই। জীবন হচ্ছে একমাত্র সত্য।'

ইসারহাডন তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ দেখলেন সামনে ফিটফাট পরিস্কার—কোথায় সেই বুড়ো?

রাত পোহাতে রাজা ইসারহাডন লয়লী আর তাঁর অনুচরদের মুক্তি দিলেন। লয়লী তাঁর রাজ্য ফিরে পেলেন। তারপর, তিন দিনের দিন ইসারহাডন তাঁর পুত্র য়্যাসুরব্যানি-পালকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর হাতে রাজ্য সঁপে দিয়ে তিনি রাজধানী ছেড়ে চললেন মরুভূমিতে। সেই বুড়োর কাছে যে সত্য তিনি শিখেছিলেন, অসীম মরুভূমির একটি নির্জ্জন স্থান বেছে নিয়ে তিনি তার ধ্যানে বসলেন। একদিন, তারপর, তিনি সহরে পল্লীতে তাঁর সেই একরাত্রে শেখা সত্য প্রচার করে ফিরতে থাকলেন।

টলষ্টয়ের গল্পের অনুবাদ

শ্রীসতীকান্ত গুহ

পাথুরে চীনে মানুষ

শ্রীপ্রত্নতাত্ত্বিক

চীন দেশে আজ যেখানে তার রাজধানী পেইপিঙ মহানগরী, তারই কোল দিয়ে যে হলদে নদী—চীনের দুঃখ হোয়াং হো বয়ে গিয়েছে তার উপত্যকার ধারে ধারে, তার পাহাড়ের গুহায় গুহায়, একদিন পাথুরে চীনে মানুষদের একছত্র রাজত্ব ছিল। পৃথিবীর ইতিহাস তখনও আরম্ভ হয়নি, তখনও চীনের বিরাট প্রাচীর, তখনও মিশরের পিরামিড এর জন্ম হয়নি, তারও অনেক আগে এই পাথুরে চীনে মানুষ এর দল হলদে নদীর ধারে ধারে তার পাহাড়ের গুহায় গুহায় তাদের আস্তানা বেঁধেছিল। তাদের রাজ্য ছিল উন্মুক্ত, চোখ রাঙিয়ে কেউ তাদের শাসন করত না। যতদূর হলদে নদী দেখা যায়—হলদে নদী পেরিয়ে আরো দূরে, যেখানে আরো অনেক ছোট বড় নদী, যেখানে পাহাড়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে, ততদূর বিস্তৃত ছিল তাদের সাম্রাজ্য।

সেই সহস্র বছর আগেকার এক পাথুরে চীনে মানুষএর দল একটা বিশেষ আস্তানা গেড়েছিল হলদে নদীর কাছে আজ সেখানে চোকুতঙ গ্রাম, সেখানে গা ঘেঁষে যে পাহাড় স্তূপ তারই গুহায় গুহায়। আজ চোকুতঙ গ্রামে রেলপথ হয়েছে, রাস্তা ঘাট হয়েছে। তখন এসব কোথায় কী? রেল তো দূরের কথা কোন পথও তখন ছিল না। তখন বন জঙ্গল ছিল গভীর—হলদে নদী বয়ে যেতো আরো অনেক জোরে। জলবাতাস আবহাওয়া ছিল তখন ভিজেভিজে। তখন বনে জঙ্গলে পাহাড়ের কোলে নদীর ধারে নানা রকম অদ্ভুত জন্তু জানোয়ার চরে বেড়াত। হাতী গণ্ডার হায়না অনেক জন্তুজীব ছিল—আরো বড় রকমের। বাঘের দাঁত ছিল বেঁকান-ছোরার মত। এই ছোরা-দাঁতওয়ালা ভয়ঙ্কর বাঘ ছিল সেই পশুরাজ্যের রাজা। আর এই অসংখ্য জন্তু জানোয়ার সবার উপরে রাজত্ব করত, চোকুতঙ-এর সেই সহস্র বছর আগেকার এক পাথুরে চীনে মানুষের দল। তাদের গায়ে অসাধারণ শক্তি, তাদের হাতে থাকত অমোঘ পাথুরে অস্ত্র। তাহার রাজ্য ছিল হলদে নদী ছাড়িয়ে আরো বিস্তৃত। হাজার পাথুরে অস্ত্র তারা তৈরী-করত। এই পাথুরে অস্ত্র তৈরী করার কৌশল ও উদ্যম ছিল তাহাদের অসাধারণ। নানা রকম পাথর নানা আদব কায়দায় তৈরী পাথুরে অস্ত্র নিয়ে তাদের আর ভাববার কিছু ছিল না। তারা ছিল শিকারীর জাত আর তারা ছিল পাকা মজুর। পাথরের ভারী ভারী ছোট বড় অস্ত্র তৈরী করতে পাকা ওস্তাদ মজুর ছাড়া আর কে পারবে? বাড়ীঘরদোর করার দিকে তাদের এতটুকু
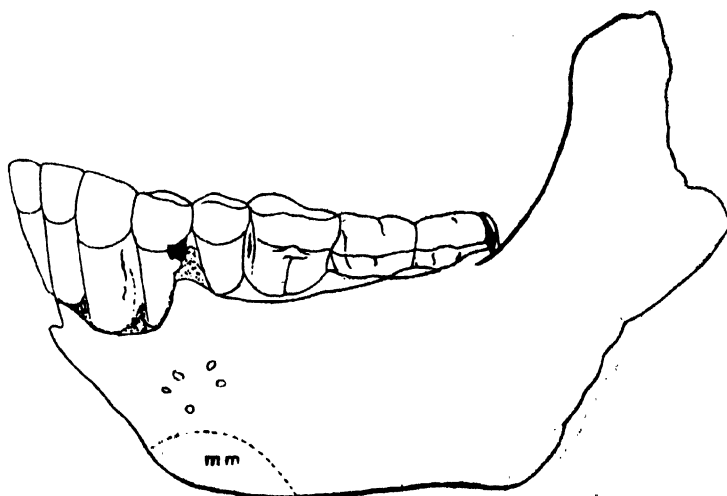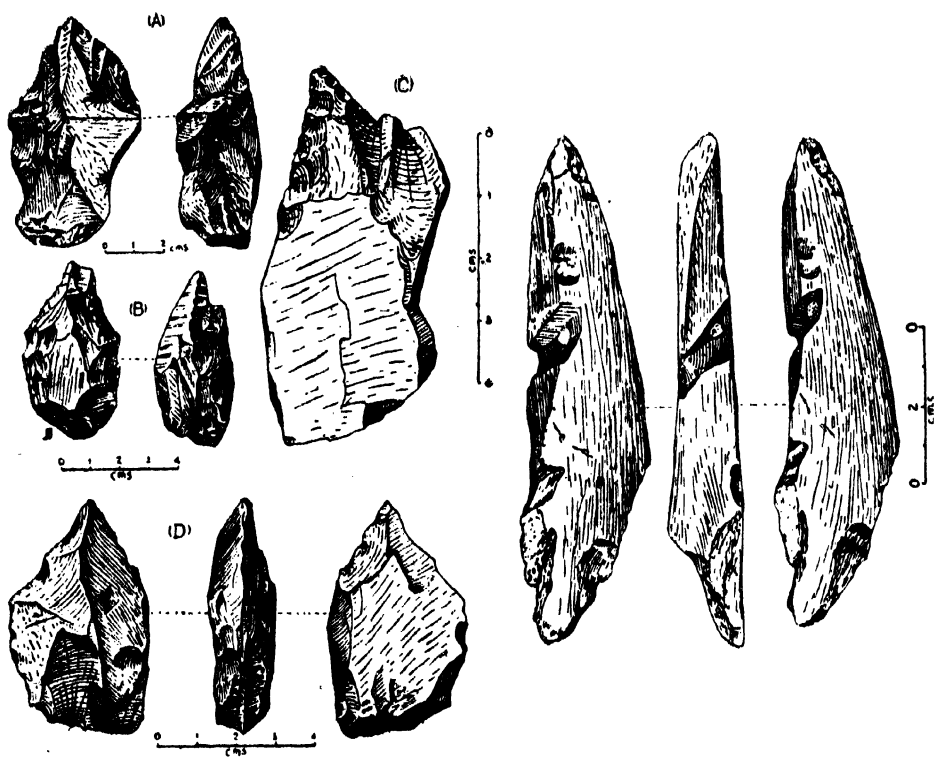
পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র

হাড়ের জিনিষ
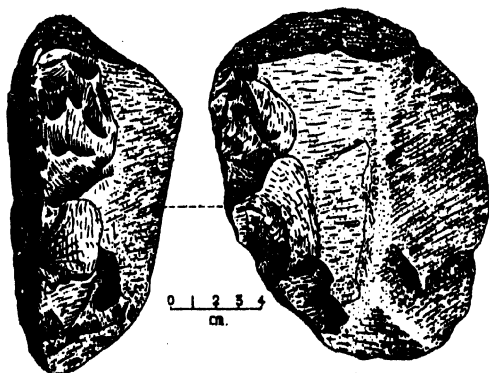
বড় পাথুরে অস্ত্র

মন ছিল না, ওসব তাদের মাথায়ও আসত না। কি দরকার ছিল তাদের? প্রকৃতির দেওয়া পাহাড়ের কোলে তাদের গুহা ছিল, কোথাও কোথাও নীল আকাশের চাঁদোয়ার নীচে তারা তাদের আস্তনা গাড়ত। রোজ তারা যা শিকার করত তাই নিয়ে এসে খেয়ে দেয়ে তারা সুখে দিন কাটাত। কোনও চাষবাসও তারা করত না, করতে তারা জানতও না। কাজের মধ্যে তাদের ছিল বন্যপশু শিকার আর পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা। লোহা তামার তখন রেওয়াজ ছিল না, কোন গন্ধই ছিল না। কাজে লাগান দূরের কথা তার খোঁজও কেউ জানত না। সে খোঁজ নেবার কেউ তোয়াক্কাও রাখত না। কেন রাখবে? তাদের সব কাজ তারা পাথর দিয়ে, নিজের পাকা হাতের গড়া পাথরের অস্ত্র দিয়েই বেশ ভাল ভাবেই সারতে জানত। কি দরকার তাদের লোহা ইস্পাতের যন্ত্রের—অতটা আধুনিক বর্ব্বর তারা ছিল না। পাথরই ছিল তাদের সোনা, পাথরই ছিল তাদের তামা, লোহা, সব কিছু।

আর একটা ভারী আশ্চর্য্য জিনিষ এই পাথুরে চীনে মানুষ এর দল জানত। আর যে জিনিষ তখনকার অন্য কোন দেশের পাথুরে মানুষের দল জানত না। এরা চকমকি ঘষে আগুন জ্বালাতে জানত। পাথরে পাথরে ঘষে মস্ত আগুন জ্বালিয়ে শীতের সময় তার চারধারে তারা দল বেঁধে বসত। সবই তাদের পাথর—যার যত পাথর সে তত বড়লোক। কিন্তু বড়লোক গরীব লোক তখন ছিল না কারণ সবাই ছিল মজুর। সবাইকেই পাথর ভাঙ্গতে হত গাদা গাদা—পাথরের অস্ত্র তৈরী করতে হত হাজার হাজার। চীনের এই আদিম অধিবাসী পাথুরে মজুর ছিল আজকের পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মজুর চীনে মজুরের অগ্রদূত।

সারা দিনের কাজ থেকে ফিরে এসে রাতে আপনার গুহায় আগুন জ্বেলে, ছেলে বুড়ো জোয়ান সবাই এক সঙ্গে বসত। রাত গভীর হলে একজন সেই আগুনের পাশেই পাহারায় বসত আর সবাই যে যার সেখানে শুয়ে পড়ত। পালা করে এক একজন সমস্ত রাত পাহারায় থেকে নিজের দলকে বিপদ থেকে রক্ষা করত। তারপর ভোরের আলোর সঙ্গে তারা জেগে উঠত আর যে যার কাজে লেগে যেত—পাথর যোগাড় করা, পাথর ভাঙ্গা, পাথুরে অস্ত্র তৈরী করা আর বনের পশু শিকার করা।

পৃথিবীর সব চেয়ে আশ্চর্য্য, এই পাথুরে মানুষের দল আসলে একেবারেই আমাদের মত মানুষ ছিল না। ভয় পাবার কিছু নেই—তারা মানুষের মতন ছিল বটে কিন্তু আকৃতিতে গড়নে তারা খানিক মানুষ খানিক অ-মানুষ বা উপমানুষ ছিল।

ভয় পাবার কিছু নেই কারণ তারা তো রাক্ষস নয়, গুহাবাসী বিভীষণও তারা ছিল না। তারা কোন জাতের গরিলা ওরাংওটাংও ছিল না। কেবল তাদের বন্য দেহের গড়নে

একটু আধটু মর্কটএর ভাব ছিল বটে কিন্তু তাদের মাথা, মাথার খুলি ছিল অনেকটা মানুষের মতই। মানুষের মতই সোজা হয়ে তারা চলতে জানত। তাঁদের দাঁতের চেহারা খানিক মর্কটের মত হলেও—তোমরা যদি ভাল করে লক্ষ্য কর তাহলে দেখবে, বানরের ও মানুষের দাঁতের বড় বেশী তফাৎ নেই—তবে আর প্রভেদ বড় বেশী কি হ'ল? আমাদের চোখে হয়ত তাদের অত্যন্ত অসভ্য বন্য বলেই মনে হবে। তাদের হাত পাএর মাংসপেশী হাড় সুদৃঢ় ও ভারী, তারা দেখতে ছিল বলবান। কিন্তু তারা হিংস্র ছিল না। একসঙ্গে মিলেমিশে তারা থাকতে জানত। আর তাদের মুখে চোখে সেই উদার দৃষ্টি ছিল যা একমাত্র মানুষ জাতেরই হতে পারে। প্রভেদ থাকলেও তাদের শরীর চোখমুখের মানুষিক গড়ন দেখে তারা যে একরকম নতুন মানুষএর জাত এ কথা বৈজ্ঞানিকরা বললেন।

কিন্তু সামান্য হলেও আজকালকার মানুষের চেহারার সঙ্গে যে অমিল দেখা গেল তাও উড়িয়ে দিলে চলে না। নানা পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা এই নতুন জীবকে মানব-জাতির ভিতর খানিকটা টেনে আনলেন বটে কিন্তু তাকে ঠিক মানুষের জায়গাটা তাঁরা দিতে পারলেন না। তাঁরা এর একটা আলাদা নাম দিলেন—'সিনান্‌থ্রোপাস্'। পাহাড়ের গুহায়,ফাটলে, মাটির তলায়—শুধু এক আধটা নয়—ছেলে বুড়ো জোয়ান, ছোটবড় অনেক রকম—সিনান্‌থ্রোপাসের পাথুরে মাথার খুলি, পাথুরে কঙ্কালের টুকরো—আর সিনান্‌থ্রোপাসের হাতের তৈরী হাজার হাজার নানা ধরণের নানা রকমের চমৎকার চমৎকার অস্ত্রশস্ত্র—এ সব দেখেই তো বোঝা গেল এদের রাজ্য ছিল একছত্র। আজকে চীনের যে মস্ত সাম্রাজ্য মস্ত সভ্যতা এর সুরু হয়েছেই সেই আদিম পাথুরে চীনে মানুষদের রাজত্ব থেকে।

যা হোক একদিন যে এই পাথুরে চীনে মানুষদের একছত্র রাজত্ব ছিল ঠিক বর্ত্তমান চীনে রাজধানী পেইপিঙএর কাছেই, হলদে নদীর ধারে, তার খবর কেউ জানতে পেত না, যদি না কয়েকজন অনুসন্ধিৎসু অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিক, চোকুতঙ্‌এর পাহাড় পর্ব্বত গভীর বনজঙ্গল ঘুরে, একদিন পাহাড়ের গুহায় তাদের লুকোন আস্তানা প্রথম খুঁজে না পেতেন। সেই পাথুরে যুগের চীনে মানুষেরা তো আজ পাথুরেই হয়ে গিয়েছে। সহস্র বছর পাথরের চাপে তাদের আর পাথর না হয়ে উপায় কী? কিন্তু চতুর বৈজ্ঞানিক দেখবামাত্র তাদের চিনে ফেলেছিলেন। আর চাপা মাটি পাথরএর ফাঁকের ফাটল থেকে প্রকৃতিও তাদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করলে। বৈজ্ঞানিকদল চাপা মাটি পাথর আরো খোদাই করে তাদের নিভৃত অন্ধকার পৃথিবীর আলোতে নিয়ে এলেন।

প্রস্তরযুগের গুহাবাসী পাথুরে উপমানুষের রহস্যরাজ্যের আবরণ এমনি করে অনাবৃত হল।

চোকুতঙ্‌এর এই গুহাবাসী পাথুরে চীনে মানুষই চীন সাম্রাজ্যের যে কেন সব চেয়ে আদিম অধিবাসী ছিল তার উত্তর দিয়েছেন ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ। কিন্তু অনেকে সন্দেহ করে প্রশ্ন করেছেন যে ঐ সব হাজার হাজার পাথুরে অস্ত্র যে ঐ পাথুরে সিনান্‌থ্রোপাস্‌এর দলই তৈরী করেছে—তার মানে কী? তার প্রমাণ কী? এমনও তো হতে পারে যে, কোন আধুনিক কিম্বা অন্ততঃ সিনান্‌থ্রোপাস্‌ এর চেয়ে সভ্য, বা নতুন অন্য কোন জাতের মানুষ ঐ সব পাথুরে অস্ত্র তৈরী করেছে—গুহাতে তাদের ব্যবহার করা আগুনের চিহ্ন রেখে গিয়েছে? কে দেখেছে, এমনও তো হতে পারে, সেই নতুন জাতের মানুষ সিনান্‌থ্রোপাসকে হত্যা করে গিয়েছে ঐ গুহাগুলির ভেতর—যেমন হয়ত সে অন্যান্য জীবজন্তু সেখানে মেরে গিয়েছে। এঁদের সন্দেহের কারণ মানুষ ছাড়া কেউ আগুন জ্বালতে পারে না—আর এই পাথরের মত সুন্দর অস্ত্রগুলি অত আদিম কোন জাতির তৈরী হতে পারে না। এর উত্তরে যে বৈজ্ঞানিক দল সিনান্‌থ্রোপাস্‌কে খুঁজে বার করেছেন, যাঁরা সেখানে বছরের পর বছর অভিযান করে সমস্ত পাহাড় জঙ্গলে মানুষ থাকবার উপযোগী আস্তানাগুলি পরীক্ষা করেছেন—তাঁরা সকলেই বলেছেন যে সিনান্‌থ্রোপাস্‌এর সেই কাল্পনিক হত্যাকারীর কোনও খোঁজ তাঁরা আজ পর্য্যন্ত পান নি। বরঞ্চ সিনান্‌থ্রোপাসএর মাথার পাথুরে খুলিগুলি, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও আগুন জ্বালার চিহ্ন তাঁরা এমন অবস্থায় এক সঙ্গে পেয়েছেন যে তাতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে সিনানথ্রোপাস্‌ই ঐ সব পাথুরে অস্ত্র তৈরী করত—সিনান্‌থ্রোপাসই আগুন জ্বালিয়ে বাস করত সেই গুহায়। আর সিনান্‌থোপাস্‌ তো মানুষই—মানবজাতির বিরাট গোষ্ঠীর একজনই তো তাকে বলতে হয়! সে সময়ে দ্বিতীয় অন্য জাতের মানুষএর সেখানে আবির্ভাব যেমন আজ অপ্রমাণিত তেমনি সম্ভাবনার বাইরে।

এই আদিম পাথুরে চীনে মানুষই গোড়ায় সুরু করেছিল যে একছত্র রাজ্য আজ তা বর্ত্তমান বিরাট চীন সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আজকের মহাচীন দেশের মজুর সেই হলদে নদীর ধারের পাথুরে মজুর চীনে মানুষেরই যে বংশধর সে কথা অনেকে বলছেন। এতদিন যে পেইপিঙ এ পর্ব্বত গুহার মাটি পাথরের তলায় তার পাথুরে অস্ত্র সম্পদ নিয়ে চাপা পড়েছিল আজ তার শাপ মোচন হল। আজ তার সমস্ত লজ্জা আড়ষ্টতা ভেঙ্গে দিয়ে পাথুরে চীনে মানুষকে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে বর্ত্তমান জগতের আলোয় নিয়ে এসে তাকে সসম্মানে পেইপিঙ ও প্যারি যাদুঘরে রাখা হয়েছে। আজকের চীনে মানুষ তাদের দেখে কি ভাবে সেই জানে।

পাথুরে চীনে মানুষের রহস্য রাজ্যের এই হল গোড়ার কথা।

ছবি তোলা

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলার সখ অনেকেরই আছে। কারো দামী ক্যামেরা আছে, কারো হয়তো কম দামের বাক্স-ক্যামেরা (Box-form camera) আছে; কারো হয়তো ক্যামেরাই নাই;—অন্যের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলে।

সখ থাক্‌লেই ভাল ছবি তোলা যায় না বটে; কিন্তু, সখ থাক্‌লে, খারাপ ছবি তুলে দ'মে গিয়ে ছবি তোলা বন্ধ না ক'রে, আরো ভাল ছবি তুলতে চেষ্টা করার, এবং সে চেষ্টায় কৃতকার্য্য হবার সম্ভাবনা থাকে। ভাল ক্যামেরা থাক্‌লেই ভাল ছবি তোলা যাবে তার কোনও মানে নাই; কিন্তু, ভাল ক্যামেরার সাহায্যে ভাল ছবি তোলা যে অনেক বেশী সহজ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। (১) সখ, (২) ভাল ক্যামেরা আর (৩) ছবি তোলার কায়দা জানা—এই তিনটি জিনিষ একত্র হ'লে তো কথাই নাই।

যা'র কাছে কম দামের বাক্স-ক্যামেরা আছে, তা'রও দম্‌বার কোনও কারণ নাই। ছবি তুল্‌বার নিয়ম এবং কায়দা জানা থাক্‌লে তা' দিয়েও সুন্দর ছবি তোলা যায়। আমার একটি বন্ধু সেদিন ঐ রকম ক্যামেরায় তোলা কয়েকটি ছবি এনেছিলেন, তা'র প্রত্যেকটি সুন্দর আর স্পষ্ট।

ছবি তুল্‌বার সময় তিনটি কথা ভাব্‌তে হবে:

(১) ছবির বিষয়

(২) ছবির জিনিষগুলির ঠিকমত সমাবেশ

(৩) ছবি তোলার কায়দা (এবং নিয়ম)।

এই তিনটি যা'র ভাল রকম জানা আছে, সে অতি সহজেই সুন্দর ছবি তুল্‌তে পার্‌বে। এখন, এই তিনটি বিষয়কে একটু আলোচনা ক'রে দেখা যাক্।

(১) ছবির বিষয়: তোলার কায়দা নিখুঁত হলেও, ছবির মধ্যে কোনও দেখ্‌বার মত বিষয় না থাক্‌লে সে ছবির কোনও মূল্য নাই। শুধু একটি ধূ-ধূ-করা মাঠের ছবি তুলে কি লাভ? সেই মাঠের মধ্যে লাঙ্গল-কাঁধে কৃষক একটি থাক্‌লে হয়তো ছবি হিসাবে সেটা অনেক সুন্দর হবে। বড় নদীর জলের ছবি তুলে কোনই সৌন্দর্য্য দেখতে পাওয়া যাবে না; কিন্তু নদীর পিছনে বাড়ী, গাছপালা ইত্যাদি, এবং জলে দু'চারটা নৌকা, পানশি ইত্যাদি থাক্‌লে হয়তো সুন্দর ছবি হবে। দিনের বেলা তোলা নদীর জলের ছবি হয়তো

একেবারে সৌন্দর্য্যহীন মনে হবে ; কিন্তু সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তে তোলা সেই নদীর উপর আলো-ছায়ার খেলা ছবিতে নদীকে অপরূপ সৌন্দর্য্য দেবে। অন্যমনস্ক খুকী বা খোকাবাবুর ছবির তত মূল্য নাই, যতটা তা'র হাসি, কৌতূহল প্রভৃতি ভাবের ছবির মূল্য আছে। জীবজন্তুর ছবির সম্বন্ধেও তাই। তাদেরও খেলাধূলা, কৌতূহলী ভাব প্রভৃতির ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আকাশের পূঞ্জীভূত মেঘ যে কি সুন্দর, ছবিতে তা' অনেক সময় বেশ বোঝা যায় ;—সেটা, তুল্‌তে জানার উপর অনেকটা নির্ভর করে। মোট কথা, ছবিতে দ্রষ্টব্য জিনিষ চাই, কৌতূহল জাগাবার মত কিছু চাই।

(২) **ছবির জিনিষগুলির (বা অংশগুলির) ঠিকমত সমাবেশ** : ছবি তুল্‌বার সময় এ বিষয়ে খেয়াল থাকা খুবই দরকার। হয়তো খোকাবাবুর হাসির একটী সুন্দর ছবি তুল্‌লে, কিন্তু মুখখানাই একপেশে হয়ে গেল আর ছবির মাঝখানে একটা মোটা বাঁশের ছবি উঠে একদম ছবির চেহারা মাটি করে দিল। একটা পাহাড়ে জায়গার ছবি হয়তো তুল্‌লে কিন্তু পাহাড় গিয়ে উঠ্‌ল আকাশে : আকাশ গেল ছবি থেকে প্রায় বাদই প'ড়ে। কিম্বা, ছবির বেশীর ভাগই উঠ্‌ল আকাশ ; পাহাড় একেবারে নীচে দেখা গেল ; সাম্নের জমি বাদই প'ড়ে গেল। তা' ছাড়া ছবির চারিপাশের জায়গার তারতম্য হওয়ায়ও অনেক সময় ছবির চেহারা মাটি হয়। মুখের ছবির চারিদিকে জায়গা না থাকায়, অথবা অতিরিক্ত জায়গা থাকায়, অথবা বেখাপ্পাভাবে চারিদিকে জায়গা রাখায় ছবি অনেক সময় খারাপ হয়। অনেকের ছবি একত্রে তুল্‌বার সময় (Group photo) সাজাবার অভাবে অনেক সময়ই ছবি খারাপ দেখায়। মেঘের ছবি তুল্‌তে গিয়ে হয়তো মেঘ গেল একেবারে উপরে—সম্মুখে বাড়ী বা গাছে ভরা। দাদুর হাত ধরে নাতি বা নাত্‌নি চলেছে, এই ছবি তুল্‌তে গিয়ে হয়তো নাতি বা নাত্‌নি একটু পিছনে পড়ায় মনে হলো দাদু একটি পুতুল নিয়ে চলেছেন ; কিম্বা, দাদুর আড়ালে নাতি বা নাত্‌নি লুকিয়ে। এ রকমের শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। সামান্য দু চারিটি যা' দিলাম তা' থেকেই বুঝ্‌বে, ছবির মধ্যে যে জিনিষগুলি উঠবে তাদের ঠিক মত সমাবেশ হওয়া নিতান্ত দরকার।

(৩) **ছবি তোলার কায়দা (এবং নিয়ম)** : এটি জানা না থাক্‌লে সবই মাটি। ক্যামেরা কি ভাবে ধরতে, খাটাতে এবং ব্যবহার করতে হবে ; আলো কি ভাবে এলে ছবি ভাল উঠবে, এক্সপোজার কতখানি দিতে হবে, কত বড় 'ষ্টপ' ব্যবহার করা হবে, যে জিনিষের ছবি তোলা হবে তার দূরত্ব আন্দাজ কেমন ক'রে করা হবে, ইত্যাদি বিষয় জানা না থাক্‌লে ভাল ছবি কেমন করে তুল্‌বে ? অধিকাংশ কম দামী ক্যামেরায় 'ভিউ ফাইণ্ডার' [view finder] দেওয়া থাকে ; তার মধ্যে যে ছোট ছবি দেখা যায় সেটি দেখেই ছবির

সম্বন্ধে সব ঠিক করতে হবে। জিনিষের দূরত্ব কম বেশী হলে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে সে সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে না;—সেটি তোমার নিজের আন্দাজ দিয়ে ঠিক করতে হবে। এক্সপোজার সম্বন্ধেও তোমার নিজের আন্দাজ থাকা চাই। ক্যামেরা বাঁকা করে ধরায় অনেক সময় ছবিতে সবই যেন কাৎ হয়ে আছে দেখায়। প্রথম প্রথম ছবি তুলতে গিয়ে অনেক সময় ক্যামেরা নড়ে যায়। তাতে হয় ছবি ঝাপসা ওঠে নয় তো ছবি একপেশে হয়ে যায়। কত সময় মুণ্ডকাটা ছবি ওঠে, কত সময় শুধু মুণ্ডই ওঠে,—বাকিটুকু সব আকাশ। ক্যামেরার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ছবি তোলার নানা অসুবিধা ক্রমশঃ কমে আস্‌ছে বটে, কিন্তু, তবুও, নিয়ম-কানুন সবই জানা থাকা দরকার। আলো কোন্ দিক দিয়ে এলে ছবি ভাল উঠবে, সেটা জানা না থাকায়ও অনেক সময় বিভ্রাট ঘটে। পিছনে উজ্জ্বল আলো থাকলে প্রায়ই মানুষের চেহারা কালো ভূত উঠবে, মুখের চেহারা ঠিক রাখতে গেলে পিছন দিকটা একেবারে ধ্বল ধ্বলে শাদা হয়ে ছবি মাটি করে দেবে। ভাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুল্‌লেও আলো ঠিক না হলে ছবি ঠিক উঠবে না। এই রকমের নানা খুঁটিনাটি বিষয় জানা থাক্‌লে তবে ওস্তাদ ফটোগ্রাফার হওয়া চলে।

এবার বিষয়টির মোটামুটি আলোচনা কর্‌লাম, পরে এক একটি বিষয় নিয়ে দু'চারটি কথা বল্‌বার ইচ্ছা রইল। ক্যামেরা সম্বন্ধেও দু'চারটি কথা ভবিষ্যতে বল্‌বার ইচ্ছা রইল—যদি তোমাদের শুন্‌বার ইচ্ছা এবং উৎসাহ আছে বলে জানতে পারি।

বর্ত্তমান তুর্কীর প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশা আর ইহ জগতে নেই। গত ৯ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কামাল ছিলেন বিদ্রোহী পুরুষ—সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন তুর্কীকে ভেঙ্গে চুরে তাকে নতুন করে কামাল গড়েছিলেন। আজ তাঁর অকাল মৃত্যুতে হয়ত এই অশান্তি-পূর্ণ জগতে আরও অশান্তি আসবে। কে জানে আজকের এই দুর্ব্বল তুর্কীদেশ ইউরোপের অগ্নি দৃষ্টি থেকে কেমন করে নিজেকে বাঁচিয়ে অশান্তি ও বিগ্রহ থেকে রক্ষা পাবে! তুর্কীতে অবশ্য কামালের নিজের হাতে গড়া নির্ভীক সেনাপতির অভাব নেই কিন্তু নাৎসী জার্ম্মাণীর গায়ের জোর ও চোখ রাঙানি অমান্য করতে আর এক কামাল পাশার প্রয়োজন। গত মাসের রংমশালে আমরা লিখেছিলাম তুর্কীর পূর্ব্ব মন্ত্রী ইসমেৎ পাশা কামালের গদীতে বসবেন। ইসমেৎ পাশাই আজ শোকসন্তপ্ত তুর্কীর নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। তিনি স্থির করেছেন কামাল পাশার রাজনীতিই তিনি মান্য করে চলবেন।

ভারত বিখ্যাত সেতারিয়ে প্রঃ এনায়েৎ খাঁ গত ১১ই নভেম্বর শুক্রবার কলিকাতায় হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এনায়েৎ খাঁ ছিলেন সুরের যাদুকর—তাঁর ঐন্দ্রজালিক সুরবাহার ও সেতার বাজনা যে একবার শুনেছে সে কখনও ভুলবে না। তাঁর মধুর হাতে সেতার মূর্ত্ত হয়ে উঠত। ভারতের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতারিয়ে ছিলেন। এবার এলাহাবাদে মিউজিক কনফারেন্সে তিনি সেতার বাজাতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, সেখানে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এনায়েৎ খাঁ এর পিতা ৺ইমদাদ খাঁ ছিলেন খুবই বড় ওস্তাদ, তিনি ইন্দোর রাজসভার ওস্তাদ ছিলেন। এনায়েৎ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার অধিকাংশ গুণের অধিকারী হয়ে তিনিও ইন্দোরের সভা-সেতারিয়ে নিযুক্ত হন। ১৬ বৎসর আগে তিনি কলিকাতায় এসে বসবাস করতে থাকেন। মৃত্যুকালে এনায়েৎ খাঁ গৌরীপুর দরবারের রাজওস্তাদ ছিলেন। তাঁর পুত্র বেলায়েৎ খাঁও একজন গুণী সেতারিয়ে। ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ এর মৃত্যুতে ভারতের সঙ্গীত মহল যে ক্ষতিগ্রস্ত হল তা বলা বাহুল্য।

চীন দেশের মর্ম্মান্তিক নিগ্রহে ও জাপানের অত্যাচারে ও বর্ব্বরতায় ক্ষুব্ধ হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জাপানী কবি নোগুচিকে তাঁর পত্রের উত্তরে বলেছেন যে, তাঁরা কি মনে করেন যে শবের বিরাট পাহাড় সাজিয়ে, সহর গ্রাম লুট করে আগুনে পুড়িয়ে কখনও এই দুই বিরাট দেশের মিলন ঘটাতে পারবেন? নোগুচি লিখেছেন, চীনেরা জাপানীদের জব্দ করবার জন্য তাদের নিজেদের সমস্ত প্রাসাদে কলাভবনে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। নোগুচির এ কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, নেপোলিয়নের মনের অবস্থাটা এরকমই হয়েছিল—যখন রাশিয়ার মস্কো সহর আক্রমণ করে তিনি দেখলেন সেখানকার ঘরবাড়ী সব দাউ দাউ করে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। শত্রুহাতে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে নিজেদের সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিজেদের হাতে ধ্বংস করা ঢের ভাল। পত্রের শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—আমি আজ অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলছি, তোমার দেশবাসীদের আমি ভালবাসলেও তোমাদের কোন শুভকামনা আমি করতে আজ অক্ষম। তোমাদের শীঘ্র অনুতাপ ঘটে এই প্রার্থনা করি।

প্যালেষ্টাইন আরবদের দেশ। কিন্তু প্যালেষ্টাইনে আজ অশান্তির শেষ নেই। সেখানে আজকের এই ইহুদী-আরব দাঙ্গাহাঙ্গামার সুবিধে নিয়ে ইংলণ্ড প্যালেষ্টাইনের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী হটিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। ইংলণ্ডের আপন ইচ্ছে নয় যে এই দুই অত্যাচারিত জাতির কোন মিলন ঘটে। গত মহাযুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ড তার নিজের স্বার্থের জন্য এই দুই জাতিকেই নানা লোভ দেখিয়ে বাকচাতুরী ও ছলনায় তাদের ধ্বংসের পথে টেনে এনেছে। কিন্তু প্যালেষ্টাইন আজ একেবারে দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। হুমকি ও কামানের গোলা তাদের আরও অশান্ত করে তুলছে। ইউরোপে এক সভায় পণ্ডিত জহরলাল বলেছেন যে আজকের প্যালেষ্টাইনে যে যুদ্ধবিগ্রহ, ইহুদী-আরব সংঘর্ষ প্রভৃতি বেধেছে, তার জন্য সম্পূর্ণভাবে ইংলণ্ডই দায়ী। প্যালেষ্টাইনের পুরোপুরি অধিকার ও স্বায়ত্তশাসন আরবদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। আরবদেরও উচিত ইহুদিদের ন্যায্য ক্ষমতা দিয়ে তাদের থাকবার জায়গা দিয়ে মিলেমিশে বসবাস করা। ইংলণ্ড আর কোন ছলনা করে কিছুতেই পূর্ণ অধিকার থেকে আরবদের বঞ্চিত রাখতে পারবে না। স্বাধীনচেতা দুর্দ্ধর্ষ আরব হীনতা ঘৃণা করে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সে আজ অস্ত্রধারণ করেছে। তার আসল যুদ্ধ ইহুদীদের বিরুদ্ধে নয়।

এবার সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন একজন আমেরিকান মহিলা সাহিত্যিক। তাঁর নাম মিসেস পার্ল বাক। তাঁর যে বইটি পৃথিবীতে নাম কিনেছে সে বইটির নাম—

The Good Earth. বইটি চীনদেশের কৃষক জীবন নিয়ে লেখা। The Good Earth কেবল একটি বিরাট উপন্যাস নয়—লেখিকা নিজে চীনদেশে ছিলেন, সেখানকার ভাষা তিনি জানেন, সেখানে নিজের চোখে যা দেখেছেন, নিজের দরদী অন্তর দিয়ে যা অনুভব করেছেন বইটি তারই একটি প্রতিলিপি। উর্বরা সহনশীলা ধরিত্রীমাতার সঙ্গে মহা চীনের তুলনা করে তিনি তাকে মহিয়সী করেছেন তাঁর লেখায়। মিসেস বাককে নোবেল প্রাইজ দিয়ে শুধু তাঁকেই সম্মান দেখান হয়নি সেই অতি প্রাচীন একদা সমৃদ্ধি-শালিনী মহাচীন দেশের প্রতিও সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখান হয়েছে। মিসেস বাক যখন মাত্র চার বৎসরের শিশু তখন তিনি চীন দেশে যান। এমন কি ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করার আগে তিনি চীন ভাষা শিখেছিলেন। পরে দেশে ফিরে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করে তিনি চীন দেশে ফিরে ইংরাজি অধ্যাপনার কাজ করেন। মিসেস বাক এর পূর্ব্বে আরও তিন জন মহিলা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তাঁদের নাম সেলমা ল্যাগেরলফ, গ্রেংসিয়া দেলেদ্দা ও সিগ্রীড উণ্ডসেট। মিসেস বাক আরও কয়েকটি ইংরাজি ও চীনে বই লিখেছেন।

উল্টো মানুষের নাম শুনেছ কখনও? হাঁ, তা তাকে উল্টো মানুষই বলতে হয় বটে। তা ছাড়া কী? আমরা যেমন সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে দেখি তেমন করে দেখলে তার কাছে পৃথিবীটাই সত্যিই উল্টো। দুপায়ের মধ্যখানে মাথা নীচু করে নামিয়ে পেছন দিয়ে ফিরে তবে সে সোজা দেখতে পায়। নইলে চোখের সামনে তার যে মানুষগুলো চলাফেরা করছে সব উল্টো। পৃথিবী তার ওপরে, আকাশ নীচে। এই উল্টো মানুষটির নাম জ্যাক পেরো। লোকে তাকে বলে পাগল, তাকে নিয়ে হাসি তামাসা করে। কিন্তু হাসি তামাসা নয়, এ তার চোখের অসুখ। যদিও সে অসুখ তার অদ্ভুত ও অসাধারণ বলতেই হয়। জ্যাক পেরোর বাড়ীতে একবার একটা বিস্ফোরণের ফলে ভীষণ দুর্ঘটনা হয়, তার ফলে আগুনের ভেতর থেকে অজ্ঞান অবস্থায় টেনে বের করে তাকে বাঁচান হয়। তারপর থেকেই তার চোখের অসুখ। তার চোখের সামনে সে সব উল্টো দেখে। সোজা ভাবে দেখতে হলেই তাকে তার মাথা নীচু করে এনে দুপায়ের মধ্য দিয়ে দেখতে হয়। পেরোর সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে হবার সব ঠিক ছিল। কিন্তু এই উল্টো মানুষকে নিয়ে সে ঘরসংসার কি করবে? তাই দুঃখে বেদনায় ও লোকের তামাসায় ক্ষুব্ধ হয়ে বেচারা পেরো জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

জনপ্রিয় বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীননীগোপাল মজুমদার সিন্দ প্রদেশে জহুতে এব ডাকাতের দলের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের বনে জঙ্গলে পাহাড়ে মরুভূমিতে

ঘুরতে হয়। জঙ্গুতে লোকালয়ের অনেক বাইরে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে কর্ম্মচারীদের নিয়ে তিনি ছিলেন। যেদিন সকালে ডাকাতরা ননীবাবুকে হত্যা করে, তার আগের দিন রাত্রে তারা কাথিয়ায় এক জমীদার বাড়ী লুট করেছিল। ভোর রাত্রে এই ডাকাতের দল জঙ্গুর ধার দিয়ে ফিরছিল—হঠাং তারা ননীবাবুর তাঁবুগুলি দেখতে পায়। তখন এই ডাকাতের দল কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে বন্দুকের। আওয়াজ শুনে ননীবাবু ও তাঁর কর্ম্মচারীরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন। ননীবাবু বেরিয়ে আসা মাত্রই ডাকাতের দলের একজন তখনই তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলে—অন্যান্য কর্ম্মচারীদের ও খুন করে। তারপর তাঁবু লুটপাট করে তারা উধাও হয়। দিনে ডাকাতি ও এই সব খুন জখম করাচী প্রদেশের লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ননীবাবু কেবল তাঁবুর বাইরে এসে দাড়িয়ে ছিলেন মাত্র, তখনই ডাকাতের গুলীতে তিনি মারা পড়েন। শোনা যাচ্চে পুলিশে ঐ জায়গা এরোপ্লেন ক'রে পর্য্যবেক্ষণ করছে। প্রত্নতাত্ত্বিক মজুমদার মশাই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নতুন গবেষণা করেছিলেন। তাঁর কাজ ইউরোপেও খুব প্রশংসা পেয়েছিল। ডাকাতের হাতে তাঁর এই আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুতে আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়েছি। আমরা তাঁর সন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের আমাদের আন্তরিক সহানুভুতি জানাচ্ছি।

সেণ্ট নেভিল ও ড্রাগন

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক দিন খুব একটা বড় রকমের বীরত্ব প্রকাশ করার সুযোগ ঘটেনি—বয়স বেড়ে চলেছে, যৌবনের উৎসাহ কিন্তু এখনও কমেনি, সেণ্টনেভিল চলেছিলেন পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে আকাশ পথে। দেশ দেশান্তরের উপর দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়ে চলেছে—কোথায় কোন্ যোদ্ধা বর্ম্ম এঁটে তলোয়ার হাতে যুদ্ধের আশায় অপেক্ষা করে আছে, কোথায় কোন্ সুন্দরী রাজকন্যাকে দস্যুরা বন্দী করে রেখেছে তারি সন্ধানে।

যেতে যেতে এক জায়গায় এসে তিনি দেখেন—এক গাছের তলায় ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে আছে এক পরমা সুন্দরী মেয়ে, তার পাশেই দাড়িয়ে রয়েছে এক ভীষণ আকৃতির ড্রাগন। তার রক্ত চোখে আগুন ঠিকরে পড়ছে, লকলকে জিভ থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে, নিশ্বাসে চারিপাশের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠছে।

মেয়েটি সেণ্টনেভিলকে দেখে করুণ সুরে কেঁদে উঠলো—"রক্ষা করুন আমায়। এই দুষ্ট রাক্ষসটা আমার হাত পা খেয়ে ফেলতে চাইছে।"

সেণ্টনেভিল একটিবার হাওয়ায় তলোয়ার ঘুরিয়ে নিলেন বন্‌বন্। তারপর গোঁফ চুমড়ে বললেন, "নির্ভয় হও। আমি মুস্কিল আসান করে দিচ্ছি।"

ড্রাগনের দিকে ফিরে সেণ্টনেভিল ভ্রূকুঁচকে বললেন "দ্যাখো বাপু এই মেয়েটিকে প্রাণে মারা তোমার উচিত হয় না। আমি কথা দিয়েছি একে, যদি নিরস্ত না হও তোমার সঙ্গে বাধ্য হয়ে আমাকে লড়াই করতেই হবে।"

ড্রাগনের চোখমুখ দিয়ে খানিকটা আগুনের হল্কা বার হয়ে এলো—হুম্ হুম্ করে সে বলে উঠল—"বটে! আমি এই মেয়েটার হাত পা খাবোই খাবো।"

সেণ্ট তলোয়ারের খাপে একবার হাত দিলেন, তখন ড্রাগনের ভীষণ মূর্ত্তিটা তার চোখে পড়ল। সেণ্ট নেভিল একটু যেন ভাবনায় পড়ে গেলেন, খানিকটা মাথা চুলকলেন। একটা বুদ্ধি তার মাথায় এলো, একটু হেসে তিনি বললেন "আহা, এত চটো কেন? খাওনা তুমি মেয়েটির হাত পা। কিন্তু দেখো বাপু, মেয়েটি যেন প্রাণে না মরে।"

ড্রাগন আমতা আমতা করে বললে, "সে কী রকম?"

সেণ্ট নেভিল মুরব্বি চালে হেসে বললেন, "কী রকম আবার! রকমটা নিতান্ত সোজা।

তোমাকে কথা দিতে হবে তুমি মেয়েটির হাত পা খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। আমি নয় মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে ধরে রাখব, তুমি আস্তে আস্তে বেশী ব্যথা না দিয়ে হাত পা খাবে, বুঝেছ।"

মেয়েটির চোখ কপালে উঠল। কপাল চাপড়ে কেঁদে সে বললে. "আমার হাত পা খেলে আমি কি আর বেঁচে থাকবো! সেন্ট নেভিল. এতবড় বীরপুরুষ হয়ে আপনি এ কী বলছেন?"

সেন্ট নেভিল গলা খাখারি দিয়ে বললেন, "চুপ। আর একটি কথা নয়। এসব ব্যাপার আমি বেশ ভালোই বুঝি। নাও, এসো, লক্ষ্মীটির মত চুপ হয়ে শুয়ে পড়ো।"

মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে ধরে সেন্ট নেভিল মোলায়েম স্বরে বললেন, "ড্রাগন মশাই আপনি এখন তাহলে"—

ড্রাগন হাহা করে হেসে বললে, "তা বেশ, তা বেশ,—"

মেয়েটির হাত পা খাওয়া শেষ হল।

সেন্ট নেভিল তখন একগাল হেসে বললেন, "আচ্ছা ড্রাগন মশাই, এখনকার মত বিদায় হই। আপনার সঙ্গে দেখা হল, পরম সুখের বিষয়।"

ড্রাগন ভদ্রতা করে ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললে "আমার স্পষ্টই ধারণা হচ্ছে আপনার মত এত বড় বীর পুরুষ আর ত্রিভুবনে নেই।"

হেঁহেঁ করে হেসে খাপে ভোঁতা তলোয়ারটা পুরে নিয়ে সেন্ট নেভিল একদিকে চলে গেলেন। ড্রাগনটা গর্জ্জন করতে করতে একদিকে চলল।

মেয়েটির তখন হয়ে এসেছে। সে কাতর স্বরে বলে উঠল—"সেন্ট নেভিল মশাই, একটু দাঁড়ান, একটু শুনুন।"

কিন্তু কে শোনে! সেন্ট নেভিলের পক্ষীরাজ তখন পশ্চিমের দিকে দ্রুত প্রস্থান করছে।

বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে

চাঁদ এসেছে চাঁদ হেসেছে

শ্রীসতীকান্ত গুহ

ঘুম্ ঘুমা ঘুম্ ঘুম্
ঘুম্তা ঘুমা ঘুম্
আয় নেমে আয় ঘুম
ঘুম নেমে আয় রাতের ছায়ায়
হাওয়ার পাথায় ঘুম
আয়রে নেমে একটু থেমে
শিরশিরিয়ে ঘুম
থির থির থির খোকনমণির
চোখের পাতায় ঘুম

ঘুমতা ঘুমা ঘুমা
চাঁদের চোখে কে দিয়েছে ঘুম-আহুরে চুমা
কে দিয়েছে হায় রে খোকন
চাঁদের চোখে চুমুর আঁকন
কে দিয়েছে কে দিয়েছে কে দিয়েছে রে
চাঁদ এসেছে চাঁদ হেসেছে
ঘুমোয় বোকা চাঁদ

ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্
আয় নেমে আয় ঘুম
আয়রে নেমে খানিক রেঙে
আয় স্বপনের ঘুম
চাঁদের চোখে তারার চোখে
তোমার চোখে আমার চোখে

মায়ের চোখে খোকার চোখে
ঢুল-কাজলের ঘুম
লাল পাহাড়ে নীল পাহাড়ে
হিম পাহাড়ে সব পাহাড়ে
বরফ চূড়োর মেঘের সারে
এলিয়ে পড়া ঘুম
পাখীর চোখে পাতার চোখে
ছোট্ট ঝিঁঝির ঝিমোন চোখে
ঘুমিয়ে পড়া রাতের চোখে
ঘুমিয়ে পড়া ঘুম
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুম

ঘুম নেমে আয় রে
নিশুতরাতে আকাশটাতে ঘুমিয়ে কে যায় রে
ঘুমের বুড়ো হায়রে খোকন
ঘুমিয়ে বুঝি দেখছে স্বপন
কে ঘুমোল কে ঘুমোল কে ঘুমোল রে
চাঁদ ঘুমোল রাত জুড়োল
ঘুমোয় বোকা চাঁদ

রাত জুড়োল পাড়া জুড়োল
চাঁদ ঘুমোল রে
নড়নকাটি চড়নকাটি
এলিয়ে রল রে,
নড়নকাটি নড়বে না,
চড়নকাটি চড়বে না,
চোখের পাতা পড়বে না
থির থির থির ঘুম

পাখীর ঠোঁটে ফুটবে না
গানের কলি ফুটবে না
'আয় খোকা' গান ফুটবে না
ধীর ধীর ধীর ঘুম
মৌমাছিরা জুটবে না
ফুলের বনে জুটবে না
ফুলের মধু লুটবেনা
শির শির শির ঘুম
ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্ ঘুম্

ঘুমিয়ে ঘুমোয় রাতের আকাশ
ঘুমিয়ে ঘুমোয় চাঁদ
চাঁদ পেতেছে ঘুম ধরিবার
আল্গা বাঁধন ফাঁদ
কে পেতেছে ফাঁদ পেতেছে
কে পেতেছে রে
চাঁদ পেতেছে চাঁদ হেসেছে
ঘুমোয় বোকা চাঁদ

ছুটির ঘণ্টা

সিন্ধু পেণ্টাঙ্গুলার টুর্ণামেণ্ট—

এবারেও ফাইনালের খেলা হল সেই হিন্দু আর মুসলিম দলের ভিতরেই। সে দিক দিয়ে নূতনত্ব কিছু না থাকলেও খেলাটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুবই প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। টসে জিতে মুসলিম দল ব্যাট করতে নামলেন—কিন্তু রাণ করলেন মোটে ১৩০। তার ভিতর দাউদ খাঁ ৫৪, গোলাম মহম্মদ ৩৪—আর কারও কথা না বলাই ভাল। হিন্দু দলও যে খুব বেশী রাণ করলেন তা নয়—তাদের রাণ হল ২১৫ তরুণ সত্‌রাম দাস খেললেন চমৎকার! তাঁর রাণ হল ৯৫—এবং তাঁকে আউট করতে গিয়ে সকলেই হার মানলেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও মুসলীম দল ওধাজী ও গোপালদাসের হাতে বেশীক্ষণ টিকলেন না। মাত্র ১৭২ রাণ হল। হিন্দু দলের জয় তখন অনেকটা সুনিশ্চিত। ৬ উইকেটে ৭২ রাণ করে সহজেই তারা মুসলিম দলকে পরাস্ত করলেন।

রঞ্জি টুর্ণামেণ্ট—

রঞ্জি টুর্ণামেণ্টের কথা তোমরা জান নিশ্চয়ই। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ তাদের সেরা খেলোয়াড় নিয়ে এতে যোগ দেন। গত বছরের বিজয়ী নবনগর অমরসিং, কোলা, এস্, ব্যানার্জ্জি, মানকাদ প্রভৃতি নামজাদা টেষ্ট খেলোয়াড়দের নিয়ে গুজরাটকে হারিয়ে দিয়েছেন। এদের ভিতর মানকাদ যেমন প্রথম ইনিংসে রাণ করেছেন ৮০, তেমনি ২১ রাণে ৫ উইকেটও নিয়েছেন। ব্যাটিং এবং বোলিং—দুটোতেই এতখানি কৃতিত্ব আর কেউ দেখাতে পারেন নি।

ওদিকে বোম্বে এবার অনেকখানি আশা নিয়ে খেলার মাঠে নেমেছিলেন। জয় হল তাদের ক্যাপ্টেন এবং মার্চ্চেণ্ট, হিণ্ডেলকার, হাজেওয়ালা, কাদ্রি—কেউ ত কম যান না! বরোদার সঙ্গে খেলায় তারা মাত্র করলেন ৪৪১; তার ভিতর মার্চ্চেণ্ট একাই করলেন ১৪৩। বরোদার নিম্বলকর খুব ভাল খেললেন, ১১৯টী রাণ ও করলেন বটে কিন্তু তার দলকে হারের হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না। বরোদার মোট রাণ সংখ্যা হল মাত্র ৩২৬। তারপর বোম্বে খেলতে নামলেন সিন্ধুর বিরুদ্ধে। মার্চ্চেণ্টের হাতে আবার একটী সেঞ্চুরী হ'ল। বোম্বের রাণ হল ৩৬৬ এবং সিন্ধুর ইনিংস যে ভাবে সুরু হ'ল তাতে তাদের পরাজয় সম্বন্ধে কারও একটুকু সন্দেহ রইল না। হঠাৎ হাওয়া বদলে গেল, নওমলের হাতে ব্যাট ছুটল চাবুকের মত, রাণের সংখ্যা বেড়ে চলল। উইকেট তুলে নেবার যখন মাত্র ৫ মিনিট বাকী তখনও বোম্বের জয়ের আশা যায় নি কিন্তু তার তিন মিনিটের ভিতরই সিন্ধুর রাণের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল ৩৭০। বোম্বের মাথা হেঁট হল। নওমল ১৪৯ রাণ করে সিন্ধুকে জয়ী করলেন।

নিখিল বঙ্গ সন্তরণ প্রতিযোগিতা—

খুব সমারোহ করে সেদিন বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। হাটখোলার তরুণ সাঁতারু শ্রীমান শচীন্দ্র নাগ এই প্রতিযোগিতায় খুব বাহাদুরী দেখিয়েছেন। ১০০ মিটার 'ফ্রি ষ্টাইল' সাঁতারে তিনি প্রথম হন; এতে তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র ১ মিঃ ৪$\frac{২}{৫}$ সেঃ। ৪০০ মিটার সাঁতারেও কেউ তার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারেনি। এতেও তাঁর সময় লেগেছে মাত্র ৫ মিঃ ৩১·৬ সেকেণ্ড।

আর একটী বিখ্যাত প্রতিযোগিতা হচ্ছে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের টুর্ণামেন্ট। ২০০ মিটার বুক সাঁতারে পি মল্লিক মাত্র ৩ মিঃ ৬·৪ সেকেণ্ডে জয়ী হয়ে এক নূতন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন। মহিলারাও কিছু কম যান না। মাত্র ১ মিঃ ২৮·৮ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে শ্রীমতী লীলা চ্যাটার্জ্জিও আর একটী ভারতীয় রেকর্ড করলেন—অবশ্য মহিলাদের মধ্যে। এর আগে সাঁতারে অন্য কোন মহিলা এতখানি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। মনে হয় নিজের রেকর্ড ভাঙ্‌তে শ্রীমতী চ্যাটার্জ্জির বিশেষ দেরী হবে না।

রিঙ্ক ও ডিস্ক্‌ হকি প্রতিযোগিতা—

তোমরা অনেকে হয়ত 'রিঙ্ক' ও 'ডিস্ক' হকির নামও শোননি। বিদেশে—বিশেষ করে যে সব দেশ প্রায়ই বরফে ঢাকা থাকে সেখানে Skate পায়ে দিয়ে একরকম হকি খেলা হয়, তাকেই বলে 'রিঙ্ক' হকি খেলা। সেন্ট জেভিয়ার্স, রেঞ্জার্স, ইষ্ট পার্ক প্রভৃতি কয়েকটী টিম এই লীগে যোগ দিয়েছেন—কিন্তু কোন ভারতীয় টিমের সাক্ষাৎ এখনও পাওয়া যায় নি।

তারপর ডিস্ক হকি; কল্‌কাতাতেই প্রথম এই খেলা সুরু হল। এক এক দলে ছ'জন করে খেলোয়াড় থাকে; খেলার নিয়মকানুনও অনেকটা হকিরই মত। এ খেলা শুধু কল্‌কাতায় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই খেল্‌ছে।

টেনিস দল—

গত বছর শীতে তোমরা টিলডেন, কোসে, ব্যামিলো, বার্কের খেলা দেখেছ। এবারেও একটী এ্যামেরিকান দল খেল্‌তে আসছেন। এবারের বিশেষত্ব হচ্ছে এই, যে দলের সকলেরই বয়স খুব কম—ধর ২০।২১ বছর। তাই বলে খেলার কৃতিত্ব যে এদের কম আছে তা মনে কর না! রিগ্‌স্‌, এণ্ডারসন, রবার্টসন, ম্যাকনীল এদের সকলের কাছেই বিদেশের অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড়কে হার মান্‌তে হয়েছে। রিগ্‌সের স্থান নাকি এমেরিকায় বাজের পরেই, আর পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়দের ভিতর পঞ্চম। ডিসেম্বর মাসে এঁরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান্‌সিপে যোগ দেবেন। ভারতবর্ষের সব বাছাই খেলোয়াড়রাও তৈরী হচ্ছেন—আমাদের গাউস মহম্মদ, সোহানী, বব, রণবীর সকলেই।

শ্রেষ্ঠ এ্যাথ্‌লেটিক্‌স্‌—

অনেকদিন আগে শুনেছিলাম এক বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মানুষের দেহ পরীক্ষা করে তাদের দৌড় ঝাঁপের ক্ষমতার নাকি একটা সীমা নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন। সেই বৈজ্ঞানিকের মতে এই ক্ষমতা কতটুকু

তা ঠিক মনে পড়ছে না—তবে মতটাই বিশ্বাস করা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। যারা খবরের কাগজ পড়—তারা জান রোজ কত রেকর্ড ভাঙ্গার ব্যাপারে মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। এইত সেদিন কোপেনহেগেনে মিস্ রেগেন হিল্ড ৩ মিঃ ২৪ সেকেণ্ড ২২০ গজ ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে এক রেকর্ড করলেন। মিস্ ইভাভ্যান নেগিলান ২০০ মিটার বুক সাঁতারে আর একটী রেকর্ড করলেন। তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র ২ মিঃ ৪০·৬ সেকেণ্ড। ছেলেরা ত আছেই। ৩ মিঃ ২ সেকেণ্ডে ১০০০ মিটার দৌড়ে টিষ্টোমেভি এক রেকর্ড করেছেন। ফিনল্যাণ্ডের বিখ্যাত এ্যাথেলেটিক উডার্সন ১ মিঃ ৪৮·৮ সেকেণ্ডে ৮০০ মিটার দৌড়ে পৃথিবীর সব রেকর্ড ভেঙ্গেছেন। এ ত গেল দৌড়ের কথা। ফিনল্যাণ্ডের আর একটী বীর—নিজামেন ২৫৫ ফিট ৫½ ইঞ্চি বর্শা ছুড়ে এক রেকর্ড করেছেন। জে, ম্যাকলেন্যান বলে এক ভদ্রলোকও কম নন। একটী ১৬ পাউণ্ড হাতুড়ি ১২৯ ফিট ৬৫ ইঞ্চি দূরে তিনি অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলেছেন। এও এক রেকর্ড!

তারপর এরোপ্লেনে, মোটরে, মোটরবোটে, সি প্লেনে নিত্য নূতন রেকর্ড হচ্ছে। মানুষের যেন কিছুতেই আর আশ মেটে না। এই ত সেদিন স্যার ম্যালকম্ লুসানএর হলউইল হ্রদে তাঁর 'ব্লুবার্ডে' গড়ে ঘণ্টায় ১৩৯·১ মাইল অতিক্রম করেছেন! আজ আমরা অবাক হচ্ছি—কিন্তু কদিন বাদে যখন আবার আর একটী নূতন মানুষ নূতন রেকর্ড করবেন—আমরা ভাবব—ঘণ্টায় ১৩৯·১ মাইল—! সে আর এমন কি!

কুমারী লীলা চাটার্জ্জি ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সন্তরণে এক নূতন রেকর্ড করছেন

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

কি যা তা বলছ ?—হের ভোগেল ও অজয় ব্যস্ত হয়ে টেলিভিশন পর্দ্দার সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সেদিকে খানিকক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার পর আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না।

ডাঃ ক্রুল সত্যিই সেখানে নেই।

কিন্তু এ কি করে সম্ভব !—হের ভোগেলই প্রথম কথা বল্লেন,—আমি নিজে সে ঘর বন্ধ করে এসেছি।

যেমন করেই হোক সম্ভব যখন হয়েছে, তখন তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এখন কোন লাভ নেই। তার চেয়ে এয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা আগে দরকার।—বলে অজয় টেলিভিসন যন্ত্রের আর একটা বোতাম টিপে দিলে।

কিন্তু কলের আয়নায় এবার কোন ছবি ফুটে উঠল না।

সমর তিক্ত স্বরে বল্লে,—উন্মাদ হলে কি হয়, শয়তানী বুদ্ধিটা দেখেছেন ত। সেবারকার মত এয়ার প্ল্যান্টের কামরায় টেলিভিসনের ব্যবস্থাটি আগে বিগড়ে দিয়েছে।

এরপর আর কাউকে কিছু বলতে হ'ল না। তিনজনে শশব্যস্ত হয়ে হাউই-জাহাজের ভেতরকার সুড়ঙ্গ-পথের দিকে ছুটলেন। এখনো যদি সময়মত গিয়ে সর্ব্বনাশ ঠেকান যায়—তিনজনেরই এই এক চিন্তা।

সুড়ঙ্গ-পথের বৈদ্যুতিক যানে এয়ার প্ল্যাণ্টের দিকে যেতে যেতেই হাওয়ায় অক্সিজেনের অভাবটা ক্রমশঃ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অজয়ই বোধ হয় সকলের মনের কথাটা প্রথম প্রকাশ করে বল্লে—এত বিপদ কাটিয়ে পৃথিবীর এত কাছে এসে শেষে এমনি দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে! যা দেখে এলাম পৃথিবীকে তার কিছু জানাতেও পারব না!

সমর অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে বল্লে,—অপাত্রে দয়া করার এই ফল! হাউই-বোট উদ্ধার না করলে ত আর এ সর্ব্বনাশ হয় না। কি লাভ হল ওই সাক্ষাৎ শয়তানকে প্রাণে বাঁচিয়ে। সে এখন নিজেও মরবে আমাদেরও মারবে!

হের ভোগেল মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছিলেন। কোন উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে নীরবে তিনি সবার আগে নেমে গেলেন।

সুড়ঙ্গ পথ থেকে বেরিয়ে এয়ার প্ল্যাণ্টের কামরার দরজার কাছে এসে দাঁড়াবার পর ডাঃ ক্রুলের শয়তানী বুদ্ধিটা ভাল করে বোঝা গেল। এয়ার প্ল্যাণ্ট চলবার কোন আওয়াজ বাইরে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ডাঃ ক্রুল ভেতরে ঢুকে সেটি শুধু বন্ধ করে ক্ষান্ত হন নি, দরজার বৈদ্যুতিক কলও এমন ভাবে বিগড়ে দিয়েছেন যে বাইরে থেকে তা খোলবার কোন উপায় নেই।

খানিকক্ষণ নিস্ফল চেষ্টা করবার পর হতাশ ভাবে হের ভোগেল বল্লেন—না, আর কোন উপায় নেই দরজা খোলবার! ভেঙ্গে ফেলা যায় না এ দরজা!—অজয় উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

হের ভোগেল একটু ম্লান ভাবে হাসলেন—যায়—ডিনামাইট দিয়ে। সেই ভাবেই জাহাজের সব দরজা তৈরী।

কিছুই তাহলে করবার উপায় নেই?—সমর হতাশ ভাবে বল্লে,—আমরা হাওয়ার অভাবে মারা যাব, আর শেষ পর্য্যন্ত ওই শয়তানই এয়ার প্ল্যাণ্টের ঘরে নিজেকে বন্ধ করে বেঁচে যাবে! এর চেয়ে ডিনামাইট দিয়ে সমস্ত জাহাজ উড়িয়ে দেওয়াও ভাল!

হের ভোগেল খানিক চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বল্লেন,—না তাতে কোন লাভ নেই। তবে শেষ এক চেষ্টা আমরা করতে পারি!

অজয় ও সমর একসঙ্গে উদ্‌গ্রীবভাবে বলে উঠল—কি?

হের ভোগেল বল্লেন,—পৃথিবী থেকে খুব দূরে এখন আমরা নেই। হাউই জাহাজের হাওয়া একেবারে নিশ্বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠবার আগেই সেখানে পৌঁছোবার চেষ্টা আমাদের একমাত্র বাঁচবার উপায়। তাতে অবশ্য হাউই জাহাজকে একেবারে 'ফুল স্পীডে' চালাতে হবে।

তাতে পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। একে ত জাহাজের কণ্ট্রোল-ব্রেক খারাপ।—অজয়ের স্বরে উৎসাহের বিশেষ অভাব দেখা গেল।

তবু শেষ আশায় ভর করে আমাদের তাই করতে হবে। আর কোন উপায় আমাদের নেই—বলে হের ভোগেল আবার সুড়ঙ্গ-পথের দিকে এগুলেন।

'ফুল স্পীডে' জাহাজ চালাবার সঙ্কল্প নিয়ে হের ভোগেল কণ্ট্রোলরুমে এসে ঢোকবার পর সময় যে কি ভাবে কেটে যেতে লাগল সে বিষয়ে কারো আর কোন হুঁস রইল না।

হাউই জাহাজের গতি যেন শেষ সীমা পর্য্যন্ত হের ভোগেল বাড়িয়ে দিয়েছেন। হাউই বারুদে ভরা বিশাল নলগুলি নিজেদের প্রচণ্ড বিস্ফোরক মশলার তেজে আগুন আর ধোঁয়া উদ্গার করতে করতে বুঝি ফেটেই যায়। সমস্ত জাহাজ থর থর করে' কাঁপছে, গতিমান যন্ত্রের কাঁটা সরে সরে একেবারে চূড়ায় গিয়ে ঠেকেছে। পৃথিবীর চেহারা ছোট একটা অস্পষ্ট বল থেকে ক্রমশঃ চাঁদের মত বড় হয়ে উঠল—তারপর আরো বড়। কিন্তু এখনো যে অনেক দূর। এদিকে নিশ্বাস যেন আর টানা যায় না। সমর এ যন্ত্রণার স্বাদ একবার পেয়েছে। সেবার অমন আশ্চর্য্য ভাবে মুক্তি পাবার পর আবার কি সেই যন্ত্রণা পেয়েই তাকে মরতে হবে?

পৃথিবী নয় যেন স্বর্গের চেহারাই দেখা যাচ্ছে এমনি আগ্রহ নিয়ে তারা জাহাজের দূরবীণে চেয়ে আছে। মৃত্যুর সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় তারা কি সেখানে আগে পৌছোতে পারবে না! না তার আগেই নিশ্বাস নেবার হাওয়া যাবে ফুরিয়ে!

পৃথিবী অবশ্য তাদের চোখের ওপরই ক্রমশঃ বড় ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওই ত তার মেঘের আবরণ, এমন কি মেঘের আবরণের ফাঁকে তার আসল রূপ পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে, আর কতক্ষণ!

হঠাৎ অজয় ব্যাকুল হয়ে চীৎকার করে উঠল—একি, জাহাজ যে ভুল পথে চলছে। পৃথিবী যে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে আবার।

হের ভোগেল তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। তারপর ব্যাপারটা বুঝে সমরের সাহায্যে ধরাধরি করে অজয়কে সেখানে শুইয়ে দিলেন।

হাওয়ার অভাবে অন্যান্য উপসর্গের সঙ্গে অজয়ের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে।

তাঁরা নিজেরাই শেষ পর্য্যন্ত খাড়া থাকতে পারবেন কি? তাহলেই বোধহয় উদ্ধার পাওয়া যায়!

হের ভোগেল একটু একটু করে জাহাজের গতিবেগ কমাতে স্থরু করেছেন ইতিমধ্যেই। পৃথিবীর ওপর আছড়ে গিয়ে যাতে না পড়তে হয়।

আর বেশীদূর নয়, পৃথিবীর মানচিত্র পর্য্যন্ত এবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যেন বিশাল একটা নকল গ্লোবের অংশ বলে মনে হচ্ছে! জল স্থলের ছবি যেন রঙ দিয়ে আঁকা—

এ ত প্রশান্ত মহাসাগরের দিকেই তাদের হাউই জাহাজ গিয়ে পড়ছে। মেঘের অস্পষ্ট আবরণের তলায় এসিয়ার বিশাল উপকূল রেখা দেখা যাচ্ছে; নীল সাগরের মাঝে অসংখ্য দ্বীপের জটলা।

কিন্তু হাউই জাহাজ কি নিরাপদে গিয়ে নামতে পারবে? তার বেগ ত এখনই আরো অনেক কমে যাওয়া উচিত। বেগ কমছে নাই বা কেন! কি করছেন হের ভোগেল?

চোখ তুলে চেয়েই—সমর স্তম্ভিত হয়ে গেল। হের ভোগেল কন্টোল-বোর্ডের পাশেই মাথা ঘুরে পড়েছেন। হাউই জাহাজ সামলাবার কেউ নেই। সমরের মাথার ভেতর তখন ঝিম ঝিম করছে, তারও চোখ আসছে ঝাপসা হয়ে। বুকের কষ্ট অসহ্য। তবু একবার এ যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বলেই সে প্রাণপণে নিজেকে সামলে কন্ট্রোল বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। ব্রেকের লিভারটা তাকে টেনে নামিয়ে দিতে হবে যেমন করে হোক।

কিন্তু হাতে যেন তার কোন শক্তি নেই। কলের আয়নায় নীচের ছবি ক্রমশঃ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রই যেন ছুটে আসছে উন্মত্তভাবে তার দিকে। তবু সে 'লিভার'টা টেনে নামিয়ে রাখতে পারছে না। আর বুঝি পারা যাবে না।

শেষ পর্য্যন্ত শেষ শক্তি প্রয়োগ করে সে লিভারটা এবার নামিয়ে আনল। তার ফল কি হল না হল তা' কিন্তু সে জানতে পারলে না। সে তখন জ্ঞান হারিয়েছে।

* * * *

জ্ঞান হ'তে সমর প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলে না। সে কোথায় আছে!

তার মুখের ওপরে হের ভোগেল ও অজয় উদ্বিগ্নভাবে ঝুঁকে আছে। তাদের মাথার ওপরে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। কাণে জলের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে সে মাথা তুললে। একি! কোথায় গেল হাউই জাহাজ! চারিধারে অকূল সমুদ্রের জল থই থই করছে। ছোট একটা ভেলার ওপর তারা তিন জনে ভাসছে।

হের ভোগেল ও অজয়ের মুখে তখন হাসি ফুটে উঠেছে তাকে চোখ খুলে তাকিয়ে মাথা তুলতে দেখে।

কি ভয়টাই পেয়েছিলাম!—অজয় বললে—তোমার আর জ্ঞান হবে এ আশাই ছিল না।

কিন্তু ব্যাপার কি? আমরা এ ভেলায় কি করে এলাম? হাউই জাহাজের কি হ'ল?—সমর ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

হের ভোগেল বল্লেন—দাঁড়ান সবই শুনবেন. এখন আপনি আর একটু সুস্থ হ'ন।

সব না জানলেও যে সুস্থ হ'তে পারছি না!

অজয় একটু হেসে বল্লে,—জানবার বিশেষ কিছু নেই। আমাদের হাউই-জাহাজ একেবারে সমুদ্রের ওপর এসে পড়ে। শেষ মুহূর্ত্তে তুমিই নিশ্চয় ব্রেক টেনে দিয়েছিলে। তা না হলে আমাদের বোধ হয় চিহ্ন থাকত না এতক্ষণ। কিন্তু ব্রেক টানা সত্ত্বেও হাউই জাহাজ রক্ষা পায় নি। তার বেগ তখনও এত বেশী যে জলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সামনের দিকটা ভেঙ্গে চুর হয়ে যায়। সেই অবস্থায় প্রথমে নিজের বেগে অনেক দূর পর্য্যন্ত হাউই জাহাজ সমুদ্রে তলিয়ে যায়। তারপর আবার ভেসে ওঠা সত্ত্বেও ভাঙ্গা জায়গা দিয়ে জল ঢোকার দরুণ ক্রমশঃ ফের ডুবতে থাকে। সেই সময় হের ভোগেলের প্রথম জ্ঞান হয়।

অজয় একটু থামতে সমর জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু জাহাজে ত হাওয়া ছিল না। পৃথিবীতে পৌঁছোবার পর জাহাজের কোন জানলা খোলবার মত অবস্থাও কারুর ছিল না। জ্ঞান হ'ল কি করে?

হের ভোগেলই এবার উত্তর দিয়ে বল্লেন—জাহাজ ভেঙ্গে যাওয়া আমাদের সে হিসেবে শাপে বর হয়েছে। নীচের দিকটা ভেঙ্গে যেমন জল উঠেছে, ওপরের দিকেও তেমনি নানা জায়গায় জোড় খুলে গিয়ে হাওয়া ঢোকবার পথ হয়েছে। সেই জন্যেই আমরা আপাততঃ রক্ষা পেয়েছি। জ্ঞান হবার পর প্রথমেই অবস্থাটা আমি বুঝতে পারিনি। আপনারা তখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। কোন রকমে

অজয়কে যদি বা সজ্ঞান করা গেল, আপনার অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। সেই সময় সমস্ত ব্যাপারটাও বোঝা যায়। জাহাজ তখন বেশ তাড়াতাড়ি ডুবছে। দুজনে মিলে, হাতের কাছে যা সুবিধেমত জিনিষ পাওয়া যায়, তাই দিয়ে এই ভেলা তৈরী করে আপনাকে তার ওপর তুলে কোনরকমে তারপর ভেসে পড়ি। জাহাজ খানিক বাদেই ডুবে যায়।

সমর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থেকে শুধু জিজ্ঞেস করলে—ডাঃ ক্রল!

হের ভোগেল ধীরে ধীরে বল্লেন—জাহাজের সামনের দিকটাই জখম হয়েছিল। তিনি সেই দিকেই ছিলেন। তাঁকে রক্ষা করবার উপায় ছিলনা।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন—তাঁর কীর্ত্তির সঙ্গেই তাঁর সমাধি হয়ে গেল।

অকূল সমুদ্রের মাঝে ছোট একটি ভেলায় তারপর কি দুঃখে তাদের দুদিন দুরাত কাটে তার বর্ণনা আর করার প্রয়োজন নেই। আহার ও জলের অভাবে যখন তারা মৃতপ্রায় তখন ভাগ্যক্রমে একটি সদাগরী মাল-বওয়া জাহাজ তাদের দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। আর একটা দিন দেরী হলে তাদের কোন পাত্তা বোধ হয় পাওয়া যেত না।

উদ্ধার পেয়ে প্রাণে বাঁচলেও তাদের সমস্ত কীর্ত্তি এক হিসাবে মানুষের অগোচরই রয়ে গেল। তারা নিজেরা সে কথা জানাবার চেষ্টা করেনি তা নয়—কিন্তু বাধ্য হয়েই শেষ পর্য্যন্ত তাদের নীরব হতে হয়েছে। হাউই জাহাজের সঙ্গে যাদের অভিযানের সমস্ত প্রমাণ সমুদ্রে পড়ে তলিয়ে গেছে তাদের কথা কে বিশ্বাস করবে।

উদ্ধার পাবার পর জাহাজেই প্রথম অবিশ্বাস ও উপহাসের আঘাত তাঁদের পেতে হয়। ভেলা থেকে জাহাজের ওপর আশ্রয় পাবার পর আহার ও বিশ্রাম করে একটু সুস্থ হয়ে নিলে জাহাজের কাপ্তেন ও অন্যান্য কর্ম্মচারী তাদের খোঁজ নিতে আসেন এবং প্রথমেই কেমন করে তারা ওরকম বিপদে পড়েছিল তা জিজ্ঞাসা করেন।

হের ভোগেল সামান্য একটু বিবরণ সুরু করতেই তাঁরা সবাই হেসে ওঠেন।

কি বল্লেন?—বুধগ্রহ থেকে আপনারা আসছেন?—কাপ্তেনের হাসি আর থামতে চায় না।—ওই ভেলায় করে নাকি?

হের ভোগেলকে তখনকার মত চুপ হয়ে যেতে হয়। তারপরেও আরও অনেককে বোঝাবার চেষ্টার ফলও একরকমই দাঁড়ায়। সমুদ্রে কদিন অসহায়ভাবে মৃত্যুভয়ে কাটিয়ে তাঁদের মাথা খারাপ হয়েছে এই দেখা যায় সকলের ধারণা।

দেশে ফিরে হের ভোগেল আরো কয়েকবার চেষ্টা করেন নিজেদের অভিযানের কাহিনী সাধারণকে বিশ্বাস করাতে। কিন্তু সব জায়গাতে উপহাস অবিশ্বাস ও অবজ্ঞার আঘাত পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হয়ে তিনি হাল ছেড়ে দেন। অজয় ও সমরকে ও এবিষয়ে মৌনব্রতই নিতে হয়েছে উপহাসাস্পদ হবার ভয়ে।

মানুষের প্রথম নক্ষত্র লোকে অভিযানের কীর্ত্তি এমনি করে বাজে গল্পকথাই হয়ে রইল।

শেষ

একপাতার গল্প

তিন-বাঁকা

শ্রীসুকুমার দে সরকার

এখান থেকে নাকের সোজা তিনটে বাঁক নিলেই দেখতে পাবে তিন-বাঁকা কুঠি। তিন-বাঁকা-কুঠিতে থাকে তিন বাঁকাদের সর্দার তিনবাঁকা বুড়ো।

এমন একদিন ছিল যখন ওই কুঠিতে তিনবাঁকা বুড়ো ছাড়া আর কেউ থাকত না। ওই বুড়োই তখন পৃথিবীর আদিম বুড়ো কিনা—তিনকাল জেনে জেনে তিন বাঁকে বেঁকে গিয়েছিল। একদিন তেপায়া টুলে বসে, তিন বছরের ভাজা মুড়ি চিবুচ্ছে তিনবাঁকা বুড়ো, হঠাৎ পায়ের কাছে শব্দ—খুট! বুড়ো আঁৎকে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে ঠ্যাঙ তুলে দপাস।

ব্যাপার কি? না একটা তিনবাঁকা ইঁদুর!

তারপর থেকে সেই তিনবাঁকা কুঠিতে, যখন তখন শব্দ খুট খাট্…খুট খাট্…বুড়ো অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল।

শেষে আর না পেরে তিনকালের তিনবাঁকা লাঠিটা নিয়ে তিনবাঁকা পথে বেরিয়ে পড়ল তিনবাঁকা বুড়ো। এর একটা বিহিত করতেই হবে। কত মাঠ, ঘাট, বাট পার হয়ে বুড়ো পৌঁছাল এক সহরে। সহরের দোরে দোরে সে ডেকে জিজ্ঞেস করতে লাগল—"হ্যাঁগো তোমাদের বাড়ী বেড়াল আছে?" কেউ দেখাল হুলো বেড়াল, কেউ দেখাল পুসী, কেউ বা মোটা, কেউ বা রোগা। বুড়ো কেবল মাথা নেড়ে বলে—"উঁহু হোলনা হোলনা"। শেষে এক বাড়ীতে বলল—"হ্যাঁ আছে বটে একটা তবে সেটা বুড়ো হয়েছে।"

বুড়ো লাফিয়ে উঠল—"বেঁকে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ তিনবাঁকে বেঁকেছে। কোমর বাঁকা, এক চোখ আর এক ঠ্যাঙ নেই।"

বুড়ো বলল—"ব্যস হয়ে গেছে!"

সেই তিনবাঁকা বেড়াল নিয়ে বুড়ো ফিরল তিনবাঁকা কুঠিতে। তিনবাঁকা বেড়াল দেখে, তিন বাঁকা ইঁদুর থমকে দাঁড়াল। কে প্রথমে পালাবে ঠিক হয় না। শেষে ইঁদুর বলল—"থাক দাদা আর মারামারিতে কাজ নেই। এই ঢুকছি আমি গর্তে। তুমিও থাক আমিও থাকি।"

ব্যস সেই থেকে আজও তিনবাঁকারা আছে, নাকের সোজা তিনটে বাঁক নিয়ে তিনবাঁকা কুঠিতে! আশা আছে একদিন আমিও গিয়ে উঠব সেখানে।

রংমশালের পাঠক-পাঠিকা ভাই বোন,

বইএর সঙ্গে বইএর মলাট তোমাদের ভালো লাগে কি! আমার ত লাগে। মনে হয়, তেমন ভালো হলে বই পড়বার আগে মলাট দেখেই মুগ্ধ হয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে দেওয়া যায়। মলাট আমার কাছে যাকে বলে বইএর বাজে খোসা নয়, বইএরই অত্যন্ত দামী একটা অংশ।

শুধু বই কেন, অনেক কিছুরই মলাট অত্যন্ত দামী—এমন কি মলাটটাই প্রধান বলা যেতে পারে। অতি গভীর যে মানের লাগাল মন সহজে পায় না, মলাটেই থাকে তার পরিচয়; যেমন ধর এই পৃথিবীর কথা। পৃথিবী বা সৃষ্টির মধ্যে কত রহস্য, কত তত্ত্ব, কত গভীর সমস্যাই ত জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতরা খুঁজে পান। সে সব বুঝি আর না বুঝি আমরা তার মলাট দেখেই খুশী—বিচিত্র রঙে রঙীন, নদী পাহাড় অরণ্য সাগর দিয়ে তৈরী মলাট। সে মলাট নিত্য আমাদের চোখের ওপর বদলে যাচ্ছে—নিত্য তাতে নতুন রঙ ফলাচ্ছেন পৃথিবীর প্রচ্ছদপট আঁকবার পটুয়া।

পৃথিবীর মলাট ইতিমধ্যে আবারই বদলেছে। দিগন্ত-ছোঁয়া ধানের সবুজ ক্ষেতে একটু করে হলদে ছোপ লাগিয়ে সকাল সন্ধ্যে তার ওপর একটু কুয়াশার পোঁচ বুলিয়ে প্রকৃতির পটুয়া তাঁর নতুন ছবি সুরু করেছেন।

আমাদের রংমশালের মলাটও সেই সঙ্গে বদলেছে লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়। কেমন লাগল তোমাদের নতুন মলাট? আশা করি ভালোই লেগেছে, এবং মলাট বদলানতে তোমরা খুশীই হয়েছ। বদলে যাওয়াই পৃথিবীর নিয়ম, আর সাধারণতঃ তাতে আমরা খুশীই হই।

তবু এমন বদলে যাওয়া আছে যাতে মন আমাদের আনন্দের সঙ্গে সায় বুঝি দেয় না। যেমন এই ছেলেবেলা। তোমরা এখন বড় হতেই চাও, কিন্তু বড় যারা হয়েছে ছেলেবেলাটা বদলে যায় বলেই বুঝি তাদের আফশোষ।

আসলে, বড় ত নয়, ক্রমশঃ ছোট হই বলেই হয়ত আমাদের ছেলেবেলা যায় হারিয়ে। বয়স বাড়ার একটা শাস্তিই বুঝি এই—মানুষ মাথায় বাড়ে কিন্তু ছোট হয়ে যায় অনেক দিক দিয়ে,—অনেক কিছু তার ছোট হয়ে যায়। তার কল্পনা আর তেপান্তরের মাঠের নাগাল পায় না, নিজের উঠানের সীমানাটুকু পার হতেই সে নারাজ,—কাজের চাপে মনের ছুটি তার এত অল্প যে বইএর ভেতরটা ছেড়ে মলাট নিয়ে মুগ্ধ হবার আর তার সময় থাকে না।

বড় হয়ে ছোট না হওয়ার মন্ত্র যদি সবাই জানত্!

—তোমাদের সম্পাদক মশাই

দ্রষ্টব্য

গত মাসে "শীতের ভোরে" প্রবন্ধটি লিখেছেন শ্রীদাক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এবং শীতের ভোরে ছবিখানা এঁকেছেন শ্রীগোপেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞপ্তি

রংমশালের ষাণ্মাসিক চাঁদা দেড় টাকা ধার্য্য হল। রংমশাল পত্রিকার জন্য যে পরিমাণ ব্যয় হয় সে অনুপাতে ষাণ্মাসিক চাঁদা দেড় টাকা মোটেই বেশী নয়। বার্ষিক চাঁদা কিন্তু পূর্ব্বের মত দুই টাকা দশ আনা থাকল।

রংমশাল দলের আসর ৪ঠা অগ্রাণ হবার কথা ছিল। কিন্তু সামনে ইস্কুলের পরীক্ষা থাকার দরুণ দলের অনেক সভ্যই তারিখ সম্বন্ধে আপত্তি জানান। ফলে তখনকার মত আসর স্থগিত রাখা হয়। আমরা আসরের দিন ৯ই পৌষ ধার্য্য করলাম। পৌষের পাঁচ তারিখ রংমশাল কার্য্যালয় ১৫৪ রসারোড ভবানীপুরে দলের সভ্যদের প্রবেশপত্র দেওয়া হবে। প্রবেশপত্রে স্থান কাল ইত্যাদি দেওয়া থাকবে।

রংমশাল দলের সভ্য হতে গেলে দলের ব্যাজ কিনতে হয়। ব্যাজের মূল্য এক টাকা। ডাকখরচ আলাদা।

ডালি : সম্পাদক সমর সরকার

একখানা আশ্চর্য বার্ষিকী আমাদের হাতে এসেছে। পত্রিকাখানা আগাগোড়া হাতে লেখা। সম্পাদক স্বয়ং ছবির মত করে পত্রিকাখানাকে অক্ষরের অপরূপ অলঙ্কার পরিয়েছেন। শিল্পী রবীন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার গায়ে কী মনোহর চিত্রবিচিত্রই না করেছেন!

এত চমৎকার পত্রিকা—এত সুন্দর লেখা (বিখ্যাত অনেক সাহিত্যরথীর লেখা এতে আছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কলম ধরেছেন)—এত সুন্দর ছবি!

"ছেপে ফেললেই তো বেশ হত"—বলতে যাচ্ছিলাম সম্পাদককে। ভেবেছিলাম সম্পাদক নিশ্চয়ই টাকা পয়সার কথা পাড়বেন। তাঁর জবাবটা হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। মুগ্ধ হলাম।

সম্পাদক বললেন, "দেখুন বড় লেখকদের লেখার সঙ্গে নতুনদের লেখা আমরা মিশিয়ে দিয়েছি। এই নতুনদের লিখতে উৎসাহ দেওয়া ভালো, তার জন্যেই হাতে লিখে পত্রিকা প্রকাশ। কিন্তু এঁদের লেখা ছেপে বার করা সম্ভবতঃ উচিত হত না।"

"হয়তো এই নতুনদের দু-একজন বেশ ভালোই লেখেন।"

"তা হলে শিগ্‌গিরই তাঁরা ছাপানো পত্রিকায় জাতে উঠবেন।"

সম্পাদকের কথা কয়টি আমার মনে ধরল। হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করে' এরকম লেখক ধরার ফাঁদ নানাস্থানেই পাতা চলে (যদি সমরবাবুর মতন গোটা পত্রিকা হাতে লিখে ফেলার মত সহিষ্ণু সম্পাদকের অভাব না হয়)। অনেকেই, যাদের লেখায় দখল নেই, ভিড় করে' আসবেন হাতে লেখা পত্রিকার জাত মারতে। কিন্তু দুটি-একটি হঠাৎ দেখা মিলবে সত্যিকারের লিখিয়ে লোক যাঁরা।

রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রভৃতিদের লেখা পড়লাম। বেশ লেখা, তবে এ রকম ভালো লেখা পড়ে অভ্যেস আছে। কিন্তু যখনই ভাবতে গেলাম এই সব লেখা এত সুন্দর হাতের লেখায় কখনো ছাপা হয়েছে কি না, তখনই বিস্ময় মানতে হল!

মিঃ জি পরবের প্রেমের অলক, অজয় লাহিড়ীর জাভা নৃত্য, নবীন ভট্টাচার্যের দিনের কাজে ও মাখমলাল দত্তগুপ্তের বৃষ্টির পরে ছবি সুন্দর হয়েছে।

মোটকথা এই পত্রিকাখানা দেখে স্পষ্টই ধারণা হল সাহিত্য ও শিল্পে সত্যিকারের সাধনা যাঁরা করছেন, প্রায়ই প্রেসে বা বাজারের বুকৃতলে তাঁদের দেখা মেলে না।

পূজোর ছুটি প্রতিযোগিতার ফলাফল

পূজোর ছুটি প্রতিযোগিতায় সত্যিকারের ভালো লেখা আমাদের হাতে আসে নি। কুমারী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়ের 'পূজোর একরাতের বন্ধু' লেখাটি নেহাৎ মন্দ হয় নি। কুমারী অরুন্ধতীকেই এবার পুরস্কার দেওয়া হল। রংমশাল পত্রিকায় লেখাটি ছাপা হবে!

আশ্বিনের শব্দচৌকির ফলাফল

১ কু	২ ঠা	৩ র	●	●	●	৪ বি	বা	৫ দ
৬ সু	কু	মা	৭ র	●	৮ বী	চি	●	স্থি
৯ মা	মা	●	সু	●	১০ ত	ত্র	প	●
য়ূ	●	১১ ম	ল	ম	●	বী	●	১২ ম
১৩ ধ	১৪ ব	●	●	●	১৫ শৌ	র্য	●	তি
●	১৬ লা	১৭ জ্ঞ	●	১৮ অ	রি	●	১৯ অ	চ্ছ
২০ ল	হ	না	●	বি	●	২১ বি	প	ন্ন
২২ ব	ক	●	২৩ ম	ন	●	২৪ লা	মা	●
ন	●	২৫ আ	ল	য়	●	২৬ স	ন	ব্য

স্থানাভাবে উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হল না।

নূতন প্রতিযোগিতা

রংমশালের পাতায় 'এক পাতার' গল্পের পত্তন হয়েছে, তোমরা দেখবে এক পাতার গল্প হয়তো এক নিঃশ্বাসেই পড়ে ফেলা চলে। কিন্তু পড়া যত সহজ, লেখা তত সহজ নয়। এক পাতার গল্প লিখতে গিয়ে অনেক পাকা লেখকও হটে আসেন। আমরা এবার তোমাদের একপাতার গল্প লিখতে নিমন্ত্রণ করছি। একপাতা মানে রংমশালের ছাপানো একপাতা—পিঁপড়ের মত কুটিকুটি অক্ষরে ভরাট একপাতা নয়! হাসির গল্প, রূপকথা, যা খুশি এক পাতায় লিখে দিতে হবে। বড় গল্প তাড়াহুড়ো করে' একপাতার মত করে বললেও চলবে না, গল্পটি ঠিক যেন এক পাতার যোগ্যই হয়—যে পাতায় সুরু সেই পাতায়ই শেষ। যার গল্প বিচারে প্রথম হবে, তাকে দশটাকার একটা পুরস্কার দেওয়া যাবে।

কার্ত্তিক মাসের লুকোন-নাম ধাঁধার ফলাফল

(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(২) সরোজিনী নাইডু
(৩) জহরলাল নেহেরু
(৪) অরবিন্দ ঘোষ
(৫) আবদুল গফর খান
(৬) শিপ্রা সরকার
(৭) শিবপ্রসাদ সেন

ভুলক্রমে ১টি 'প্রা'—'প্র' হয়ে ছাপা হয়েছিল

স্থানাভাবে উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হল না

ছদ্মবেশ ধরা

পরের পৃষ্ঠায় ছবিতে কুড়িটি লোকের চেহারা দেখা যাচ্চে। আসলে কিন্তু দশটা লোক প্রত্যেকে একটা করে ছদ্মবেশ ধরে আছেন। কে আসল কে নকল তা হয়ত ধরা শক্ত হবে। প্রত্যেক লোকের ছদ্মবেশ তোমাদের ধরতে হবে। পুরুষ মেয়ে সেজে আছে, হিন্দু সেজেছে মুসলমান, সাহেব ফকির সেজে আছে—এমনি নানা বেশে ও মূর্ত্তিতে আসল লোকেরা নকল হয়ে লুকিয়ে আছে। যেমন—একজনকে আমরা ধরিয়ে দিচ্ছি—A নম্বরের টাকপড়া লোকটি আর ১১নম্বরের চশমাপরা মেয়েটি একই লোক। তোমরা এই রকম দুটো নম্বর মিলিয়ে এই ধাঁধার উত্তর দেবে—যেমন A = 11.

উত্তর পাঠাবার শেষ দিন—২৮শে অগ্রহায়ণ।

E
12
7
8
H
15
10
11
K
L
C
N
O
A
3
2
M
D
6
N=15
E=10
A=11
L=12
C=8
N=7
16=O
K=3
M=2
D=6
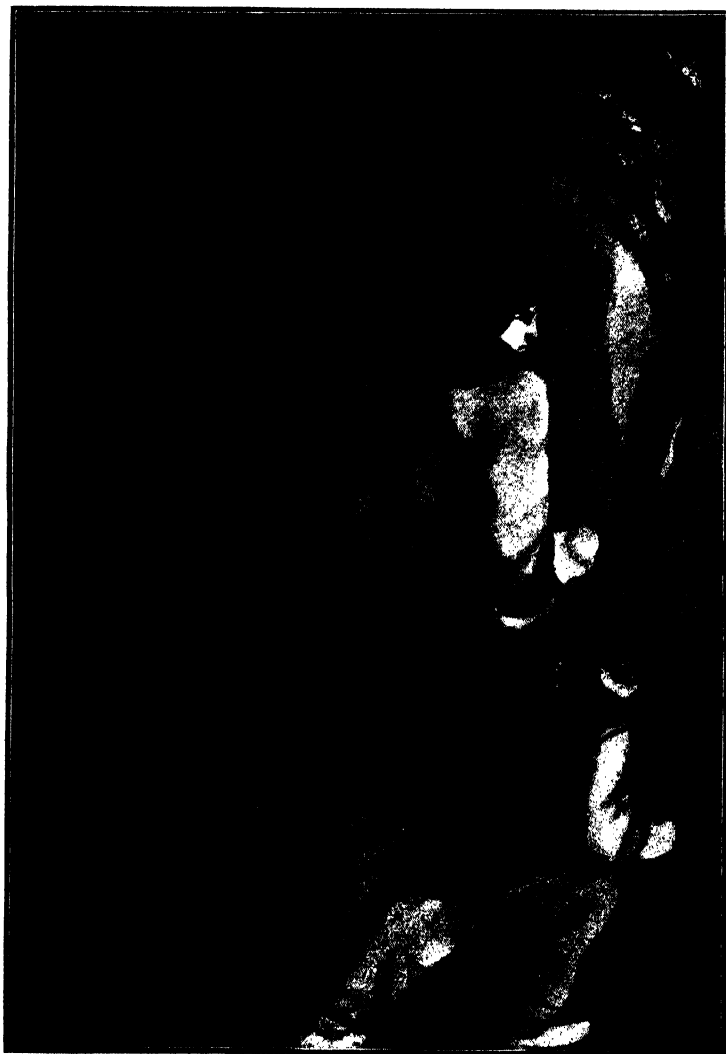
দিদি

[শিল্পী—শ্রীগোপেশ চক্রবর্ত্তী

সহজ ব্যাখ্যা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মাঠ, বন, পাহাড়ের পাখা নাই,
দিন রাত বাঁধা থাকে এক ঠাঁই ;
ছল্‌ছল্‌ চোখে শুধু চায় !
মেঘ আর পাখী উড়ে যায়,
দেখে আর ভাবে,
তারা কবে ওই মত যাবে !

তাদের দুঃখ বুঝি জানিয়ে,
রেল-গাড়ী নিলে তারা বানিয়ে !
গাড়ির জানলা দিয়ে চেয়ে,
তাই দেখি চলে তারা ধেয়ে
তুফানে সওয়ার,
মাঠ, বন, গ্রাম ও পাহাড় !

প্যারাডাইস লষ্ট

[Paradise Lost]

শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

"প্যারাডাইস লষ্ট" ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। শুধু ইংরেজী ভাষার নয়, জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। জগতের কত লোক কত কবি, এই মহাকাব্য থেকে আনন্দ পেয়েছে, শক্তি পেয়েছে, প্রেরণা পেয়েছে। মাইকেল মধুস্দন দত্ত এই মহাকাব্য থেকে প্রেরণা পেয়ে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা ভাষায় মেঘনাদ বধ কাব্য লিখেছিলেন।

এই মহাকাব্য যিনি লিখেছিলেন, তাঁর নাম জন মিল্‌টন। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। তিনি জন্মেছিলেন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে এবং দেহত্যাগ করেন ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে।

তখন ইংলণ্ডে ভীষণ দলাদলি। একদলের নাম ছিল "পিউরিট্যান"—তার বিরুদ্ধ দল ছিল "রয়ালিষ্ট"। এই "পিউরিটান্‌" দলের লোকেরা স্বাধীনচেতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে রাজার দলের ব্যবহারে এবং আদর্শে অনেক গলদ আছে। যে-গলদ দূর না করলে ইংলণ্ডের নাম কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। তাই তাঁরা রয়ালিষ্ট দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

মিল্‌টন ছিলেন এই "পিউরিট্যান্‌" দলের কবি। আর অলিভার ক্রমওয়েল ছিলেন দলের নেতা। বিদ্রোহে ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্‌কে ফাঁসী দিলেন এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য চালাতে লাগলেন। এই সময় মিল্‌টন তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে নতুন আদর্শের প্রচার করতে লাগলেন। এই সময় তাঁকে এত চোখের কাজ করতে হতো যে, ক্রমশঃ তাঁর দৃষ্টি শক্তি ঝাপসা হয়ে আসতে লাগলো। শেষকালে তিনি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু দেশ-সেবার যে পুণ্য দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন, অন্ধ হয়েও তিনি অন্য লোকের সাহায্যে সে কাজ চালাতে লাগলেন।

প্রথম যৌবনে তাঁকে ডাকে কাব্য কিন্তু যখন দেশের ডাক এলো, তখন তিনি সরিয়ে রাখলেন কাব্যকে; তারপর গেল দৃষ্টি-শক্তি। অবশেষে তাঁর এলো চরম সর্ব্বনাশ।

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চার্লস্‌ পিউরিট্যান্‌দের তাড়িয়ে আবার ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসলেন। মিল্‌টন রাজ-কাজ থেকে বিতাড়িত হলেন। তাঁকে হত্যা করবার জন্যে চারদিকে রয়ালিষ্টরা ঘুরতে লাগলো। বৃদ্ধ বয়সে, অন্ধ অবস্থায় সহায় সম্বলহীন ভাবে মিলটন আত্মগোপন করে রইলেন।

বাইরের সব আলো যখন একে একে নিভে গেল, তখন ভিতরের আলো জ্বলে উঠলো সহস্র শিখায়। যৌবনে যে কবিকে তিনি ফেলে রেখে এসেছিলেন, সে আবার ফিরে এলো তাঁর মনে। বাইরের দৃষ্টিতে কতটুকু দেখা যায়? তিনি মনের চোখ দিয়ে স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল প্রত্যক্ষ দেখতে লাগলেন। তাঁর মন বলে উঠলো তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল নিয়ে, জগতের প্রথম যে মানব আর যে প্রথম মানবী, তারা কেমন করে,

তাদের আদি-জন্মভূমি স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলো, তাদের কাহিনী গাইবেন। তিনি বলে যেতেন, আর তাঁর মেয়েরা লিখতেন—এইভাবে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য "প্যারাডাইস লষ্ট" লেখা হয়।

সেদিন এই মহাকাব্যের কোন প্রকাশক জোটেনি। অতি কষ্টে একজন জুটলো, সে মাত্র পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে এই বইখানি কিনে নেয়। সর্ত্ত হয়, বই-এর সংস্করণ হলে আরো পাঁচ পাউণ্ড দেওয়া হবে।

আজ মিল্‌টনের হাতের এক টুক্‌রো লেখার দামই পাঁচশো পাউণ্ড!

বন্দনাতে এই মহাকাব্যের আরম্ভ

"প্রথম মানুষের সেই প্রথম অনাচার,······
যার ফলে পৃথিবীতে এলো মৃত্যু······
আর এলো মানুষের যত দুঃখদৈন্য······
···আজও কেউ গায় নি তার গান······
হে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কাব্যের
আমি গাইবো সে-ই গান,
তুমি থেকো সহায়······
আর তুমি, হে অনাদি শক্তি,
তুমি একমাত্র জান,
সকল মন্দিরের শ্রেষ্ঠ মন্দির হলো মন,
যে-মন সুন্দর, পবিত্র, চির-উন্নত,······
তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো······
আমার মধ্যে যা কিছু আঁধার, যা কিছু কালো,
তোমার আলোতে তাকে করো আলোময়······
আমার মধ্যে যা কিছু তুচ্ছ,
তুমি তাকে করো মহীয়ান্‌············

স্বর্গে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দরুণ তিনি, স্যাটান্‌ এবং তার অনুচর অন্য সব দেবদূতদের স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর অভিশাপে জ্বলন্ত আগুণের নরকে তারা গিয়ে পড়লো। ন'দিন ন'রাত সেই আগুনের নদীর মধ্যে যম-যন্ত্রণা ভোগ করে স্যাটান্‌ দশ দিনের দিন আবার উঠে দাঁড়ালো। পাশ ফিরে দেখে, তার পাশে তারই মত অবস্থায় রয়েছে বিল্‌জিবাব্‌, তার সব চেয়ে প্রিয় অনুচর। তার সঙ্গে পরামর্শ করে, সে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠে, আগুণের মত গরম সব পাথরের ওপর পা

দিয়ে দিয়ে, সে একটা মাঠে এসে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো। মাঠ বটে তবে মাটী নেই.... আগুণ জমে আছে......তারি মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সাগরের তীরে এসে পৌঁছল—পারাপারহীন জ্বলন্ত আগুণের সাগর...তারি তীরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মাথা তুলে সে তার সঙ্গীদের ডাকলো......

"উঠ, জাগো—নইলে পড়ে থাক, অনন্ত কাল ধরে"......

তার সেই আহ্বানে, তারা আবার সব উঠে দাঁড়ালো—বিন্দু মাত্র ভীত বা বিচলিত না হয়ে, যেমন স্বর্গে সে তাদের আদেশ করতো, তেমনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে আদেশ করলো ...তার সেই কণ্ঠে সেই আগুণের সমুদ্রে ঢেউ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—সেই চির-আঁধার রাত্রি যেন ভয়ে কেঁপে উঠলো—প্রিয় অনুচরদের ডেকে সে বল্লে—হোক্ সে ঈশ্বর! তবু বশ্যতা মানবো না আমরা—আজ থেকে তার সঙ্গে হবে আমাদের যুদ্ধ—কখনও প্রকাশ্য, কখনও গোপন—তবুও স্বীকার করবো না পরাজয়।

তারপর সেই জ্বলন্ত নরকের দিকে চেয়ে সে গর্ব্ব-ভরে বল্লে,

"তোমার দেশে এসেছে তোমার নতুন রাজা......
তাকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হও,
সে এসেছে সঙ্গে করে এমন এক মন,
স্থান বা কালে যার পরিবর্ত্তন হয় না—
সে এনেছে এমন এক মন, যে-মন তার নিজের
সিংহাসনে নিজে রাজা হয়ে বসে আছে,
যে-পারে স্বর্গকে নরক করে আর নরককে স্বর্গ করে তুলতে!"

সেই মন দিয়ে স্যাটান্, ম্যামুন * বলে তার এক অনুচরকে, তার জন্যে এক নতুন প্রাসাদ তৈরী করতে আদেশ দিলো। ম্যামুন্ তার আদেশে এক প্রাসাদ তৈরী করলো। তার নাম হলো,—"প্যাণ্ডিমোনিয়াম্"। †

এই প্রাসাদে স্যাটান্ তার অনুচরদের নিয়ে পরামর্শ করতে বসলো। কি ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ চালানো যায়।

প্রথমে মোলক্ (*) উঠে প্রস্তাব করল যে, যেমন করেই হোক, যুদ্ধ চালাতেই হবে!

কিন্তু বেলিয়াল্ * প্রতিবাদ করে বললে—স্বর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করা, আমার

---

*স্যাটানের অনুচরদের যে সব নাম মিলটন দিয়েছেন, সে নামগুলি হলো প্রাচীন পৌত্তলিক জাতিদের দেবতাদের নাম। যেমন ম্যামুন হলেন—অর্থের দেবতা; মোলক্ হলেন—এক ফিনিসিয়ান্ দেবতা, যাঁর কাছে নরবলি দেওয়া হত; বেলিয়াল—শয়তানের এক নাম বা পতিত দেবদূত।

†এই কথাটির মানে অভিধানে দেখে নিও।

মনে হয়, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়—কারণ স্বর্গে ঢোকবার্ সব পথ সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে সদা-সর্ব্বদা ঘেরা—তা ছাড়া হেরে গেলে হয়ত এবারে একেবারে লোপ পেতে হবে! যত কষ্ট হোক, একেবারে লোপ পেয়ে যেতে কে চায়? হয়ত একদিন সেই মহাশত্রু আমাদের ক্ষমা করতেও পারে...

ম্যামনও সেই কথাতে সায় দিয়ে জানালো যে, এই নরক নিয়েই আমাদের একরকম থাকতে হবে......

কিন্তু ব্যাল্‌জিবাব্ সকলকে প্রতিবাদ করে বলে উঠলো, তা নয়! অস্ত্র দিয়ে না পারি, ঈশ্বরকে জব্দ করবার, আমাদের যেমন কষ্ট সে দিয়েছে, তাকেও তেমনি কষ্ট দেবার অন্য পথ আছে। আমাদের রাজা স্যাটান আগে যে প্রস্তাব করেছিলেন, আমি সেই প্রস্তাব সমর্থন করি। আমরা শুনেছি, ঈশ্বর আর এক নতুন স্বর্গ তৈরী করেছেন, এবং সেখানে তাঁর প্রতিনিধিরূপে আর এক নতুন দেবদূত সৃজন করেছেন। তার নাম নাকি মানব! ঈশ্বরের সে বড় প্রিয়। আমরা এই মানবকে দিয়ে তার এই নতুন স্বর্গ-রচনাকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করবো, তার কাণে মন্ত্রণা দিয়ে তাকে তার সৃজন কর্ত্তার বিরোধী করে তুলবো...স্বর্গ থেকে ঈশ্বর যখন দেখবে যে তার সাধের নতুন স্বর্গ পাপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, যখন সে দেখবে যে তারই সৃজিত মানব যখন তার কথা না শুনে, আমাদের কথা শুনে চলেছে, তখন তার মনে যে জ্বালা হবে তাতেই হবে আমাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ! ঈশ্বরের সেই হবে যোগ্য শাস্তি!

ব্যালজিবাবের মুখে স্যাটানের সেই প্রস্তাব শুনে অভিশপ্ত দেবদূতের দল আনন্দে নেচে উঠলো! কিন্তু কোথায় সেই নতুন স্বর্গ-খণ্ড? তারা তো কেউ তা জানে না! আর কে-ই বা যাবে সেই নতুন দেশের সন্ধানে?

তখন স্যাটান্ বল্লে, তোমরা বিচলিত হয়ো না, আমি-ই যাব! অন্ধকার মরণ-সাগরের তীরে তীরে ঘুরে আমি খুঁজে বার করবো সেই নতুন দেশ!

সকলেই সেই প্রস্তাবে রাজী হলো! তখন স্যাটান্ অনুচরদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নরকের দ্বারে এলো। নরকের দ্বারে বসে ছিল দুই দ্বারী, পাপ আর তার ছেলে মৃত্যু! রাজাকে দেখে দ্বারী দরজা খুলে দিল। সে দরজা আর বন্ধ করতে পারলো না।

নরকের দরজা পেরিয়ে স্যাটান্ দেখে, সামনে সীমাহীন মহাসাগর...তার তীর নেই...পারাপার নেই।

সেই মহাসাগরের ওপর দিয়ে ডানা মেলে উড়তে উড়তে সে দূরে দেখতে পেলে স্বর্গ দেখা যাচ্ছে...তার জন্মভূমি...তাকে ঘিরে রয়েছে চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, মঙ্গল!

মাথায় এক বুদ্ধি খাটিয়ে সে সূর্য্যে গিয়ে উঠলো। একটী ছোট্ট দেব-শিশুর মূর্ত্তি ধরে সে উরিয়েলের সঙ্গে দেখা করলো। কারণ সে জানতো, উরিয়েল বড় সাদা-সিধে দেবদূত। তাকে সে জিজ্ঞাসা করলো,

হে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল দেবদূত, বলতে পারো ঐ সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মধ্যে কোথায় মানব আছে?

কোন সন্দেহ না করে উরিয়েল পৃথিবীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লেন,

"ঐ হলো সেই নতুন স্বর্গ-খণ্ড! পৃথিবী ওর নাম ··ঐখানে থাকে মানব।"

স্যাটান্ চেয়ে দেখলো, এক সোনার দড়িতে পৃথিবী স্বর্গ থেকে ঝুলছে।

আর কাল বিলম্ব না করে স্যাটান্ পৃথিবীতে গিয়ে উঠলো। পৃথিবীতে ঢুকতেই এক অপূর্ব্ব গন্ধ তার নাকে এলো। সেই নতুন জগতের নতুন গাছ-পালা, ফল-ফুল দেখে তার মন মুগ্ধ হয়ে গেল। এ কোথায় সে কি করতে চলেছে? একবার তার মনে অনু-শোচনাও এলো। কিন্তু যখনি তার মনে পড়লো, দাসত্বের কথা, তখনি সব অনুশোচনা তার দূর হয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে দেখলে এক অপরূপ সুন্দর উদ্যানে * দুটী মুর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে...দীর্ঘ, উন্নত, সুন্দর, একেবারে ঠিক ঈশ্বরের ছায়া। তাদের দুজনের রূপে পৃথিবীর আর সব জিনিষের রূপ ম্লান হয়ে গিয়েছে। স্যাটান বুঝলো, এই সেই ঈশ্বরের নতুন সৃষ্টি!

নানারকম পশু-পাখীর রূপ ধরে স্যাটান তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাদের কথাবার্ত্তা শুনতে লাগলো। এক জনের নাম আদম, অপরের নাম ঈভ্—জগতের প্রথম মানব, আর প্রথম মানবী।

একদিন এক গাছের তলায় শুয়ে তারা দুজনে কথা বলছিল, আর গাছের ওপর থেকে স্যাটান শুনছিল,

আদম ঈভ্‌কে বলছিল, তিনি আমাদের এই সমস্ত পৃথিবী দিয়েছেন—শুধু এই যে গাছ দেখছো এর নাম হলো জ্ঞান-বৃক্ষ, এই গাছের ফল খেতে বারণ করেছেন...,

ঈভ্ বিস্ময়ে আদমের কথা সব শুনছিল।

আদম বলছিল, আমি ছিলাম একা, একা এই বিরাট পৃথিবীতে! তাই দেখে ঈশ্বর তোমাকে তৈরী করলেন, আমারই এই বুকের পাঁজর থেকে!

* Garden of Eden—আদম ও ঈভের বাসস্থান; eden অর্থে আনন্দ।

ঈভ্ বলে, আমি চোখ চেয়ে দেখি, জলে আমার ছায়া! নিজের রূপে নিজে মুগ্ধ হয়ে গেলাম!

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এলো। এধারে উরিয়েলের কাছ থেকে স্যাটান চলে আসবার পর, তাঁর কি রকম সন্দেহ হয়েছে। তিনি গ্যাব্রিয়েলকে খবর পাঠালেন যে তাঁর সন্দেহ হয়েছে যেন একটা দুষ্ট দেবদূত পৃথিবীতে গিয়ে ঢুকেছে!

আদম আর ঈভ্ যে উদ্যানে থাকতো, তার রক্ষী ছিল দেবদূত গ্যাব্রিয়েল। উরিয়েলের কাছ থেকে খবর পেয়ে গ্যাব্রিয়েল তক্ষুনি খোঁজ করবার জন্য দুজন দেবদূত্‌কে বাগানের ভেতর পাঠালেন।

তখন স্যাটান একটা ব্যাঙের মূর্ত্তি ধরে ঈভের কানে কানে স্বপ্নে পরামর্শ দিচ্ছিল, সেই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাবার জন্য। পাছে তারা ঈশ্বরের সমান হয়ে যায়, সেই জন্যে ঈশ্বর তাদের সেই গাছের ফল খেতে বারণ করেছে। সেই ফল খেলেই ঈভ একেবারে দেবী হয়ে যাবে!

দেবদূত দুজন খুঁজতে খুঁজতে সেই ব্যাঙ-রূপী স্যাটানকে ধরে ফেলেছেন। তাঁদের হাতে ছিল তাঁদের স্বর্গীয় দণ্ড। সে দণ্ড যার ওপরে পড়বে, তার আসল মূর্ত্তি তখনি ধরা পড়ে যাবে। হঠাৎ সেই ব্যাঙের গায়ে সেই দণ্ড গিয়ে পড়তেই স্যাটানের আসল মূর্ত্তি প্রকট হয়ে উঠলো। তখন স্যাটানের কাজ হয়ে গিয়েছে—সে ঈভের কানে তখন কু-মন্ত্রণা ঢেলে দিয়েছে।

উপায়ান্তর না দেখে স্যাটান সেখান থেকে চম্পট দিল।

এধারে সকাল হতেই ঈভ রাত্রির সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা আদমকে বল্লো। সেই স্বপ্নের কথা শুনে আদম ঈভকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লো, কোন ভয় নেই! এস আমরা সেই সর্ব্বশক্তিমানের স্তব করি! তাঁর স্তবে রাত্রির দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে!

"…এই সকলি তোমার অপরূপ কীর্ত্তি, হে মঙ্গলময়,
হে অনাদি শক্তি, এই ভুবন-ভরা রূপ—
কত যে সুন্দর তা কথায় প্রকাশ করা যায় না,
তুমি এ সবার স্রষ্টা,
তোমার রূপের তুলনা কোথায় ?……
জয় হে প্রভু, তোমারি জয়!

তোমার যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মঙ্গল,
তাই শুধু দাও আমাদের!
যদি রাত্রির অন্ধকারে, কোথাও জমা হয়ে থাকে
যা অমঙ্গল, যা অসুন্দর,
দূর করে দাও তা তোমার মঙ্গল স্পর্শে,
যেমন প্রভাত আলো দিয়ে দূর করে দিলে রাত্রির অন্ধকার।"

এধারে স্বর্গে থেকে ঈশ্বর স্যাটানের গতিবিধি সব লক্ষ্য করছিলেন। র‍্যাফেলকে পাঠিয়ে দিলেন, আদমকে সাবধান করে দেবার জন্যে। স্যাটান সম্বন্ধে সমস্ত কথা আদম আর ঈভ্‌কে জানিয়ে র‍্যাফেল ফিরে গেলেন।

এধারে স্যাটানের মনে শান্তি ছিল না। সে সারা পৃথিবী অস্থির চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শেষকালে সে ঠিক করলে যে, সাপের মূর্ত্তি ধরে আবার সে গার্ডেন অফ্ ইডেনে যাবে। যদি কোন রকমে ঈভকে ভুলিয়ে সেই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াতে পারে।

একদিন সকাল বেলা আদম আর ঈভ কাজে বেরিয়েছে। সেদিন ঈভ বল্লে, তারা আলাদা আলাদা জায়গায় কাজ করবে—চব্বিশ ঘণ্টা এক জায়গায় থাকলে, গল্পে আর হাসিতে কাজের ব্যাঘাত হয়!

আদম কিন্তু ঈভকে ছেড়ে যেতে রাজি হলো না, যদি এইটুকু ছাড়াছাড়ির মধ্যে কোন বিপদ হয়?

ঈভ হেসে বল্লে, সে কি কখনও সম্ভব? এইটুকু ছাড়াছাড়ির মধ্যে, এই গার্ডেন অফ্ ইডেনে যদি বিপদ হয়, তাহলে আজীবন তারা এখানে থাকবে কি করে?

অগত্যা সেদিন আদম ঈভকে ছেড়ে দূরে কাজ করতে গেল। তাই না দেখে, সাপ-রূপী স্যাটানের কি উল্লাস! সে সর্ব্বদাই খুঁজছিল কি করে ঈভকে আলাদা পাওয়া যায়—সে সুযোগ সেদিন আপনা থেকেই জুটে গেল।

আজকাল সাপেরা যেমন বুকে হেঁটে মাটী দিয়ে চলে, সেদিন কিন্তু তেমন ছিল না। তাদের দেখতে খুব সুন্দর ছিল।

স্যাটান সাপরূপে ঈভের কাছে এসে তাকে ডাকলো,

এই সুন্দরী ধরণীর হে সম্রাজ্ঞী—

ক্রমশঃ

বাদশাহী গল্প

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

— পাঁচ —

—"অবাক জলপান খেয়েছ কখনো দাদামশায় ?"

—"না খাইনি, গল্প শুনতে বসলেই তোমার খাবারের কথা মনে পড়ে কেন বলো বাদশাবাবু ?"

—"মনে পড়লেই বা দোষ কি ?"

—"ওতে করে গল্প শোনার ক্ষিদে মরে যায়।"

—"গল্প বলবার ক্ষিদে ?"

—"আরো বেড়ে যায়; কই দেখি একটু অবাক-জলপান দাওতো চাখি।"

—"সে এখানে পাওয়া যায়না !"

—"তবে ?"

—"তোমাকে লোভ দেখালুম !"

—"আরে কি মুস্কিল, কোথায় পাওয়া যায় বলনা, আনাই কাউকে দিয়ে !"

—"সে কেউ আনতে পারবেনা, এদিকে আসেনা সে !"

—"তবে কোন দিকে ?"

—"সে অনেক দূরে—মামারবাড়ীর দিকে !"

—"যাওয়া যায়না সেখানে ?"

—"যাবেনা কেন ? মটোরে গেলে ছুটাকার তেল পুড়বে, ট্রামে গেলে ছ'আনা, বাসে গেলেও তাই—অথচ জিনিষটার দাম এক পয়সাও নয় !"

—"কেমন করে জানলে ?"

—"আমিতো অমনি খেয়ে এলেম মামার বাড়ীতে, পকেটেও নিয়ে এলেম একথাবা—দাম তো চাইলে না কেউ !"

—"দেখি তো পকেট !"

—"অ্যাঁ, না কি কর দাদামশায়, পকেট ছিঁড়ে যাবে ছেড়ে দাও !"

—"আরে পকেট নিচ্চিনে !"

—"তবে দেখ যাঃ ফোক্কা—উড়ে গেছে—কেমন ঠকেছ ?"

—"ভারি তো তোমার অবাক-জলপান আমি ওর চেয়ে ভালো জিনিষ বিনি পয়সায় খেয়েছি।

—"কি বলনা !"

—"শুনে কেবল ছুঃখু বাড়বে, খেতে তো পাবে না।"

—"নিশ্চয় তোমার পকেটে আছে, দেখি !"

—"দেখ, এ পকেটে রুমাল, ও পকেটে চশমার খাপ, বুকের পকেটে কলম, খড়কি কাঠি, অ্যাঁ ওটা নিও না—ও আমার নোট !"

—"খুলে দেখি ?"

—"দেখ আপত্তি নেই !"

—"এ কি লেখা আছে ?

—"পড়ে দেখ না !"

—"চেপ্টা মাথা চট্ জলদী !!"

—"কি বাদশাবাবু কথা নেই যে ? অবাক-জলপানের চেয়ে খাসা জিনিষ কিনা বল ? —ও কি কাগজটা খেয়ে ফেল্লে যে !"

—"থ্যাক্ থুঃ তেতো !"

—"লেখা কাগজে তেতো হবেনা, জীভে কালী লেগেছে। যাও মুখ ধুয়ে এসো—চেপ্টা-মাথা চট্-জল্দীর গল্প হবে।"

—"কামিজে মুছে ফেলেছি আর তেতো নেই।"

—"আচ্ছা তা'হলে মুখটি বুজে কানটি খুলে রাখ, গল্পের মাঝে মুখ খুলেছ কি চট্-জলদী পালিয়েছে। শোন বলি—

যুধিষ্ঠির মালী—ঘাড় নাড়ো যে বাদশা? শোন না বলি—হাত নাড়ো যে? যুধিষ্ঠির মালী—এ কি উঠে যাও যে? আচ্ছা বুঝেছি, যুধিষ্ঠিরের গল্প চল্‌বে না। বসো, বলি শোন—

যখন যে তরকারিটি মাছটি নতুন উঠবে বাজারে, সেটি এনে উপস্থিত করা চাই আমাদের বাড়ীতে সহরের আর কেউ খাবার আগে—দামের জন্যে ভাবনা নেই। মানুষটি কে? তুমি দেখনি, দেখতেও পাবে না, নামধাম পরিচয় দিলেও বুঝবেনা।—আঙ্গুল নড়ে যে? ছবি এঁকে দেখাতে বলছ? আচ্ছা কথায় ছবি আঁকা যাক্—

ভাবো এক বুড়ো টাক মাথা,
ঘাড়ের কাছে পাকচুল বাবড়ি-কাটা,
বাম পাটা-ফোলা যেন হালি সহরের বৈতাল কুমড়ো,
বাকী দেহটা-কালিদাসের 'ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ' কবিতা
পাঞ্জাবি কেতাব-পাকা দাড়ি গোঁফ্
গায়ের রং—খয়েরে সিঁদুরে মিলেছে সুরকীর গুঁড়ো
সর্ব্বদা হাতে মুর্শিদাবাদের গেঁটে বাঁশের মোটা দাণ্ডা,
লালছিটের রুমাল গলেতে বাঁন্ধা,
কামিজের চুনোট্ হাতা,
কাঁধে চাদরখানি—
ধুতি পরার কেতা হিন্দুস্থানি,
দুপায়ে দুই মাপের জুতা,—বাম পায়েরটা চেপ্টা গুড়মুড়ো।
ভোরে উঠে ডন ফেলে, লর্ডস্ প্রেয়ার পড়ে
দাঁতন করেন,
বেড়াল দেখেছে কি উঠিয়েছে হুড়ো।

বেড়ালের উপর জাতক্রোধ এমন আর দেখিনি। কেন তা জানিনে। রাতে চারখানা কাঠের চৌকির হাতায় মশারি বেঁধে বৈঠকখানার মাঝের ঘরে মাদুরের উপর তোষক পেতে দিত ফরাশ, তার মধ্যে তিনি নিদ্রা দিতেন—বেড়াল সেখানে এগোতে সাহস করে কি?

আমি একদিন শুধিয়েছিলেম—'বেড়াল দেখলেই তেড়ে ওঠ কেন?'

কে জানে ভাই, ব্যাটাদের দেখলেই কেমন রাগ হয়ে যায় ; শোন তবে বলি—

আজ প্রায় ৬০।৬৫ বছর হল. এই লাঠি যখন প্রথম কিনি. তখন যার নামে ঐ পাঁচি-ধোপানীর গলিটা হয়েছে সেটা বেঁচে আছে। ইয়া ল্যাজ মোটা তার এক পোষা বেড়াল। ভোরে নতুন লাঠিটা হাতে তোমাদের এখান থেকে যাচ্ছি, দেখি বেড়ালটা অকাতরে ঘুমোচ্ছে দাওয়ায় পড়ে। নতুন কিনেছি লাঠিটা—মজবুদী তো পরখ্ করা চাই! দিলেম বসিয়ে বেড়ালটার ঘাড়ে। টুঁ শব্দটি করতে হল না। আমিও চট্ সরলেম নতুন বাজারের দিকে—তখনো ঘোর ঘোর আছে।

বাসায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে, বাজার থেকে নতুন এক তরকারী—যা কেউ খায়নি—কিনে রুমালে বেঁধে আসছি, গলির মোড় থেকে শুনি পাঁচি বাড়ীওয়ালীর গলা—'কে কল্লে এমন? তার সর্ব্বনাশ হোক—গোল্লায় যাক্'—যত গালাগাল তত কান্না।

আমি বুঝলেম ভাই ব্যাপারটা যা হয়েছে! অতি ভাল মানুষটি হয়ে বল্লেম—'বলি ও গিন্নি, হল কি? কান্নাকাটি কেন?'

—'দেখনা বাবু কোন—' বলেই যা একটানা লম্বা গালাগাল, শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

আমি কি আর বলি, বেড়ালটাকে একটা লাঠির খোঁচা দিতে সেটা দাঁত খিঁচিয়ে, পেট উঁচিয়ে কাৎ হয়ে পড়লো খানায়।

আর কোথা আছে—বাড়ীওয়ালীর কান্না! মাথা কুটে মরতে যায়! আমি সাধু হয়ে তার কাটা ঘায়ে তত নুনের ছিটে দিই—'তাই তো, এই বাজারে যেতে দেখে গেলেম, বেড়ালটি মোটা ল্যাজ ফাঁপিয়ে দেয়ালে গা ঘসছে—আহা কে এমন নিষ্ঠুর এর মধ্যে মধ্যে এর দফা রফা করলে? বড় ভালো ছিল বেড়ালটি! সকালে ওর মুখখানি দেখলে দিনটি ভালো যেতো! কোলে পিঠে করে মানুষ করলে—ওর প্রমাই ফুরিয়েছিল; তবু ভাল বলতে হবে যে তোমার ষষ্ঠির দাস ঠিক ষষ্ঠির দিনেই গেছে—' এই বলেই আমি চট্ চম্পট।

তারপর থেকে বেড়াল দেখেছি কি, সেদিনের গালাগাল মনে পড়ে যায় তার রাগ সামলাতে পারি না—ব্যাটা বেড়াল অপঘাতে মরেছিল তাই উদ্ধার হয়নি এখনো ঘুরছে।

আমি বল্লেম—'কখনো সে বেড়াল আর দেখা দিয়েছিল?'

—'দিয়েছিল, সেদিন সন্ধেবেলা এতকাল পরে ঠিক ষষ্ঠি পুজোর সময় নিজের চৌকিতে বসে আছি—বিশ্বেশ্বর তামাক দিয়ে গেল, টানছি তো টানছি, টিকে আর ধরতে চায়

না, বৈঠকে হুঁকো রেখে ভাবছি সেই কত বছর আগেকার তোমাদের বাড়ীর ষষ্ঠি পূজোর ধুমধাম, এমন সময় পিছন দিকে ডাক! লাঠি ঠুকবো—দেখি লাঠি সরে গেছে।

—'বেদ্ড়া কোথাকার' বলে উঠিতে যাই পারিনে। 'বিশ্বেশ্বর বিশ্বেশ্বর' হাঁক দিতে কে যেন চেপ্টা-মাথা চট্ জলদী পালিয়ে গেল।"

—"তারপর?"

—"এঃ বাদশা বাবু মুখ খুলেছ—আর গল্প চলবে না।"

—"তুমি যে বল্লে চট্ জলদি খাবার জিনিষ?"

—"নিশ্চয় আমি কি মিছে কথা বলেছি!

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বর্ষার মেঘছেঁড়া রোদে ছায়ামাখা বন স্তব্ধ শান্ত। নালুখ তার বাচ্চাদের নিয়ে কাছেই বনের ভেতর কোন শেকড় খাওয়া যায়, কোন শেকড় ওষুধ আর কোন শেকড় বিষ তাই চেনাচ্ছে। ভাল্লুকমা একটা শাল গাছের তলায় শ্যাওলার ওপর মংলুকে শুইয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। তার অন্য বাচ্চাগুলো এখন বড় হয়েছে কিন্তু মংলু টিকটিকি এখনও ছেলে মানুষ। মানুষের ছানাগুলোর বড় হতে বড় সময় লাগে। তবু ভাল্লুকমা এখন খানিকটা নিশ্চিন্ত, নালুখ এসে পড়ায় তার ভয় অনেক কমে গিয়েছে। শত্রুর হাত থেকে বাচ্ছাদের বাঁচাবার ভার এখন নালুখের তাই ভাল্লুকমা অনেকটা নিশ্চিন্ত। মালুর পায়ে থাবা দিয়ে থাবড়াতে থাবড়াতে ভাল্লুকমা তাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। বর্ষার রোদে তৃপ্ত বন ঝিম ঝিম। পাতার ফাঁকে ফাঁকে আলো ছায়ার লুকোচুরী খেলা। শাল গাছের মাথা থেকে চীল হাঁক দিল— কর্‌র্‌ চি-ই...ভাল্লুকদের ভালো হোক। শিকার টিকার ভাল জুটুক! কি গো ভাল্লুক গিন্নী শিকারে যাওনি আজ?

ভাল্লুকমা বলল—মংলু টিকটিকি যে ঘুমোচ্ছে
ওদিকে মহুয়া গাছের ডালে সে মস্ত এক মৌচাক হয়েছে
—সত্যি ?
ভাল্লুকরা মধু খেতে বেজায় ভালবাসে।

ভাল্লুক গিন্নী চীলকে বলল...মংলুর ওপর একটু নজর রেখো না ভাই, আমি ঘুরে আসব। দেখো যেন শকুনগুলো না নামে। পৃথিবীতে লোভই যত কিছু অনিষ্টের মূল। ওই মধু খেতে লোভ যদি ভাল্লুকমার তখন না হোত তা হলে মংলুর এতবড় একটা বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারত না। কারণ ভাল্লুকমা অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দে পা ফেলে শেয়ালের পেছনে কালকেতু এসে হাজির হোল। শালের মাথায় চীল ঝিমুচ্ছিল, শেয়াল আর কালোবাঘ এমন নিঃশব্দে এল যে চীলের সামান্য শব্দে অভ্যস্ত কাণও তাদের পায়ের আওয়াজ ধরতে পারল না।

শেয়াল বলল—এই যে এসে গেছি! আরে ওইত মানুষের ছানাটা গাছতলায় ঘুমুচ্ছে, ভাল্লুকরা কেউ নেই! কি ভাগ্যি! কালকেতু নিঃশব্দে মংলুর কাছে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। শেয়াল বলল—কি দাঁড়ালে কেন? মারোনা থাবা! ইস! কালকেতু গম্ভীর গলায় বলল ওযে ঘুমুচ্ছে, ঘুমন্ত জানোয়ারকে শিকার করা জঙ্গলের নিয়ম নয়।

শেয়াল অধীর হয়ে বলল—তবে কি হবে ?

অধীর হলেই জানোয়াররা অসাবধান হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার পায়ের শব্দে চীল চটকা ভেঙ্গে জেগে উঠল। জেগে উঠে নীচের পানে তাকিয়েই আকাশ কাঁপিয়ে চীৎকার। সেই চীৎকার বনের গাছে গাছে প্রতিধ্বনিত হতে হতে নালুখ যেখানে শেকড় খুঁড়ছিল সেখানে পৌঁছল। ভাল্লুকমা যেখানে মৌমাছিদের মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে মধু খাচ্ছিল সেখানে পৌঁছাল। ভাল্লুকমা খাওয়া ভুলে হন্তদন্ত হয়ে ছুটল! নালুখ ফিরল বাসার পানে।

এদিকে শেয়াল বলল—শিগ্‌গির মানুষের ছানাটাকে মুখে তুলে নাও, এখুনি ভাল্লুকরা এসে পড়বে!

কালকেতু একলাফে এসে সাবধানে মংলুকে মুখে করে তুলে নিল। চীল তারস্বরে চীৎকার করে উঠল। কালকেতুর একটা দাঁতও মংলুর গায়ে বসল না কারণ বনের নিয়ম অনুসারে কালকেতু এখন তাকে মারবে না। মংলু জাগল না। ভাল্লুকমার মুখে মুখে এমন সে অনেক ঘুরেছে কিন্তু ক্রুর ধূর্ত্ত কালো বাঘ আর শেয়ালের সঙ্গে সে মৃত্যুর দক্ষিণ দ্বারে যে এগিয়ে চলল, ঘুমন্ত অসহায় মংলু তা জানতেও পারল না। বাঘেদের অনুসরণ করে চীল চেঁচাতে আকাশে উড়ে চলল।

এদিকে ভাল্লুকমা পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এসে দেখে মংলু নেই। ভাল্লুক মা মাথায় হাত দিয়ে বসে করুণ চীৎকার করে উঠল ঠিক সেই সময়ে বাচ্ছাদের তাড়িয়ে নিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে নালুখ এসে হাজির।

—কি কি হয়েছে গিন্নী?

ভাল্লুক গিন্নী বলল—মংলু টিকটিকিকে শেয়ালে নিয়ে গেছে।

নালুখের লোমগুলো রাগে খাড়া হয়ে উঠল। সে গর্‌গর্‌ করে গজ্জন করে উঠল।

ভাল্লুকমা মাথা চাপড়ে বলল—হায় হায় কেন আমি মধু খেতে গেলাম? মংলু টিকটিকিকে পাজী শেয়াল নিয়ে গেল? হায় হায়!

নালুখ তখন মাটির ওপর থাবার দাগ একমনে পরীক্ষা করছিল, সে বলে উঠল—শেয়াল নয় এখানে বাঘের থাবাও দেখা যাচ্ছে।

ভাল্লুকমা চমকে উঠল—অ্যাঁ? কালো বাঘ?

—হুঁ!

—হায় হায়, তাই চীল অমন চেঁচিয়ে উঠেছিল। নালুখ জিগেস করল—চীল?

—হ্যাঁ ওই গাছের ওপর ছিল।

—কোথায় চীল?

ভাল্লুকমা আকাশে তাকিয়ে দেখল চীল কোথাও নেই।

নালুখ বলল—চল আর দেরী নয়, এর প্রতিশোধ নিতে হবে। দেখি সে কেমন বাঘ!

নালুখ দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ছাড়ল তার যুদ্ধ গর্জ্জন। সে গর্জ্জন মেঘের ডাকের মত বন থেকে বনান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল। জানোয়াররা সে গর্জ্জন শুনে চমকে উঠল। দূর পাহাড়ে সম্বর সে ডাক শুনে ভয়ে লাফিয়ে উঠে বনের ভেতর মিলিয়ে গেল।

বাঘের থাবার দাগ অনুসরণ করে নালুখ ছুটল মরিয়া হয়ে, পেছনে তার ভাল্লুক মা আর বাচ্ছারা। বনের যেখানে ফাঁকা জায়গায় ধূলো জমে আছে সেখানে বাঘের থাবার দাগ সুপষ্ট। কিন্তু বন যতই গভীর হতে লাগল ততই শুকনো পাতা ঝরে মাটি ছাওয়া। সেখানে আর থাবার দাগ দেখা যায় না।

ভাল্লুকরা থমকে দাঁড়াল। পথ হারিয়েছে। বাঘ কোথায় গেছে কোন দিকে?

কোথায় যেন দূর আকাশ থেকে ক্ষীণ একটা ডানায় শব্দ। ভাল্লুক মা চমকে ওপরে তাকাল। নীল আকাশের বুকে ছোট্ট কালো একটা দাগ। তারপরে দাগটা বড় হতে লাগল। বিদ্যুৎ বেগে কে যেন ছুটে আসছে। তারপরে ভাল্লুকরা চীলের গলা

শুনল—ওগো ভাল্লুকরা শোন। তোমাদের শিকারের ভাগ আমি অনেক সময় পেয়েছি। আমি তাই তোমাদের বন্ধু। মংলু টিকটিকিকে কালো বাঘ ধরে নিয়ে গেছে।

—কোথায়? নালুখ হাঁক দিল

—হিজল বনে

আর শোনবার দরকার গেল না। ভাল্লুকরা ছুটল আবার।

এদিকে বাঘের ডেরায় মংলুর ঘুম ভাঙ্গল। প্রথমে সে আড়ামোড়া দিয়ে শরীর থেকে ঘুম তাড়িয়ে নিল, তারপরে উঠে বসল সে।

শেয়াল বলল—এইবার!

কালকেতু দুপা পেছিয়ে এসে—গর্‌র্ করে উঠল। মংলু চমকে ফিরল বাঘের দিকে। সে বাঘ কখনও দেখেনি কিন্তু কোন অনুভূতি যেন তাকে বলে দিলে যে এই প্রাণীটা তার শত্রু। কিন্তু সে ভয় পেল না, হামা দিয়ে উঠে বাঘের দিকে এক দৃষ্টে তাকাল। কালকেতু এদিকে টান হয়ে দাঁড়িয়েছে লাফিয়ে পড়বে বলে। এক থাবার ঘায়ে মংলুর ছোট্ট প্রাণ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সময় কেটে যেতে লাগল বাঘ আর লাফায় না। শিকার ভয় না পেলে শিকারী কখনও শিকার করতে পারে না।

—কি দেরী করছ কেন?—শেয়াল জিগেস করল। কালকেতু গর্জ্জন করে উঠল—কি তখন থেকে ফ্যাচ ফ্যাচ করছ? দেখছ না মানুষের ছানাটা একটুও ভয় পায়নি? তাছাড়া ওর চোখে কি যেন আছে। ওর চোখের দিকে তাকালে আমার বুকের ভেতর কি রকম করছে!

সত্যি সত্যিই মংলুর চোখের সেই অদ্ভুত রহস্য মাখা গভীর দৃষ্টির সামনে বাঘ ছটফট করছিল।

কোন জানোয়ার মানুষের পূর্ণদৃষ্টি সহ্য করতে পারে না।

কালকেতু বলল—ও যতক্ষণ ভয় না পেয়ে আমার দিকে ওই রকম স্থির চেয়ে থাকবে ততক্ষণ আমি লাফাতে পারবনা।

শেয়াল বলল—আচ্ছা আমি ওর দৃষ্টি ফেরাচ্ছি। শেয়াল গাছের আড়াল থেকে এগিয়ে এল। মংলু চমকে শেয়ালের দিকে ফিরল। সে জানত না যে সেই মুহূর্ত্তে তার জীবনের অলক্ষ্য দঁড়ি টানা হয়ে গিয়েছিল।

কালকেতুর পেশীগুলো লাফাবার আগের মুহূর্ত্তে কঠিন হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই সময়ে নালুখের যুদ্ধ গর্জ্জনে হিজল বন কেঁপে উঠল। কালকেতু লাফিয়ে উঠেছিল কিন্তু সেই গর্জ্জনে তার তাক ফসকে গেল। নালুখ তখন দাঁড়িয়ে উঠে দুহাত বাড়িয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে গাছের ফাঁক দিয়ে ছুটে আসছে। ভাল্লুকমা এক লাফে এসে মংলুকে আগলে দাঁড়াল। আর কালকেতু শিকার ফসকে মরিয়া হয়ে ঘুরেই নালুখের ওপরই এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নালুখ ত তৈরীই ছিল। সামনের দুটো বলিষ্ঠ হাতে সে সাঁড়াসীর মত বাঘকে তার বিশাল বুকে চেপে ধরল।

হিজল বন কেঁপে উঠল

পাজী শেয়াল এ সব ব্যাপার দেখে মুহূর্ত্তের মধ্যে হাওয়া।

কালকেতু গায়ের বলে কম যায় না কিন্তু ভাল্লুকদের আক্রমণ তার ওপর অতর্কিত।

ওদিকে নালুখ মরিয়া হয়ে লড়বার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছে। তার হাঁ করা মুখে দাঁতগুলো ঝক ঝক করছে। চোখগুলো আগুনের পিণ্ডের মত রাগে ঘুরছে। কালকেতু শিকার ফসকে নেহাতই রাগের মাথায় নালুখের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আক্রমনটা ঠিক মত হোল কি না ভাববারও সময় পায় নি। যখন ব্যাপারটা ভাল সে বুঝল তখন সে

বুঝতে পারল যে সে একেবারে বোকার মত মরণের খপ্পরে পড়েছে কারণ ভাল্লুক কোন জানোয়ারকে একবার বুকের মধ্যে পেলে তার আর আশা থাকে না। সে একেবারে পিষে ছাতু হয়ে যায়।

কালকেতু তখন বুঝছে যে এ যাত্রা তার আর রক্ষে নেই, ভাল্লুকের বিশাল সেই দুই বাহুর চাপে তার জিভ বেরিয়ে আসছে! সে আবার নখ দিয়ে ভাল্লুকের কাঁধটা ফালা ফালা করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নালুখের কাঁধে অজস্র লোম। কালকেতুর নখ জড়িয়ে যেতে লাগল। কালকেতু বুঝল এখন জেতবার আশা বৃথা, আত্মরক্ষা করাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। ওদিকে মুহুর্মুহু নালুখের বাহুর চাপ কঠিন হচ্ছে। কালকেতুর জিভ আধখানা বেরিয়ে এল, সে গোঁ গোঁ করে উঠল। মরণ শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে। কালকেতু মরিয়া হয়ে প্রাণপণে সাপের মত একবার পেশীগুলো কিলবিল করে দিয়ে পিছলে নালুখের দুই বাহুর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। যুদ্ধের প্রথম ঝোঁকে প্রতিপক্ষ কাবু না হলে জানোয়াররা দাঁড়ায় না। নালুখ গর্জ্জন করে উঠল। কালকেতু বেরিয়ে এসেই সজোরে একটা দম নিয়ে বনের ভেতর দিকে মারল ছুট।

নালুখ আকাশে মুখ তুলে ছাড়ল তার বিজয় গর্জ্জন। চীল সে ডাক আকাশে তুলে নিয়ে বনে বনে ছড়িয়ে দিল তারস্বরে।

এমনি করে মংলু তার জীবনের প্রধান একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেল। সে তখন আপন মনে ভাল্লুকমায়ের বুকের দুধ খাচ্ছে।

ফিরতি পথে নালুখ গান ধরল—

নালুখ। শিকার কোথায়?
বাচ্ছারা। পালিয়েছে, পালিয়েছে,
নালুখ। বনের মাথায় চীল ডাকে,
ভাল্লুকমা! নালুখ ভালুক ওই হাঁকে
নালুখ। কঠিন থাবার অনেক বল,
বাচ্ছারা। ওভাই এবার ছুটেই চল।
সকলে। ছুটেই চল, ছুটেই চল।
ভাল্লুকমা। কো গাছেতে ঝরছে মৌ
নালুখ। বাসায় কাঁদে শেয়াল বৌ

বাচ্ছারা। বন হরিণী কোথায় গো ?

ভাল্লুকমা। শেয়াল ডাকে হুক্কা হো

মংলু আমার সামলে শো

সকলে। সামলে শো, সামলে শো।

নালুখ। আলো ছায়ায় পথ কাবার

ভাল্লুকমা। সূয্যি ডোবে জলার পার

বাচ্ছারা। ওভাই এবার ঘরেই চল

নালুখ। বনঝরণায় নামল ঢল

সকলে। নামল ঢল, নামল ঢল।

ঘরেই চল, ঘরেই চল।

ক্রমশঃ
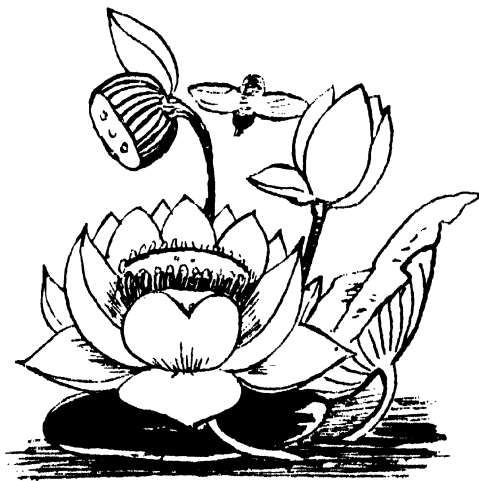
ভদ্রতা কাকে বলে

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

অনাদিবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপেই আমি মুগ্ধ। এমন প্রিয়ভাষী অমায়িক ভদ্রলোক আজকালকার দিনে হয় না। সেদিন সকালবেলা এক পেয়ালা ঠাণ্ডা চা আর এক খণ্ড অদৃশ্য মাখন মাখানো চামড়ার মতো শক্ত পাঁউরুটি খেয়ে হোটেলের খুপরিতে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে আছি, হঠাৎ বাইরে একজনের হাঁক শুনলাম—বিজন আচ্ছা নাকি হে?

এই হাজারিবাগের জঙ্গলে আমার আবার খোঁজ করে কে? তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলুম। দরজা খুলে দেখি মোটা সোটা সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে বললেন, তোমারই নাম বিজন ঘোষ?

ভদ্রলোকের বয়েস চল্লিশের উপর হবে; মাথার চুল কাঁচাপাকা মেশানো। আমি যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে বললুম—আজ্ঞে হাঁ, আপনি...

ভদ্রলোক মধুরভাবে হেসে বললেন—আর আমাকে তুমি চিনবে কোত্থেকে? তোমাকে আমি ছেলেবেলা থেকে চিনি। তোমার বাবার নাম রামদয়াল ঘোষ তো?

কথাটা নিছক সত্য, কোনোরকমেই অস্বীকার করা যায় না।

—তাহ'লেই হয়েছে! আরে তোমার বাবা হচ্ছেন আমার মাসতুতো ভাই। আমি তোমার কাকা হই। ব'লে ভদ্রলোক হা-হা ক'রে হেসে উঠলেন।

আমি সসম্ভ্রমে বললুম, আসুন, ঘরে এসে বসুন।

ঘরের মধ্যে একটি তক্তপোষ, একটি ছোটো টেবিল, তারপর আর পা ফেলবার জায়গা নেই। ঐ তক্তপোষে আমি আর সুমন্ত্র রাত্রে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুই; আর দিনের বেলায় যেটুকু সময় ঘরে থাকি, কোনোরকমে সময় কাটাই। সেই তক্তপোষেরই এককোণে সসঙ্কোচে ভদ্রলোককে বসতে দিলুম।

—এই ঘরে আছো বুঝি? ইনি কে?

সুমন্ত্র ওর কতগুলো ফোটোগ্রাফের নেগেটিভ আলোয় তুলে ধ'রে পরীক্ষা করছিলো, আগন্তুককে দেখেও বিশেষ বিচলিত হ'লো না। ফটোগ্রাফি ওর এক ব্যাধিতে দাঁড়িয়েছে, ওকে নিয়ে আর পারা যায় না।

ওর অভদ্রতায় অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে আমি বললুম—ও আমার বন্ধু, সুমন্ত্র সোম। আমরা দু'জন একসঙ্গে এসেছি।

—বাঃ, দু' বন্ধুতে বেড়াতে এসেছো হাজারিবাগ। বেশ। কবে এসেছো?

—এই তো তিনচারদিন হ'লো।

—দ্যাখো তো! তুমি আমাদের আপন লোক, আর তুমি কিনা এখানে এসে হোটেলে আছ! আরে তোমার সঙ্গে কি দেখাই হত নাকি! ভাগ্যিস আজ এই হোটেলে এসেছিলাম এক বন্ধুর জন্যে ঘর ঠিক করতে! তোমাদের এই ছোটো ঘরটা হ'লে তাঁর চ'লে যেতো। ম্যানেজার বললেন, ও-ঘর এনগেজ্ড্ হ'য়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, কে আছেন? ওঁরা তখন ওঁদের খাতা নিয়ে এলেন, তাতে তোমার নাম দেখলুম। তাতেও আমার কিছু মনে হয়নি—কী ক'রেই বা হবে?—কিন্তু যেই তোমার বাবার নাম চোখে পড়া অমনি আমার মনটা ধ্বক্ ক'রে উঠলো। এ তো তবে আমাদেরই সেই বিজন! তক্ষুনি এসে ডাকলুম তোমাকে।

আমি মনে মনে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করলুম, কিন্তু কী ক'রে সেটা প্রকাশ করবো ভেবে পেলুম না। জিজ্ঞেস করলুম—আপনি এখানেই থাকেন বুঝি?

—হ্যাঁ, আমি ফরেষ্ট-আপিসে কাজ করি কিনা। চাকরি জীবনে নানা জায়গায় ঘুরেছি, শেষটায় এই হাজারিবাগে এসে ভারি ভাল লাগলো। রিটায়ার ক'রে এখানেই কাটাবো ভাবছি। সে যা-ই হোক্, তোমার খবর কী বলো? কী করছো?

—বি-এ পড়ছি স্কটিশে। সুমন্ত্র আমার সঙ্গেই পড়ে।

—বাঃ এইটুকু বয়েসে বি-এ পড়ছো! চমৎকার! ভদ্রলোক আমার হাত ধ'রে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি ছিলেন। —আরে তোমাকে কতটুকু দেখেছি! তোমার বাবা যখন নেত্রকোনায় ছিলেন, মনে আছে তোমার?

আমি বললুম—মনে নেই।

—তা কী করেই বা থাকবে, তখন তুমি কতটুকু! তখন আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলুম, তারপরে আর তোমার বাবার সঙ্গেও দেখা হয়নি। এই তো দ্যাখো এখান থেকে ওখানে ঘুরছি—কোথায় শিলং কোথায় নাগপুর কোথায় নৈনিতাল—আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখাশোনা হওয়ার কি আর উপায় আছে! এতদিন পরে তোমাকে দেখে কী যে ভালো লাগছে! ছেলেবেলায় তোমার বাবার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। তাঁকে আমরা বড়-দা বলতুম। তাঁর মা আর আমার মা সাক্ষাৎ মামাতো-পিসতুতো বোন। কাজেই দেখতে পাচ্ছো, সম্পর্কটা নেহাৎ ফ্যাল্না নয়।

সম্পর্কের জটিলতার ব্যূহভেদ করবার চেষ্টা না ক'রে তৎক্ষণাৎ সায় দিলুম—তা তো নয়ই।

তারপর ভদ্রলোক অনেক পারিবারিক তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কিছু আমি জবাব দিতে পারলুম. কিছু পারলুম না। পরিশেষে বললেন—যাক্‌, ভা-রি ভালো লাগলো এখানে তোমাকে পেয়ে। আরে আগে জানলে আর হোটেলের দরকার কী ছিল, আমার ওখানেইত থাকতে পারতে।

আমি অপরাধীর মতো বললুম—আপনার কথা আমি তো জানতুম না।

—তা তো ঠিকই তা' তো ঠিকই। হোটেলের ব্যবস্থা কেমন?

সুমন্ত্র এক্ষণে একটা কথা বললে—যাচ্ছে-তাই।

—ভালো না বুঝি? আর দিশি হোটেল সবই এ-রকম, আমি তো এদের এতদিন ধরে দেখে আসছি। তা তোমরা এককাজ তো করতে পারো, আমার ওখানে এখনো তো চ'লে আসতে পারো—হ্যাঁ, বেশ তো, তোমরা দু'জনেই চ'লে এসো না—বেশ আনন্দে কয়েকটা দিন কাটানো যাবে। আমি বলি কী, অসুবিধে হ'লেও আমার আপন লোকের কাছেই থাকবো, সে-রকম আনন্দ কিছু নেই। কী বলো তোমরা?

আমি বললুম তা তো ঠিকই, তবে—

ভদ্রলোক আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তবে যদি হোটেলে কথা দিয়ে থাকো যে অতদিন থাকবে সে-কথা আলাদা। তাছাড়া, এক জায়গায় এসে উঠেছ, জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করাও হাঙ্গামা। আমি জোর করবো না—তোমরা ভেবে দ্যাখো, যা তোমাদের সুবিধে হয় তা-ই করবে।

হোটেলে আমরা কোনো কথা দিই-নি; আর জিনিষপত্রের মধ্যে তো বাক্স আর বিছানা; কিন্তু ভদ্রলোকের ভদ্রতায় এতদূর অভিভূত হয়ে পড়লুম যে সে-কথাটা জানানো হ'লো না। একটু বাদেই তিনি উঠলেন।

—আচ্ছা আমি চলি আজ, কাজ আছে। এসো তুমি একদিন আমার বাড়িতে, তোমার বন্ধুকে নিয়েই আসবে। একদিন কী বলছি, রোজই আসবে, যখন খুসি। আমি বাড়ী না থাকি, তোমার কাকীমা তো আছেন। তিনি তোমাকে দেখে কত সুখী হবেন। আজই এসো না বিকেলে—

—আজ বিকেলে তো আমরা......

—ও, বেড়াতে যাচ্ছ বুঝি? আচ্ছা কাল এসো, রোজ এসো! ভদ্রতা করে একদিন এসেই যে পালাবে তা নয়। সত্যি সত্যি আপনাদের মতো আসা যাওয়া করবে, কেমন?

এই কথা রইলো কিন্তু। আমার বাড়িটা তোমাদের ব'লে দিই—কলেজ ছাড়িয়ে বাঁ দিকে যে-রাস্তা গেছে, তার মুখেই। থ্রী ট্রীজ। তিনটে গাছ আছে কম্পাউণ্ডে। চেনা খুব সোজা। দরজায় নেম-প্লেটও আছে, এ. এন. দাস। অনাদিনাথ দাস আমার নাম। ঠিক আসবে তো?

আমি মাথা নেড়ে বললুম—আসবো।

—হ্যাঁ, ক'দিন আছো এখানে?

—আছি আর দিন সাতেক।

—কেন, থাকোনা কিছুদিন। এখানকার স্বাস্থ্য এ-সময়টায় খুব ভালো। কলেজ খুলতেও তো দেরী আছে বুঝি। আর ছাখে তো, খামকা তোমরা হোটেলে এসে উঠলে। আগে জানলে কি আর...আমার এখানেই তো বেশ থাকতে পারতে! করবে এক কাজ? চ'লে আসবে আমার ওখানে? হঠাৎ অত্যন্ত উৎসাহভরে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

আমি খুব মৃদুস্বরে আরম্ভ করলুম, তা...

অনাদিবাবু তৎক্ষণাৎ আবার বললেন, অবশ্যি তোমাদের অসুবিধে হ'তে পারে, সে তোমরা বুঝবে। তবে আমি বলি কী, যেখানে আপন লোক পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে একটু অসুবিধে ক'রেই না-হয় থাকলাম। ব'লে তিনি অত্যন্ত মন-খোলাভাবে হেসে উঠলেন। —আচ্ছা, আমি বলি এখন, তোমরা কাল আসছো তো? শুধু কাল নয়, রোজই আসা চাই।

পরের দিন সকালে আমি বললুম—সুমন্ত্র, চল্ আজ অনাদিবাবুর বাড়ী।

সুমন্ত্র কোটের উপর ক্যামেরা ঝুলিয়ে বললে—তুই যা তোর কাকাবাবুর ওখানে। আমি একটা জঙ্গলের ধারে চমৎকার ভিউ দেখে এসেছি, চললুম সেখানে।

চল্, চল্, চমৎকার খাওয়াবে দেখিস। হোটেলে খেয়ে-খেয়ে তো আধ-মরা হ'য়ে গেলুম।

—তোর তো দিন-রাত কেবল খাওয়ার চিন্তা। এখানে এসে খিদে ছাড়া আর কোন কথা তোর মুখে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। গ্লাটন!

একটু চুপ ক'রে থেকে আমি বললুম—ছাখ্ সুমন্ত্র, তোর সঙ্গে এসে আমি যে-রকম ভুগছি অন্য কেউ হলে পাগল হ'য়ে যেতো। ক্যামেরা কেনবার পর থেকে তুই আর মানুষ আছিস নাকি, আস্ত জানোয়ার ব'নে গেছিস। কাল ঐ ভদ্রলোক এলেন, এতক্ষণ বসলেন, এত সব চমৎকার আলাপ করলেন, তুই একটা কথা বললি না। কী ভাবলেন অনাদিবাবু!

সুমন্ত্র আমার কথা শুনতেই পায়নি এইভাবে বললে—রেড ফিল্টার দিয়ে ঐ দূরের পাহাড়গুলির ছবি যা একখানা নিয়েছি, দেখবি কলকাতায় গিয়ে!

না সত্যি সুমন্ত্রকে নিয়ে আর পারা যায় না! এক দণ্ড ওর সঙ্গে তিষ্ঠোয় কার সাধ্যি! বেড়াতে বেরিয়ে একটা কথা বলে না, আর কোনদিকে মন নেই, কেবল ইতিউতি যায়, ডালে ডালে পাখির বাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলো, ক্যামেরাটা একবার এদিক, একবার ওদিক, আধঘণ্টা কসরতের পর মাথা নেড়ে হয়তো বললে—নাঃ। তারপর হয়তো টেনে নিয়ে গেলো একটা জঙ্গলের মধ্যে, সেখানে একটা গাছ দেখে এসেছে, তার নাকি ছবি তুলতেই হবে। খিদে তেষ্টা ক্লান্তি এ-সবই ওর লুপ্ত হয়েছে, ওর সঙ্গে-সঙ্গে আমার একেবারে হয়রাণির একশেষ। কথা যখন বলবে তখন ঐ ছাইভস্ম ক্যামেরারই তথ্য বোঝাবে—নাঃ, সত্যি আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে।

সেদিন ওর সঙ্গে ছোটখাটো একটু ঝগড়াই হ'য়ে গেলো। আমি চ'টে গিয়ে বললুম —বেশ, তুমি যাও যেখানে খুসি, আমি চললুম অনাদিবাবুর ওখানে।

সুমন্ত্র হেসে বললে, আরে রাগ করো কেন? চলো চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

অনাদিবাবুর বাড়ী সহজেই খুঁজে পাওয়া গেলো। সহরের বাইরে নির্জন জায়গায় সুন্দর বাড়িটি। অনাদিবাবু বাড়িই ছিলেন, আমাদের দেখে মহাখুসি। খুব আদর ক'রে ঘরের ভিতর নিয়ে বসালেন। তারপর অনাদিবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ আমার কাকিমার সঙ্গেও পরিচয় হলো। তাঁরও কথাবার্ত্তা ভারি ভদ্র ও পরিপাটি।

কথায় কথায় জানা গেলো বাড়িটি ভদ্রলোকের নিজের; শিলঙে ও মধুপুরেও তাঁর বাড়ি আছে। কলকাতায় একটি 'ছোটখাটো আস্তানা' করবার ইচ্ছে আছে সামনের বছর। —কোনরকমে আমাদের বেঁচে থাকা আর কি, এ-সব কথার পর কাকিমা বললেন, ছোট্ট এই বাড়িটুকুতে যা হোক ক'রে থাকা। তা বাড়ি আমার ছোটো হ'তে পারে, কিন্তু অনেকেই তো বাড়িটিকে সুন্দর বলেন।

—হ্যাঁ, ভারি সুন্দর আপনার বাড়ি।

—তোমরা—তোমরা তো হোটেল থেকে পেট ভ'রে খেয়ে-দেয়েই বেরিয়েছো? কিছু খাবার...

সুমন্ত্রের কথা জানিনে, কিন্তু আমি তো এই স্বাস্থ্যকর জায়গায় এসে অবধি হোটেলের কৃপায় সর্ব্বদাই জঠরের জ্বালায় জ্বলছিলাম। সকালে একটু যা রুটি খেয়েছি টেরও পাইনি,

তার উপর এই মাইল দু'য়েক হেঁটে প্রচণ্ড খিদেও পেয়ে গেছল। তবু এতখানি ভদ্রতার বদলে ভদ্রতাই করতে হ'লো। শুষ্কস্বরে বললুম, না, না, ও-সব কিছু...

—অন্তত একটু চা? কাকিমার ভাবখানা যেন এই যে, আমাদের শত আপত্তি সত্ত্বেও চা একটু আমাদের খাওয়াবেনই।

—আচ্ছা, চা একটু খেতে পারি।

খানিক পরে দুটি ছোট পেয়ালায় ঈষদুষ্ণ যে তরল পদার্থটি এলো, তাকে চা ব'লে চিনতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়। ভদ্রতা ক'রে তাইতেই দু' এক চুমুক দিয়ে রেখে দিলুম।

কাকিমা জিজ্ঞেস করলেন—ও কী, খেলে না? ভাল হয়নি বুঝি?

বলতে হ'লো—আমরা একটু কড়া চা খাই।

—ঐ তো, আজকালকার ছেলেদের ঐ তো দোষ! বাব্বা কড়া চা খাও অসুখ করে না?

কই, করে না তো।

আগে জানলে আমিও না-হয় একটু বেশী চা ভিজোতাম। দ্যাখো চাগুলো ফেলা গেলো।

অনাদিবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—তা আর কী হয়েছে। আবার একটু ভালো করে এনে দাও না।

আমরা বললুম—না, না থাক্—

হ্যাঁ, এত বেশি চা খাওয়া ভালোও না, বললেন কাকিমা। আর একদিন এসো, ভালো ক'রে চা খাওয়াবো।

তারপর দুটো চারটে কথা ব'লে আমরা বিদায় নিলাম। অনাদিবাবু বার-বার বলতে লাগলেন—আবার আসা চাই কিন্তু। যে-ক'দিন আছো, রোজ আসবে। আমি ভেবেছিলাম সবাই একসঙ্গে আনন্দ ক'রে থাকবো, তা তো আর হ'লো না—যেটুকু তোমাদের পাই, সেটুকুই ভালো।

বাইরে এসেই সুমন্ত্র বললে—তোর কাকার বাড়ীতে এত খেয়েছি যে সারাদিনে আর কিছু না-খেলেও চলবে।

আমি ঝাঁ ক'রে চ'টে উঠে বললুম—ওঁদের সায়েবি চাল-চলন, ওঁরা অসময়ে অমন যা-তা কতগুলো খেতে দেন না। আর চা তো সকলে একরকম খায় না—তাতে কী হয়েছে? যেদিন নেমতন্ন ক'রে খাওয়াবে সেদিন দেখবি।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, আমার নব-আবিষ্কৃত কাকার আর দেখা নেই! সুমন্ত্রর ঠাট্টার খোঁচায় আমি যখন প্রায় আধ-মরা, তখন একদিন অনাদিবাবুকে আমাদের হোটেলের

দিকে আসতে দেখা গেলো। আমি চাঙ্গা হ'য়ে উঠলুম, দেখিস, আজ নিশ্চয়ই আমাদের খেতে বলবে। সেইজন্যেই আসছে।

অনাদিবাবু আমাদের দেখেই হা-হা ক'রে হেসে বললেন—বেশ লোক তোমরা, আর দেখাই নেই। আমাদের ওখানে থাকলে না, এলে না, খেলে না—কী অন্যায় তোমাদের বলো তো! আরে পর তো আর নই, না হয় দেখাশোনাই হয় না। একদিন তোমাদের না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ছি না, কবে খাবে বলো।

সেটা আমাদের বলার চাইতে ওঁর বলাই ভালো ভেবে চুপ করে রইলুম।

সুমন্ত্র বললে—পরশু আমরা চ'লে যাচ্ছি।

—অ্যাঁ! পরশু চ'লে যাচ্ছ! ফিরে যাচ্ছো কলকাতায়! আহা, আমরা যে ভাবছিলুম পরশুই তোমাদের খেতে বলবো। কী মুস্কিল দ্যাখো তো। একসঙ্গে ব'সে একদিন একটু আনন্দ ক'রে খাওয়াও কি হবে না? থাকো না আর দু'চারটে দিন অন্ততঃ। পরশু না গিয়ে তার পরের দিন যাও না! ভদ্রলোক রীতিমতো মিনতির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন।

বললুম—নাঃ, আর থাকা হয় না, পরশুই যাবো।

—কেন, ভালো লাগছে না আর হাজারিবাগ?

—ভালো লাগছে বেশ, তবে....

আসল কথা, তল্পি ফুরিয়েছে, হোটেলের মাশুল পরশুর পরে আর একদিনও চালাবার উপায় নেই, কিন্তু সে কথা বললে তো ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

—তাও তো বটে, অনাদিবাবু খুব বিচক্ষণভাবে বললেন, সব ঠিক ক'রে ফেলেছ, এখন আবার ওলোট পালোট করাও তো মুস্কিল। কী কাণ্ড বলো তো! কোথায় আমাদের ওখানে গিয়ে থাকবে—তা দূরের কথা, একদিন খেলে না পর্য্যন্ত। আমরা আরো ভাবছিলাম পরশু তোমাদের সঙ্গে ব'সে কত আনন্দ ক'রে খাবো—নাঃ, তোমরা সব মাটি ক'রে দিলে! যা-ই হোক্, এবারে চেনাশোনা হ'য়ে থাকলো তো—এর পরে যদি আসো খবর দিয়ো—হ্যাঁঃ, খবর দেবে কী, একেবারে আমাদের ওখানেই উঠবে—কেমন তো? আচ্ছা, আমি এখন আসি। কাল একবার বেড়াতে বেড়াতে যেয়ো না! আঃ, আর একটা দিন যদি থেকে যেতে...

আর একটা দিন থাকলুম না ব'লে আক্ষেপ করতে করতে অনাদিবাবু উঠলেন। তিনি যাওয়ার পর আমার কি সুমন্ত্রর কারো মুখে কথা নেই। ভদ্রতা কাকে বলে এতদিনে শিখলুম।

স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে

গভীর বনে এক ঋষি ধ্যানে বসে আছেন। সহসা আকাশ থেকে উজ্জ্বল এক আলোক ছটা পৃথিবীতে নামছে তিনি দেখতে পেলেন। ধ্যানে ঋষি জানতে পারলেন, তেত্রিশ দেবতার স্বর্গ থেকে পৃথিবীর বুকে এই আলোক ছটা নেমে আসছে।

ঋষির তপোবনের নিকটে একটি নীল হ্রদ ; সে হ্রদে অজস্র পদ্মকুঁড়ি। ঋষি দেখলেন, তেত্রিশ দেবতার স্বর্গের সে অপরূপ আলোক ছটা নীল হ্রদের একটি পদ্মকুঁড়িতে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হল। আশ্চর্য্য হয়ে ঋষি ভাবতে লাগলেন, এর অর্থ কী !

দিন যায়। পদ্মকুঁড়িগুলি ফোটে, শুকিয়ে ঝরে যায়। কেবল একটি পদ্মকুঁড়ি শুকোয় না, ঝরেও না। তাজা কোমল হয়ে দিনের পর দিন হ্রদের বুক সে আলো করে থাকে। একদিন ঋষি দেখলেন, সেই পদ্মকুঁড়িটি ফুটে উঠল আর তার থেকে বেরিয়ে এল, ছোট্ট একটি পরীর মত মেয়ে। ঋষি ভারী খুসী হয়ে তাকে নিজের কুঠীরে নিয়ে এলেন। নিজের মেয়ের মত তাকে তিনি লালন পালন করতে থাকলেন।

পদ্মকুঁড়ির মেয়ে দিনে দিনে অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠল। ঋষির তখন একটু ভাবনা হল। মন্ত্র পড়ে তিনি শূন্যে একটি স্ফটিক নির্ম্মিত রমনীয় দুর্গ রচনা করলেন তার জন্য। দুর্গটির নাম রাখলেন—স্ফটিক প্রাসাদ। শূন্যে স্ফটিক প্রাসাদ ভাসতে থাকল।

ঋষির তপোবনে কাঠুরেরা আসত কাঠ কাটতে। স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ের কথা তাদের মুখে মুখে চারিদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বারাণসীর এক তরুণ রাজপুত্রও সেকথা শুনতে পেলেন। মনে মনে রাজপুত্র পণ করলেন, যেমন করে হোক স্ফটিক প্রাসাদের মেয়েকে তিনি জয় করে নিয়ে আসবেন ও তাকে বিয়ে করবেন।

লোক লস্কর মন্ত্রী নিয়ে রাজপুত্র তাঁর অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। ঋষির কুঠীরে এসে ঋষিকে অভিবাদন করে রাজপুত্র তাঁর মনের ইচ্ছে নিবেদন করলেন। রাজপুত্রকে দেখে ঋষি খুসী হয়ে বললেন, রাজপুত্র, একটি সর্ত্ত আছে। তুমি যদি তার কি নাম বার করতে পার— তা হলেই তুমি তাকে বিয়ে করতে পারবে।

রাজপুত্র, রাজপুত্রের মন্ত্রী লোক লস্কর সকলে হাজার হাজার নাম বলতে থাকেন কিন্তু কোন নামই মেলে না! রাজপুত্র ভাবলেন, এত লোক লস্কর নিয়ে এ কাজে সিদ্ধ হওয়া যায় না, তিনি একা এ কাজ করবেন। তখন রাজপুত্র তাঁর লোক লস্কর মন্ত্রীকে তাঁর রাজধানীতে ফিরে যেতে বললেন। মন্ত্রী অনুরোধ করলেন যে রাজপুত্রও তাঁদের সঙ্গে ফিরে চলুন, কত বোঝালেন। কিন্তু রাজপুত্র কোন কথায় কান দিলেন না। তখন মন্ত্রী লোক লস্কর সকলেই চলে গেল। একা রইলেন রাজপুত্র তাঁর তাঁবুতে। বসে বসে রাজপুত্র ভাবেন, রোজ নতুন নতুন নাম বলেন, কিন্তু হায়, ঋষি রোজই মাথা নাড়েন।

এমনি করে বছর ঘুরে গেল, রাজপুত্র নিরাশ হয়ে পড়লেন। তিনি মনে মনে মনে ভাবলেন, এ মেয়েটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? আরো তো হাজার হাজার মেয়ে আছে। একটা পুরো বছর আমার বৃথা নষ্ট হল। এবার আমি দেশে ফিরব।

স্ফটিক প্রাসাদের নীচে দিয়ে রাজপুত্রের ফেরবার পথ। যেতে যেতে তিনি দেখতে পেলেন, স্ফটিক প্রাসাদের জানালায় স্ফটিক প্রাসাদের সেই মেয়ে। রাজপুত্র তাকে বললেন, তোমার নাম বার করতে পারলাম না, তাই আমি ফিরে যাচ্চি।

তখন স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে বললে, রাজপুত্র, নিরাশ হোয়ো না। আর একবার চেষ্টা কর। তেত্রিশ দেবতার রাজ্যে চিত্রলতা উদ্যানে একটি লতা আছে, সে লতার নাম—আশাবতী বা আশার লতা। এই আশাবতী লতার ফল থেকে এক ভারী চমৎকার রস তৈরী হয়। সে রস যে পান করে, সে এমন মুগ্ধ হয়, যে চারমাস সুখ-শয্যায় পরম সুখভোরে সে নিদ্রা যায়, স্বর্গের সব সুখ সে উপভোগ করে! কিন্তু হাজার বছরে কেবল মাত্র একবার আশাবতী লতা ফল ধরে। রাজপুত্র, আশাবতী লতার ফলের রস পান করতে দেবতার ছেলেরা হাজার বছর অপেক্ষা করতে থাকে।

স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে রাজপুত্র আবার তাঁর তাঁবুতে ফিরে আসেন। আবার এক বছর ভোর রোজই তিনি হাজার হাজার নাম বলেন, কিন্তু হায়, ঋষি কেবলই মাথা নাড়েন।

নিরাশ হয়ে রাজপুত্র ফেরবার আবার সঙ্কল্প করেন। স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে আবার তাঁকে দেখতে পেয়ে বললে, রাজপুত্র, নিরাশ হোয়ো না। আর একবার চেষ্টা কর। এক পাহাড়ে এক সারস পাখী থাকত। সে পাহাড়ে না ছিল জল, না ছিল মাছ। ছিল কেবল শুকনো শুকনো ঘাস। সারস ভাবত, আহা, যদি এখানে একটি পুকুর পাই তাহলে আর কোথাও না যাই। সারস প্রার্থনা করতে থাকল, যাতে তার ইচ্ছা পূরণ হয়। দেবতাদের দয়া হল, তাঁরা সে পাহাড়ের গায়ে একটি ঝরণা করে দিলেন। তখন সারস শুধু যে জলই পেল তা নয়,

স্ফূর্ত্তিতে মাছও খেতে পেলে প্রচুর। রাজপুত্র, আশার মত পৃথিবীতে আর কোন বস্তু নেই।

স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে রাজপুত্র আবার ফেরেন। কিন্তু মেয়েটির যে কি নাম, সে তিনি কিছুতেই বার করতে পারেন না। এমনি করে আবার বছর ভোর গেল। তখন হতাশায়, রাগে ও দুঃখে রাজপুত্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বললেন, না, আর নয়; এ নিয়ে আর যদি মাথা ঘামাই তাহলে ঠিক আমি পাগল হয়ে যাব। এই বোকা মেয়ের কথা শুনে কোন লাভ নেই। ফিরে যাই বারানসী।

ফিরে চলেছেন রাজপুত্র, এমন সময়ে স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে তাঁকে আবার ডাকল। রাজপুত্র রেগে বললেন, মিছামিছি আমাকে ডাকাডাকি করে আর লাভ কি তোমার—? কথায় তুমি আমার মন ভোলাও, আমাকে কেবল বৃথা আশা দাও। আমার জীবনের এতগুলি বছর আমি নষ্ট করলাম তোমার জন্য; আর তোমার নাম, আমার আশঙ্কা.....................

নাম বলেছ তুমি, রাজপুত্র! নাম বলেছ তুমি!—বলে স্ফটিক প্রাসাদের মেয়ে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

রাজপুত্র ছুটলেন ঋষির কুটীরে। ঋষিকে প্রণাম করে বললেন, তাঁর মেয়ের নাম আশঙ্কা।

রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করে ঋষি বললেন, ঠিক বলেছ, রাজপুত্র। এতদিনে তোমার চেষ্টা সফল হয়েছে। আমার মেয়েকে বিয়ে করে তুমি সুখী হও। জানো রাজপুত্র, নীল হ্রদের পদ্মকুঁড়ি থেকে যখন একদিন আমি তাকে ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, ভারী আশ্চর্য্য হয়েছিলাম আমি। কিন্তু মনে আমার সংশয় হয়েছিল কে এই স্বর্গের মেয়ে!—তাই আমি নাম দিয়েছিলাম তার—আশঙ্কা।

প্রাচীন ভারতীয় উপকথা
বি, আর. ভাগবতের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে

ধরণী সেন

আজব কথা শুনি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আজব দেশ এই যে কোল্‌কাতা
কেউ বল্‌লে, নেইকো ব্যাঙের ছাতা !
শোনো বলি সেদিন যখন ফোড়েপুকুর দিয়ে
আস্‌ছি হেঁটে বইপত্তর নিয়ে
হঠাৎ শুনি ঃ ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্‌—
আস্‌ছে কালো আস্‌ছে কোলা আস্‌ছে সোনা ব্যাঙ্‌ !
হাজার হাজার শেষ কি আছে তাদের,
ডাকের চোটে কাঁদ্‌ল ছেলে কাদের !
কোলার ছেলে ভোলার সেদিন বিয়ে
সক্কলে তাই চলেছে পথ দিয়ে
পষ্ট দেখি তা'দের মাথায় ছাতি !
এ-সব তো আর গল্প কথা নয়
নিজের দেখা, ভুল কখনো হয় ?
তিন-ঘণ্টা আট্‌কা পড়ে গেলুম
আট্‌টা-কুড়ি যখন বাড়ী এলুম !
আজো মনে পড়্‌ছে তাদের ডাক ঃ
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ্‌
মস্ত সে এক গ্যাঙ্‌
চল্‌ছে কালো চল্‌ছে কোলা চল্‌ছে সোনা ব্যাঙ্‌ !

আজব দেশ এই যে কোল্‌কাতা
শুনব তবু, হয় না ব্যাঙের ছাতা !

বাঁচি যদি শুনতে কত হবে
কেবলি ভয় বল্‌বে কে যে কবে ঃ
ঘোড়ায় নাকি পাড়ে নাকো ডিম—
দুর্ভাবনায় হাত-পা হিম্‌সিম্‌।
ছোটমামা বল্‌বে কবে ঃ
"এই সন্তু! রোশ্‌—
চাঁদের ভেতর নেইকো খরগোস্‌!
ওখানেতে চাঁদের বুড়ি চর্‌কা কাটে না..."
বল্‌ব, "বেশ
তক্ক আমি কর্‌তে চাই না।"

অশনি, কুলিশ ও মেঘগর্জ্জন

শ্রীঅবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শীঘ্রই ঝড় বৃষ্টি হ'বার সম্ভাবনা। বাব্‌লা, টুকু, খুকু কল্‌কাতা বনাম মোহনবাগান খেলা দেখার জন্য প্রস্তুত কিন্তু আকাশের অবস্থা দেখে তাদের বুড়ো দাদু একটু ভীত।

"খেলা দেখ্‌তে যাওয়া মানে বিষ্টিতে ভেজা"—এই ব'লে দাদু তামাকে ফুঁ দিতে লাগ্‌লে, ছেলেরা তাঁকে ঘিরে বস্‌ল।

বাব্‌লা—আচ্ছা দাদু, তুমি তো বেশ বলে দিলে খেলা দেখ্‌তে যাওয়া মানে বিষ্টিতে ভেজা—তুমি কেমন করে জান্‌লে যে বৃষ্টি হবে?

দাদু—ঐ ছাখ আকাশের পশ্চিমদিকে কালো কালো মেঘ আস্তে আস্তে সমস্ত আকাশ ঘিরে ফেলেচে বাতাসেরও তেমন বেগ নেই। এই সব দেখেই তো বলি বৃষ্টি হবে।

টুকু—(সুরে —মেঘের ওপর মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে।)

বাব্‌লা—(ধমক দিয়ে) থাম্ তোর ঐ ষাঁড়ের গলা নিয়ে আর গাইতে হবে না।

টুকু—বাঃ রে ম্যাচ দেখ্‌তে যেতে পেলাম না বলে কি গানও গাইবো না।

বাব্‌লা—না গান গাইতে পাবে না।

টুকু—আচ্ছা দাদু ম্যাচ্ দেখ্‌তে যেতে পেলাম না—গান গাইতে বারণ, তাহ'লে এই মেঘলা দিনে কি করি।

দাদু—কেন, বসে বসে তোরা গল্প কর না।?

বাব্‌লা—(দাদু বেশ উপদেশ দিলে। কিন্তু গল্প বলবে কে?) তুমিই না হয় এই বাদ্‌লা দিনে একটা গল্প বলো।

দাদু—বেশ, কিসের গল্প বোল্‌বো বল্?

বাব্‌লা—ভূতের গল্প!

খুকু—না দাদু ভূতের গল্প না—আমার বড্ড ভয় করে। তুমি রাজারাণীর গল্প বলো।

টুকু—হ্যাঁ দাদু তুমি বলো,—

এম্‌নিতর মেঘ করেছে
সারা আকাশ ব্যেপে;
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার
বুকের পরে নাচে,
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেল কার কাছে?

দাদু—না, আজ তোদের এই বাদ্‌লা দিনেরই একটা গল্প বোলবো তবে তাতে রাজপুত্তুরও নেই আর সুয়োরাণী দুয়োরাণীও নেই। তবে ঐ রাজার জাতেরই এক বৈজ্ঞানিকের কথা বোলবো। ১৭৪৯ সালে এমনি বাদ্‌লা দিনে বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিন শিল্কের রুমালের ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে এনেছিলেন।

বাব্‌লা—দাদু বেন্‌জামিন কে ছিল, সে কি করতো সে সব তো কিছুই বল্‌লে না।

দাদু—বল্‌চি রে ভাই বলচি। ১৭০৬ খৃঃ আমেরিকায় বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিনের জন্ম। ছোট বয়স থেকেই তাঁর সব জিনিষ কেন হয়, কি করে হয়, এইসব জান্‌বার প্রবল ইচ্ছে হয়। প্রথম বয়সে তিনি ইংলণ্ডে এক মুদ্রাকরের সহকারী হয়ে কাজ করেন। একদিন বস্‌টন সহরে বৈজ্ঞানিক ডক্টর স্পেনসকে (Spence) বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করতে দেখে তাঁর কৌতূহল হোলো। এর পরই ১৭৪৮ সালে তিনি তাঁর মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির কাজ ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করে দিলেন।

খুকু—দাদু বিদ্যুৎ কি?

হঠাৎ আকাশে বারবার বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠলে বুড়ো দাদু মেঘের দিকে আঙুল দিয়ে ছেলেদের দেখিয়ে বল্‌লে,—ঐ দ্যাখ্‌ মেঘের গায়ে সাদা আঁকা বাঁকা (বিজুলী)—ওরই নাম বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ যে শুধু মেঘের গায়েই থাকে তা নয়, আমরাও ঐ রকম বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারি। বহুদিন আগে গ্রীস দেশে থেল্‌স্‌ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্ফটিক (amber) ও পশম একসঙ্গে ঘসে দেখ্‌তে পান যে স্ফটিক ছোট ছোট হাল্কা জিনিষকে (এই যেমন কাগজের টুক্‌রোকে) নিজের কাছে টেনে আনে। স্ফটিকের এই গুণ কি করে হয় তা তিনি বুঝ্‌তে পারেননি। তারপর কতদিন কেটে গেল কিন্তু এ বিষয়ে আর কোন চর্চ্চা হোল না। ইংলণ্ডের এলিজাবেথ যখন রাণী ছিলেন তখন তাঁর চিকিৎসক গিলবার্ট প্রমাণ করেন যে ঘষা পেলে গন্ধক, গালা, কাচ, মোম,

রবার পশম প্রভৃতি অনেক জিনিষই ঐ পশম দিয়ে ঘষা স্ফটিকের মতো হাল্কা কাগজের টুক্‌রোগুলো টান্‌তে পারে। এই শক্তিকে গিলবার্ট সাহেবই প্রথম নাম দেন বৈদ্যুতিক শক্তি। আমরা যখন এবনাইটের চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়াই তখন চুলে একরকম শব্দ শুন্‌তে পাই। এই সময় যদি ঐ চিরুণিকে ছোট ছোট পাতলা কাগজের টুক্‌রোর কাছে আনা যায় তা হোলে দেখ্‌বে যে কাগজের টুকরোগুলো চিরুণির দিকে লাফিয়ে ওঠে। চিরুণি শুক্‌নো চুলে ঘষা পেয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে।

বাব্‌লা—শুক্‌নো চুলে ঘষা পেলে এব্‌নাইটের চিরুণি যেমন বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে, ভিজে চুলে তেমন করে না কেন আর শীতকালেই বা কেন মাথা আঁচড়াবার সময় চুলের মধ্যে শব্দ হয়?

দাদু—পৃথিবীতে দু রকম জিনিষ আছে। কাচ, গন্ধক, এবনাইট, পোরসেলিন, গালা, রেশম, পশম প্রভৃতি একশ্রেণীর, আর জল, তামা লোহা, রূপো, মাটি, মানুষের দেহ প্রভৃতি আর এক শ্রেণীর ষ্টিফেন গ্রে নামে এক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক প্রথম প্রমাণ করেন যে ঘষা পেলে ঐ প্রথম শ্রেণীর জিনিষগুলো যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে তা ঐ জিনিষের ভিতর দিয়ে চলা ফেরা করতে পারে না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিষগুলিতে উৎপন্ন হোলেই তা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রে সাহেব প্রথম শ্রেণীর কাচ, গন্ধক, রেশম প্রভৃতি জিনিষগুলির নাম দেন অপরিচালক থাকে ইংরাজিতে Non-conductor বা Insulator বলা হয়। টেলিগ্রাফ খুঁটিতে চীনে মাটির ছোট ছোট টুপি লাগানো আছে দেখেচ বোধ হয়। ঐ টুপিগুলি insulator তার দিয়ে যখন বিদ্যুৎ চলাফেরা করে তখন সেটা মাটিতে পালাতে পারে না। গ্রে সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিষকে অর্থাৎ তামা, রূপা প্রভৃতি ধাতুর জিনিষ জল, মানুষের দেহ, মাটি ইত্যাদিকে বিদ্যুৎ পরিচালক (conductor) নাম দেন। গ্রে সাহেব 'চেষ্টার হাউসে" একটি ছেলেকে রেশমের দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে তার পায়ের কাছে কাচের নল ঘষেন। কাচ ঘষা পেয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে আর ঐ বিদ্যুৎ যে ছেলেটির দেহে চলা ফেরা করে তা গ্রে সাহেব ছেলেটির মুখের কাছে পিত্তলের পাত ধরে দেখিয়ে দেন। তিনি দেখান যে পিত্তলের পাত ছেলেটির মুখের কাছে ধর্‌লেই সেগুলি লাফিয়ে ওঠে। জল ও জলীয় বাষ্প বিদ্যুৎকে পরিচালনা করে এইজন্যে ভিজে চুলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হলেও সেটা আমাদের দেহ দিয়ে পৃথিবীতে পালিয়ে যায় কিন্তু শীতকালে যখন বাতাসের জলীয় অংশ খুব কম তখন শুক্‌নো চুলে চিরুণি দিয়ে মাথা আঁচড়াবার সময় যে বিদ্যুত সৃষ্টি হয় তা পালিয়ে যেতে পারে না তাই তখন বিদ্যুতের ছোট স্ফুলিঙ্গ চুলের মধ্যে হতে থাকে আর আমরা তখনই শব্দ শুনতে পাই। আকাশেও যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সেগুলিও বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ (Electric spark)।

টুকু—হ্যাঁ দাদু ঐ আকাশের বিদ্যুৎ আর এই ঘষে যে বিদ্যুৎ হয় এ-দুটোই কি এক?

দাদু—হ্যাঁ রে ভাই ওদুটোই এক। আর এই কথাই বেনজামিন প্রমাণ করেন। তখনকার মানুষ ভাব্‌তো যে আকাশে মেঘে আগুন লাগ্‌লেই বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের সেদিনকার পণ্ডিতেরা আর গ্রীক্‌রা ভাবতো যে আকাশে দেবতাদের সঙ্গে অসুরের লড়াই হোলেই আকাশের

ঘন কালো ঢেউ খেলানো মেঘের গায়ে আগুন লেগে যায়। দেবরাজ ইন্দ্রের নাম কে না জানে। এক সময় বৃত্র নামে এক অসুর সকল দেবতাদের হারিয়ে দিয়ে স্বর্গ দখল করে। বৃত্রের পত্নী ঐন্দ্রিলা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীকে দাসী করবার জন্যে ধরে নিয়ে আসেন। তারপরই দেবতা ও দানবে খুব লড়াই বাধে। এই যুদ্ধে বৃত্রকে বধ করবার জন্যে বিশ্বকর্ম্মা দধীচি মুনির হাড়ের এক অস্ত্র তৈরী করেন। তার নাম বজ্র। ঐ বজ্রাঘাতেই বৃত্রের পতন হয়। এই হচ্ছে আমাদের পুরাণের কথা। বড় হোয়ে কবি হেমচন্দ্রের বৃত্র সংহার বই যখন পড়বি তখন বুঝতে পারবি সে কি ভীষণ যুদ্ধ। গ্রীকরাও এই রকম একটা কাল্পনিক উপাখ্যান বিশ্বাস করতো। বেনজামিনের ইচ্ছা হোলো আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে আনবার। বেনজামিন স্থির করলেন যে উঁচু একটা বাড়ির ওপর ধাতুর শিক লাগিয়ে মেঘের বিদ্যুৎকে মাটিতে আনবেন। কিন্তু ফিলাডেলফিয়া সহরের কোন বাড়িই তখন বেশী উঁচু ছিলো না। তিনি যখন এই কল্পনা করছিলেন সেই সময়ে প্যারী নহরের উপকূলে এক গ্রামে দালিবার্ড (Dalibard) নামে একজন—শুধু ৪০ ফিট উঁচু থেকে মেঘের বিদ্যুৎকে মাটিতে আনেন। এই খবর পৃথিবীময় রাষ্ট্র হোয়ে পড়ে—বেনজামিনও সংবাদ পান তবে তিনি সেটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন না। তারপর তিনি রেশমি রুমালের একটা ঘুড়ি তৈরী করে ঘুড়ির গায়ে পাতলা লোহার শিক লাগিয়ে দিলেন। আর তার সঙ্গে ঘুড়ির সুতোও জোড়া হোলো। এই রকম ঘুড়ি নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন কবে মেঘ দেখা দেবে। অনেকে ভাবলে লোকটার বুঝি মাথা খারাপ। কিন্তু বেনজামিন নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত আর ভাবেন কখন আকাশে মেঘ উঠবে। দিনের পর দিন কেটে যায়, মেঘ আর দেখা দেয় না। শেষে একদিন নীলাকাশ কালো করে মেঘ দেখা দিলো।

টুকু—হাঁ দাদু—

সেদিনো কি এমনিতরো মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বাজ বিজুলী দিচ্ছিলো কি হানা?

দাদু—হ্যাঁ ভাই সেদিনও গাঢ় কালো মেঘ আকাশে দেখা দিলো। বেনজামিন সময় বুঝে ঘুড়ি উড়িয়ে দিলেন। বাতাসে ঘুড়ি উড়তে লাগলো। তখন তিনি লাটায়ের সুতোর শেষে এক টুকরো লোহা বেঁধে দিলেন। কালো কালো মেঘ আকাশ জুড়ে এ'লো কিন্তু কোন ফলই ফল্‌ল না। শেষে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করলে ঘুড়ির সুতো গেল ভিজে এমন সময় সুতোয় লাগানো লোহা থেকে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ পুট্ পুট্ শব্দ করে তাঁর আঙ্গুলে আঘাত করতে লাগলো। ফ্রেঙ্কলিনের নাম জগতময় ছড়িয়ে পড়লো। আর ছুঁচলো লোহার শিক খাড়া করে' আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে নামিয়ে আনতে পৃথিবীর লোকে উঠে পড়ে লাগলো। (এই ছুঁচলো শিককে ইংরাজিতে Lightning Conductor বলা হয়। আমরা বোল্‌বো বজ্র-বারক।) বড় বড় বাড়ীর ছাতের ওপর ছুঁচলো শিক্ লাগানো থাকে, এইসবগুলো বজ্রবারক।

বাব্‌লা—বজ্রবারক বাড়ির ওপর কেনো লাগান হয় ?

দাদু—আকাশে মেঘে যখন বিদ্যুতে পরিপূর্ণ হয় তখন আমাদের পৃথিবী ও মেঘে বেশ একটা টানাটানি চলে, যার ফলে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ভেজা বাতাসের মধ্যে দিয়ে অনায়াসে মাটিতে এসে পড়ে। এই স্ফুলিঙ্গকেই আমরা বাজ বলি। যখন ভিজে বাতাসে বিদ্যুতের যাতায়াতে পথ পরিষ্কার আর খুব সোজা হোয়ে পড়ে তখন মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যে অল্প রাস্তা যেটা সেইটেই বিদ্যুৎ ধরে চলে। এই জন্যে উঁচু মন্দিরে কিম্বা উঁচু গাছেই প্রায় বাজ পড়ে। বাড়ির মধ্যে সব থেকে উঁচু জায়গার ওপর বজ্রবারক লাগানো থাকে সুতরাং মেঘের বিদ্যুৎ সহজেই ঐ পরিচালক ধাতুর ছুঁচোল মুখের দিকে ছুটে আসে আর একটু একটু করে তার শক্তি নষ্ট হয়। কাজেই ঐ রকম বাড়ির কাছে বাজ পড়ে না।

বাব্‌লা—বজ্রবারক বাড়িতে লাগাতে হোলে, কি কি জিনিষের দরকার ?

দাদু—একটা ছুঁচ্‌লো লোহার শিক্, তামার তার আর তামার পাত (৩ বর্গ ফুটের কম নয়), এই তিন্‌টে জিনিষ দরকার। বাড়ির ছাতে সকলের উঁচু জায়গায় লোহার শিক্‌টা লাগাতে হয়। তামার তার ঐ শিকের গোড়ায় জুড়ে দিয়ে বাড়ির জলের জল দিয়ে কিম্বা দেয়ালের কোন্ দিয়ে বাড়ির তলায় নিয়ে আসা হয়। তারপর ঐ তারের শেষভাগে তামার পাত জুড়ে তলাকার ভেজা মাটির মধ্যে (কূয়ার মধ্যে সাধারণতঃ পোঁতা দরকার) পোঁতা হয়। এই বজ্রবারকের (ছবি দেখ) ওপরকার দিক্‌টা যত বেশী বিভক্ত কোরে বাড়ির ছাদে লাগানো যায় ততই ভাল, কারণ তাহ'লে কালো মেঘের বিদ্যুৎ ঘনীভূত হোতে পারে না আর বাড়ীতে বাজ পড়বার আশঙ্কাও কম হোয়ে পড়ে।
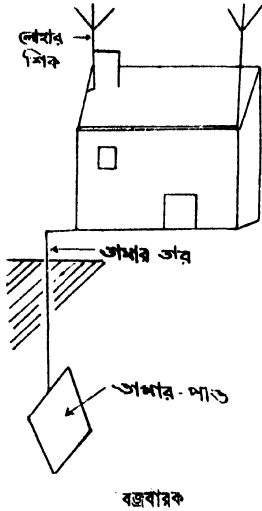
বজ্রবারক

বাব্‌লা—হ্যাঁ দাদু মেঘ ডাকে কেন ?

দাদু—দুটো মেঘের মধ্যে যখন বিদ্যুতের চলাচল হয় তখনই ঐ বিদ্যুতের পথটা গরম হোয়ে জ্বলে ওঠে আর বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ এধার ওধার ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করে তখনি আমরা বলি বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখন বিদ্যুতের পথের বাতাস গরমে হাল্কা হয়ে ওপরে ওঠে যায়। এই সময় চারিদিককার ঠাণ্ডা বাতাস ঐ গরম বাতাসের স্থান অধিকার করবার জন্যে ছুটে আসে। এই ছুটোছুটিতে যে শব্দ হয় তাকেই আমরা বলি মেঘডাকা।

খুকু—দাদু কখন কখন আমরা কেবল একবার মেঘডাকা শুনি, আবার কখন কখন গুড় গুড় মেঘের আওয়াজ শুন্‌তে পাই। এরকম হয় কেন ?

দাদু—বিদ্যুৎ যখন সোজা পথে চলে তখনি আমরা একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শুন্‌তে পাই কিন্তু বিদ্যুৎ যখন এঁকে বেঁকে চমকে ওঠে তখন গুড়গুড় শব্দ শুন্‌তে পাই। বিদ্যুৎ যখন চম্‌কায় তখন বাতাসের

আলোড়নে যে শব্দ হয়, সেটা মেঘে ধাক্কা লেগে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। এই জন্যে তখন গুড়গুড় শব্দ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়।

টুকু—দাদু মেঘ ডাকলে আমার বড্ড ভয় করে, তার ওপর বাজ পড়লে তো কথাই নেই। আচ্ছা দাদু, ঝড়ের সময় যখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে আর মেঘ ডাকতে থাকে তখন আমাদের কি করা উচিত?

দাদু—ঝড়ের সময় বুঝে কাজ করতে হবে। রাতে বিছানায় ঘুমোচ্ছ এমন সময় যদি খুব মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে তাহলে বিছানা ছেড়ে উঠো না। বিছানাতেই শুয়ে থাকবে। দিনের বেলা ঐ রকম ঝড় আরম্ভ হলে, ঘরের জানালা বন্ধ করে দেবে কিন্তু দরোজা বন্ধ কোরো না অথবা উনন ও দরজার মধ্যে বসে থেকো না। এ-গুলো হলো ঘরের কথা কিন্তু বেড়াতে বার হয়েছো এমন সময় আকাশ কালো করে যদি ঝড় আসে আর মাঠের মাঝখানে তুমি আছো তাহলে মাটিতে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ঐ রকম সময় কখনও ছাতা ব্যবহার করবে না—উঁচু গাছ তলায় বা তার নিকটে দাঁড়াবে না—তারের বেড়ার কাছেও দাঁড়ান বিপজ্জনক।

টুকু—দাদু, আজ এই পর্য্যন্তই থাক্ আর একদিন বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বোলো—বড্ড খিদে পাচ্ছে আর রাতও হয়ে এসেছে দেখ।

দাদু—নিশ্চয়, এবার তোদের ছুটি।
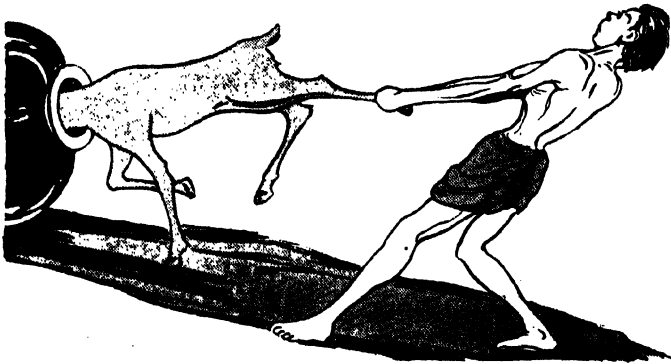
এনাটোলিয়াতে শিকারীরা এক মেয়ে টার্জ্জনএর দেখা পেয়েছে। গভীর জঙ্গলে একা একা সে হিংস্র বাঘ ভাল্লুকের সঙ্গে নির্ব্বিবাদে নাকি বাস করে। তার গায়ের রং ঝড় বৃষ্টি রোদ্দুরে কালো হয়ে গিয়েছে। কোন কথা কোনো ভাষা সে বলতে পারে না। শোনা যায়, অনেকদিন আগে দুটি মেয়ে তাদের গ্রাম থেকে হারিয়ে যায়। শিকারীরা বলে, তাদের একজন আজকের এই টার্জ্জন। একটি মা-ভাল্লুক নাকি এই মানুষের মেয়েটিকে লালন পালন করেছে।

* * * *

প্রস্তরযুগের ম্যামথ-হাতি পৃথিবী থেকে সহস্র বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সাই-বেরিয়ার বরফের তলা থেকেই প্রথম ম্যামথ-হাতির দেহ পাওয়া যায়। বরফের তলায় চাপা পড়ার দরুণ পুরো দেহটা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সাইবেরিয়ার কোন কোন লোকের ধারণা, এই ম্যামথ-হাতি আজও বেঁচে আছে! মাটির নীচে এই ম্যামথ যখন চলাফেরা করে তখন ভূমিকম্প হয়। তারা নাকি মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কাটে। সাইবেরিয়ার লোকেরা বলে, ম্যামথরা কখনও ওপরে আসে না, কারণ সূর্য্যের মুখ দেখলেই তাদের নাকি মৃত্যু অনিবার্য্য।

* * * *

একরকম অদ্ভুত মাকড়সা আছে যারা ঠিক পিঁপড়ের মত থাকে, খায়, চলাফেরা করে। পিঁপড়ের সব কিছু তারা আশ্চর্য্যভাবে অনুকরণ করে। তারা দেখতেও অনেকটা পিঁপড়ের মত। এ সম্বন্ধে গবেষণা করছেন, লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর—কর্ম্মনারায়ণ বাহল।

* * * *

ইউরোপের পঁচাত্তর জনের বেশী গণক জ্যোতিষী, ঋষি, ফকির প্রভৃতি একবার ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে, ৯৯৯ খৃষ্টাব্দের শেষে এ পৃথিবী ধ্বংস হবে। যেদিন ১০০০ খৃষ্টাব্দ পড়ল, সেদিন ইউরোপের লোকেরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল আর নানা জায়গায় উৎসব হয়েছিল।

* * * *

চীনদেশেই নাকি সবপ্রথম ফুটবল খেলার প্রচলন হয়। কিন্তু সে ফুটবল আর খেলার নিয়ম একেবারেই অন্য রকম ছিল। চামড়ার মধ্যে খড়কুটো ভর্ত্তি ক'রে তাকে গোলগাল ক'রে ফুটবল তৈরী হত। প্রায় ৫০ গজ ব্যবধানে তুটি গোলপোষ্ট মাঠের শেষে লাগান হত—আর মধ্যিখানে দড়ি বা লম্বা কাপড় বাঁধা থাকত। গোল দিতে গেলে তার ওপর দিয়ে বল চালান করতে হত। খেলার শেষে জয়ী দলকে নানা রকম সুখাদ্য খাওয়ান হত আর বিজয়ী দলের কাপ্তেনের মাথায় ঘন ঘন চাঁটি পড়ত।

* * * *

এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন, সহস্র বছর পরে যে মানুষজাতির আবির্ভাব হবে তাদের মাথার ঠিক ওপরে এক রকম দুর্বিণ-চোখ থাকবে, যাতে করে সে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র সব পর্য্যবেক্ষণ করতে পারবে। তাদের মাথার পেছন দিকেও একজোড়া চোখ থাকবে, সামনে চলবার সময় তাদের পেছনে কি ঘটছে, তারা "স্বচক্ষে" দেখতে পাবে।

একপাতার গল্প

ভাড়াটে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পায়রা-বৌএর সঙ্গে চড়ুই গিন্নির সেদিন ভারী ঝগড়া হয়ে গেল।

সত্যি কথা বলতে কি, চড়ুই গিন্নির তেমন দোষ নেই। অনেক দিন ধরে সয়ে সয়ে না সে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়েছে! আর মিছেও ত কিছু বলেনি। গেরস্থালী করে যেখানে বাস করতে হবে সেখানে অমন নোংরা করলে চলে! বেদে বাউণ্ডুলেরাও যে এর চেয়ে পরিস্কার। তাছাড়া সরাইখানা ত নয় যে আজ আছি কাল নেই! যা কে বলে চোদ্দপুরুষের আস্তানা।

তা চোদ্দপুরুষ সত্যিই হল বই কি চড়ুইদের। পায়রা-বৌ ত সে দিনের, সে আর জানবে কোথা থেকে যে এই পোড়ো দালান একদিন গমগম করত মানুষ জনে, ঝলমল করত আলোয়।

চড়ুইদেরও সে সুখের দিন আর নেই। তখন কি বনে বাদাড়ে ফড়িংটা কেঁচোটা খুঁজে বেড়াতে হত! অত বড় সংসারের এঁটো কাঁটা খেয়ে কত কাক কুকুরেরই ত জন্ম কেটে গেছে, চড়ুইদের ত কথাই নেই, থালা থালা বড়ি, ছালা ছালা চাল ডাল খেয়ে ফুরোনই যায় না।

চড়ুইগিন্নী তাই বড় দুঃখে ভাবছে—আহা তারা যদি আবার আসে! আবার যদি ভাঙা ভিটেয় সন্ধ্যে প্রদীপ জ্বলে ওঠে।

চড়ুইগিন্নির মুখের কথা অমন করে ফলবে কে জানত।

তারা সত্যিই এল তার পরদিন থেকে। শাবল কোদাল নিয়ে গোড়ায় এল মজুর। পোড়ো দালান ভেঙে চুরে তারা মাটিতে মিশিয়ে দিলে। তারপর এল রাজমিস্ত্রি আর হ্যাট কোট পরা ইঞ্জিনিয়ার, এল লোহালক্কর সিমেণ্ট সুরকী চুন। নতুন করে বাড়ি তৈরী হ'ল।

কিন্তু কই, সে বাড়ীতে চড়ুইএর বাসার ফোকর কোথায়! শুধু পাথরের মত শক্ত পাকা দেওয়াল, আর ছাদ।

সেখানে বারান্দায় সারি সারি খাঁচায় ঝোলে রং বেরংএর বিদেশী পাখী আর বিনি শেকড় বাহারী গাছ। পায়রারা সেখানে পাত্তা পায় না বটে কিন্তু চড়ুইএরও সেখানে জায়গা নেই।

প্রতিহিংসা

শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যায়

বেনিফেসিয়োর এক প্রান্তে ছোট্ট কুটিরে পায়োলো শ্যাভেবিনির বিধবা পত্নী তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাস করতো। সমস্ত সহরটা সমুদ্রের জলে ঝুঁকে-পড়া একটা অংশের ওপর অবস্থিত —যেখান থেকে অদূরবর্ত্তী সারডিনিয়ার পর্ব্বতসঙ্কুল তটভূমি দেখা যেত। যে দিকে চোখ যায় কেবল জলের ওপরে ভেসে থাকা কালো কালো পাহাড়ের চূড়া, আর তাদের গায়ের-লাগা সাদা সাদা ফেনা-গুলো যখন হাওয়ায় এদিক ওদিক উড়ে যেতো, মনে হোতো এক টুকরা সাদা কাপড় যেন হাওয়ায় উড়ছে।

বিধবার বাড়ীটা সমুদ্রের ঠিক ধারেই। জানালা খুলে বাইরের দিকে তাকালেই চোখে পড়তো ঢেউয়ের তাণ্ডব আর কানে আসত জলের গর্জ্জন। সেখানে তার ছেলে অ্যান্তয়েন্ ছাড়া আর একজন অধিবাসী ছিল। সে হচ্ছে তার প্রিয় কুকুর শেমিল্যান্তে, শিপ-ডগ্ জাতীয় এক বিরাট বলশালী জন্তু।

একদিন সন্ধ্যাবেলা নিকোলাস্ র‍্যাভোলাতি বলে একজন লোক অকারণে অন্যায়ভাবে অ্যান্তয়েন্‌কে ছোরা মারল। তারপর সে সেই রাত্রেই পালিয়ে গেল সারডিনিয়ায়।

পাড়ার লোকেরা অ্যান্তয়েনের মৃতদেহ তুলে এনে তার মার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল। বৃদ্ধা পুত্রের মৃতদেহ দেখে একবারও কেঁদে উঠলো না, শুধু চুপ করে ছেলের রক্তাক্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ছেলের মৃতদেহ স্পর্শ করে বৃদ্ধা প্রতিজ্ঞা করলে তার পুত্রহন্তার ওপর প্রতিশোধ নেবার। সে সবাইকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বলে নিজের প্রিয় কুকুরটিকে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। কুকুরটা সবই বুঝতে পেরেছিল। সে তার প্রভুর দিকে একবার চেয়ে কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করে উঠলো। অসহায় বৃদ্ধা চুপ করে চেয়ে রইলো ছেলের দিকে—এতক্ষণে তার চোখ দিয়ে অবিরলধারে জল পড়তে লাগলো।

তারপরে বৃদ্ধা ছেলেকে বলছিলো—ভয় নেই, আমি প্রতিশোধ নেবো, নিশ্চয়ই এর শোধ নেবো। তুমি ঘুমোও, নিশ্চিন্তে ঘুমোও, আমি তোমার রক্তপাতের প্রতিশোধ নেবো রক্ত দিয়ে। তোমাকে আমার কথা দিচ্ছি, আমার কথার কখনও নড়চড় হয় না।

আস্তে আস্তে মাথা নীচু করে সে তার ছেলের হিমশীতল ঠোঁটে চুমু খেলে।

কুকুরটা আবার কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করে উঠলো।

পরদিন সকালে অ্যান্তয়েনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়ে গেল। তারপর ক্রমে ক্রমে লোক তার নামও ভুলে গেল। অ্যান্তয়েনের নিজের কোন ভাই কোনো আত্মীয় ছিল না। তার বৃদ্ধা মা কেবল রইল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য।

সকাল সন্ধ্যা সে সমুদ্রের ওপারের গ্রামের দিকে চেয়ে থাকতো। ঐ ত ওপারে লঙ্গোসারদো—ছোট্ট গ্রাম। বৃদ্ধা খবর নিয়ে জানতে পেরেছিলো নিকোলাস র‍্যাভোলাতি ঐখানেই আছে।

সমস্তদিন সে সমুদ্রপারের সেই গ্রামটার দিকে চেয়ে থাকতো। মনে তার শান্তি ছিল না। শেমিল্যানতেও যেন সব বুঝতো, কিন্তু পশু সে, তার করবারই বা কি আছে?

একদিন রাত্রে হঠাৎ বৃদ্ধার মাথায় একটা মতলব এলো,—পৈশাচিক আনন্দে তার মনটা ভরে উঠলো। বাকী রাতটা সে বসে বসে ভালো করে ভাবতে লাগলো। সকালে সে প্রথমেই গির্জ্জায় গেলো। সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের কাছে তার কাতর আবেদন জানালে—'আমার হৃদয়ে, আমার মনে বল দাও, হে গরীবের ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য কর, হে দয়াময়, আমাকে আমার পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্যে সাহায্য কর।'

তারপর সে বাড়ী ফিরে এলো। বাড়ী এসে কুকুরটাকে ঘরের ঠিক সামনেই একটা খুঁটিতে বেঁধে রেখে, জানলা দিয়ে সারডিনিয়ার তটভূমির দিকে চেয়ে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে লাগলো।

কুকুরটা সমস্তদিন সমস্তরাত্রি চীৎকার করলে। পরদিন সকালে বৃদ্ধা তাকে শুধু জল খেতে দিলে। আরেকদিন গেলো, কুকুরটা কোন খাদ্য পেলে না, শুধু পেলে জল। চীৎকার করে করে আর ক্ষিদের জ্বালায় ক্লান্ত হ'য়ে চুপ করে সে শুয়ে পড়লো। তারপর দিন কুকুরটা আবার মরিয়া হয়ে চেঁচাতে লাগলো—কিন্তু সেদিনও সে জল ছাড়া আর কিছুই খেতে পেলে না। ক্ষিদের জ্বালায় কুকুরটা প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলো। আরেকটা রাত্রি সেই রকম ভাবেই কেটে গেলো।

তারপরদিন সকালবেলায় বৃদ্ধা তার এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে দুআঁটি খড় চেয়ে নিয়ে এলো। তারপর তার স্বামীর কতকগুলো পুরোণো জামাকাপড় নিয়ে তার মধ্যে খড় পুরে একটা মানুষের মত মূর্ত্তি তৈরী করলে। তারপর কুকুরটা যেখানে বাঁধা ছিল তার ঠিক সামনেই সেটাকে একটা বাঁশে ঠেকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে।

কুকুরটা আশ্চর্য্য হয়ে সেইদিকে চেয়ে রইলো।

তারপর বৃদ্ধা খানিকটা মাংস কিনে এনে পুডিং তৈরী করলে—মাংসের গন্ধ পেয়ে কুকুরটা উঠল পাগল হয়ে, বৃদ্ধা পুডিংটা সেই খড়ের মানুষটার গলার মধ্যে খানিকটা ঢুকিয়ে বেঁধে দিলে। তারপর সে কুকুরটার গলা থেকে খুলে দিলে শেকল।

কুকুরটা একলাফে গিয়ে খড়ের মানুষটার টুঁটি কামড়ে ধরলে—তার গলার কাছের খানিকটা জায়গা কামড়ে নিয়ে সে নেবে পড়লো। তারপর আবার লাফিয়ে গিয়ে গলা কামড়ে ধরলে। আবার খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে নেবে পড়লো। আবার দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করলে। এই রকমভাবে সেই খড়ের মানুষটার গলাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

বৃদ্ধা পাশ থেকে নিঃশব্দে দেখছিল—তার চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগলো।

বৃদ্ধা তাকে আবার চেন দিয়ে বেঁধে রেখে দিলে। আবার চললো না-খেতে দেওয়ার পালা। তারপর আবার সেই খড়ের মানুষের ওপর আক্রমণ। এই রকম ভাবে তিনমাস ধরে শিক্ষা চললো।

তারপর আর তাকে চেন বেঁধে রাখতে হোত না—একটু ইসারা করলেই সে গিয়ে খড়ের মানুষটাকে আক্রমণ করতো। এমন কি যখন মানুষটার গলায় খাবার বাঁধা থাকত না, তখনও ইসারা করলেই লাফিয়ে গিয়ে টুঁটি কামড়ে ধরতো—তারপর তাকে পুরস্কাররূপে পুডিং খেতে দেওয়া হোত।

একদিন রবিবারের সকালে বৃদ্ধা এক ভিখারীর পোষাক পরে একটা নৌকো ভাড়া করে ওপারে সেই গ্রামে যাত্রা করলে। খানিকটা পুডিং সে তার সঙ্গে নিয়ে নিলে।

কুকুরটাকে সঙ্গে করে সে লঙ্গোসারদো গ্রামে প্রবেশ করলে। তারপর একজনকে জিজ্ঞেস করে নিকোলাসের বাড়ীর দিকে চললো।

নিকোলাসের বাড়ীর সামনে গিয়ে দাড়িয়ে, সে একবার চারদিকে চেয়ে সেই বাড়ীর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলে—

নিকোলাস! নিকোলাস!!

নিকোলাস ঘরেই ছিলো, ডাক শুনে সামনের দিকে এগিয়ে আসতেই বৃদ্ধা কুকুরকে ইসারা করলে। কুকুরটাও যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল—লাফিয়ে উঠে সে তার গলাটা কামড়ে ধরলে।

খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি চললো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মানুষ ও পশুর যুদ্ধে পশুরই জয় হোলো। নিকোলাসের বিরাট দেহ ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো।

গলাটা কামড়ে ধরলে

সেইদিন লঙ্গোসারদো গ্রামের অধিবাসীরা দেখতে পেলে, যে তাদের গ্রামের মাঝখান দিয়ে একজন অপরিচিতা বৃদ্ধার সঙ্গে একটা বিরাট কুকুর মহানন্দে কি যেন খেতে খেতে চলেছে।

ভাটিয়ালী

প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

ধান আমারে ভুলায় মাগো ধান আমারে ভুলায়
আঘন মাসের হাউয়াতে মোর মনডা যে তাই ঘুলায়।
ক্ষ্যাত ভরা মোর ধানের শীষে শীষে
সোনার বরণ ধইরাছে মা তোমারি আশিসে।
দূরে যে তাই চইলা য্যাতে য্যাতে
তাকাই যত সোনার ধানের ক্ষ্যাতে
ওই ক্ষ্যাত ভরা ধান দুইলা আমার পরাণডাকেও দুলায়।

যতই হাউয়ার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলচে সোনার ধান
ততোই আনন্দেতে মাগো কাঁপ্‌ছে আমার প্রাণ।
ওই সোনার বুকে প্রাণ মাতানো-ঢেউ খেলানোর গুণে
কী আমোদে মেতে আমি নেচেছি যৌবুনে,
ওই তোমার ছোঁয়া ধানই আমার ধ্যান,
ওই তোমার ছোঁয়া ধানই আমার জ্ঞান,
ওই ধানের কাছে কি আছে মা আলু বাইগুন মূলায়!

ভায়ের যে ঘর ছাইতে হবে ভুইলা যাই তা পাছে,
বউ আমারে বইলা দিয়া মনে কইরা দ্যাছে।
ভায়ের চালা ভাইঙা গেল—গেল সনের ঝড়ে
সে ঘর আমি ছাইয়া দিব এবার নূতন খড়ে
গাঁইথ্যা দিব গোয়াল ঘরের দ্যাল্
গরুর ঘরে ঘুস্‌বে না আর শ্যাল্
নূতন কাপড় কিইনা দিব বউ ও ছাওয়াল গুলায়!

আর একটুখানিক ভ্যাখ মা আমি যাবো এবার ঘর,
তোর পাহারায় রইল আমার জ্যান্ত সোনার চর।
এই কড়া দিন দেখিস্ মাগো, দেখবি তাহার পরে,
কী আনন্দ ভইরা দিলি আমার মাটির ঘরে।
বউছাওয়ালরা দেখবা যতই ত্বরা
উঠান বোঝাই মায়ের আশিস ঝরা
অঙ্গ আমার ধন্য হবে তোমার ধানের ধূলায়!
ধান ভুলায়, ধান ভুলায়, ধান ভুলায়, মাগো—
ধান আমারে ভুলায়।

যবদ্বীপের নর-বানর

শ্রীপ্রত্নতাত্ত্বিক

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, এক নর-বানরের কঙ্কাল ও অস্থি পাওয়া গিয়েছে— এই আশ্চর্য্য আবিষ্কারে সারা পৃথিবী হুলস্থুল! ব্যাপার কি জানবার জন্য পৃথিবীশুদ্ধ লোক ব্যস্ত।

যবদ্বীপে গাউই সহরের কাছে ট্রিনিল নামে একটি গ্রাম আছে। এই ট্রিনিল গ্রামে লায়ু-কোকোসান্ আগ্নেয়গিরির পাদদেশে সোলো নদী প্রবাহিত—এই সোলো নদীর তীরেই এক নর-বানরের অস্থি ও কঙ্কাল পাওয়া যায়। ১৮৯১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে একদিন

যবদ্বীপের সোলো নদীর তীরে নর-বানরের আস্তানা
(সাদা ক্রশ দেওয়া জায়গাটায় ঐ নরবানরের অস্থি পাওয়া যায়)

এক মিলিটারী ডাক্তার ইউজেন্ ডুবয় এই নর-বানরের আবিষ্কার করেন। প্রথম তিনি একটি দাঁত পেলেন, তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করে একমাস পরে পাওয়া গেল তার মাথার খুলি। তখন পুরো দেহটা পাবার জন্য আবার খোঁজাখুঁজি চলল কিন্তু একবছর বাদে পাওয়া গেল কেবল বাঁ পাএর একটি হাড়। ডাঃ ডুবয় প্রথম যখন দাঁত ও মাথার খুলি পান তখন কিন্তু তাঁর মনে হয় নি যে এটা নর-বানর জাতীয় কোন জীব, তিনি ভেবেছিলেন যে এটা

একটা বড় বানর জাতীয় জীবই হবে, কিন্তু তার পায়ের হাড়ের গড়ন ও আকৃতি দেখে তিনি ভয়ানক আশ্চর্য্য হলেন। এ ত কোন বানরের পা নয়—এ ত মানুষের পা!—এই তাঁর মনে হল। তাহলে কি এই প্রাণী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত, সোজা হয়ে চলতেও পারত? অথচ এর দাঁতগুলি ও মাথার খুলি ত বানরের মত! তাহলে এ কে? নানা পরীক্ষা ও গবেষণা করে ডুবয় স্থির করলেন, এ একজাতীয় নর-বানরই আর এই নর-বানর মানুষের আদিম পূর্ব্বপুরুষের একজন! সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে যখন ডুবয় ১৮৯৪ সালে তাঁর বই লিখলেন, তখন বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে গেল! ডুবয় লিখলেন, যে এই নর-বানর—মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি অর্থাৎ বানরের পর ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে এই মানুষ-বানরের আবির্ভাব। তারপর এই নর-বানরের বর্ণনা করলেন। এর মাথার খুলি একটু লম্বাগোছের ও একটু চ্যাপ্টা এবং দেখতে গিবন বা শিম্পাঞ্জীর মত, ও এর কপাল ঢালু। কিন্তু এর মস্তিষ্কের চেহারা বানরের চেয়ে উঁচু দরের—খানিকটে মানুষের মতই। বলতে পারা যায় তার মস্তিষ্ক মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি। এর দাঁতের আকৃতি কিন্তু পুরোপুরি বানরের মত। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য! এর বাঁ পা দেখলে মনে হয়—এই অদ্ভুত প্রাণীটি শুধু সোজা হয়ে দাঁড়াতে ত পারতই, এমন কি, সোজা হয়ে চলতেও পারত। ডুবয় আরো বললেন যে এই নর-বানর অস্পষ্ট একরকম কথা বলতেও পারত!
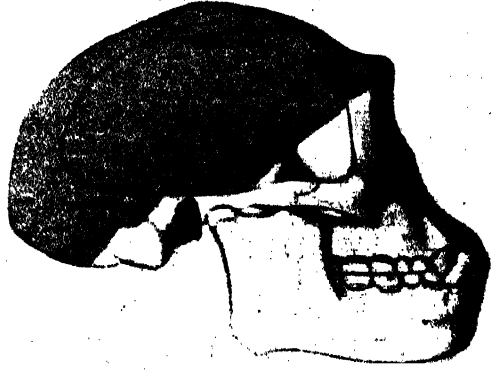
পিথিক্যানথ্রোপাসের মাথা

এই নর-বানরের নামকরণ হল—পিথিক্যানথ্রোপাস্ (pithecanthropus—pithecos অর্থাৎ বানর; anthropos অর্থাৎ মানুষ) বা নর-বানর। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এক আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে ডুবয় এই নর-বানরের এক সম্পূর্ণ রং করা জীবন্ত মূর্ত্তি তৈরী করিয়ে জনসাধারণের সম্মুখে প্রদর্শন করলেন। পৃথিবীর চারিদিক থেকে লোক এসে ভীড় করে এই নর-বানরের মূর্ত্তি দেখে বিস্মিত হল। ভাবল—এই অদ্ভুত জীবটি তাদের পূর্ব্বপুরুষ নাকি?

তারপর নানা তর্ক বিতর্ক চল্‌তে লাগল বৈজ্ঞানিক মহলে। কেউ বললেন, না, শুধু পায়ের চেহারা দেখে মোটেই একে মানুষ-গোষ্ঠীতে ফেলা চলবে না। কেউ বললেন, কেন

চলবে না? আর একদল বললেন, একে মানুষের ঠিক পূর্ব্বপুরুষের লাইনে না এনে—পাশের এক লাইনে জায়গা দাও। ডুবয় বললেন, এই জীবটিকে আমাদের আপন ঠাকুরদা নাই বললাম, কিন্তু খুড়তুত ঠাকুরদা (grand uncle) বলতে আপত্তি কি? প্যারিসের এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাথা নেড়ে বললেন, এই জীবটি অনেকটা—বড় একটা গিবনের মত—যে মানুষের মত চলাফেরা করতে পারত। কিন্তু বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিকরা বললেন, যে মানুষ-গুঁড়ীর একটা পার্শ্ববর্ত্তী শাখাভুক্ত জীব একে বলা যেতে পারে।

এই পর্য্যন্ত—এই অবস্থা অনেকদিন থাকল। অর্থাৎ—পিথিক্যানথ্রোপাস্ না বানর না মানুষ হয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার রহস্য হয়ে যাদুঘরে রইল। তারপর আবার নানারকম আবিষ্কার হল। কয়েকটি পাএর হাড় পাওয়া গেল ঐ নর-বানরের। ১৯৩২ সালে সে সমস্ত পরীক্ষা করে ডুবয় তাঁর আগের মত বদলালেন। তিনি বললেন—যে আগের মত এদের পায়ে বিশেষত্ব একটা আছে বটে কিন্তু এরা যে গাছেও চড়তে পারত তার প্রমাণ তিনি পায়ের আকৃতিতে দেখতে পেছেন এবং সে আকৃতি অনেকটা কোন বড় জাতীয় গিবনের মত। অর্থাৎ পূর্ব্বে, প্যারিসের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকটি যে মত দিয়েছিলেন, তিনি সেই মতের আরো সমর্থন করলেন! তারপর আবার গবেষণা তর্ক সুরু হল। জনসাধারণ যারা কিছু বোঝে না তারা একটু দমে গেল।

তাহলে বড় গিবন জাতীয় কোন জীবই কি আমাদের মানুষের নিকট আত্মীয়?

এর উত্তর আর ভাল করে আমরা পেলাম না। নর-বানরটা একটু রহস্যময় হয়ে রইল। তারপরে শুধু যবদ্বীপ নয়, সম্প্রতি চীনদেশে এমন কি আফ্রিকাতেও এই নর-বানর পিথিক্যানথ্রোপাসের অস্থি ও কঙ্কাল পাওয়া গেল। তাহলে কি যবদ্বীপ, চীন ও আফ্রিকাতে কোন সংযোগ-সূত্র ছিল? হয়ত বা ছিল। কিন্তু নর-বানরের রহস্যের আর কী সমাধান হল? সেটা আমাদের শোনা চাই।

পরিশেষে বিজ্ঞান-পণ্ডিতরা একটা উত্তর দিলেন। তাঁরা সভা করে এই কথা বললেন যে নর-বানর পিথিক্যানথ্রোপাস বড় গিবন জাতীয় জীবের মত দেখতে হলেও, তার মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে—আর এই পরিবর্ত্তনগুলি মানবীয় গড়নের দিকে বিবর্ত্তিত হয়েছে। এই নর-বানরের পাএর গড়ন ও আকৃতি এই পরিবর্ত্তনের একটা উদাহরণ।

নর-বানর জাতীয় এই জীবটির সমস্ত রহস্য কিন্তু এতে করে উদ্‌ঘাটন হল না।

ভগবানের এই অদ্ভুত সৃষ্টি নিয়ে পণ্ডিতেরা আজও তর্ক করেন: এ মানুষ না বানর?

খুকু ঘুমোয় ঘুমোয় না

পূর্ণেন্দু নারায়ণ সেন

খুকুমণি করছ তুমি কি ?—
পড়ছ নাকি কিসের পড়া
ভুলোর কাছে কোন্ সে ছড়া
রাত্তিরেতে দুইজনাতে
জালিয়ে বাতিটি ?
রাত্তির হোল গভীরতর, চাদ যে ডুবে যায়
খুকুশোন : টুপ সরসর ঝুপ্ !
কুড়ের কোনায় জোনাই ওড়ে,
নেড়া বটের কোন কোটরে
দুচোখ দেখা যায় ;
আসছে তারা যাচ্ছে তারা
ধোঁয়ায় মিশে আসছে কারা
খুকু তুমি মুখটি বুজে একেবারে চুপ্ ;
দেখতে থাকো ঐ কিনারায়
কাদের ইসারায়
মেঘের কোলে চাঁদের যে ঘুম পায়
তার দু'চোখ জুড়ে যায় ।

মিথ্যে কথা চাঁদ কি ঘুমোয়
জানলা দিয়ে তোমায় চুমোয়
আদর করে কে ?
আদর করেও নীল পরীরা
টুকরো নাচের এলোমেলো
আলপনা এঁকে ।

অচিন পরী নীল পরীদের ওড়না মাথায় রাণী
তোমায় দেখে করবে কানাকানি ;
ওপার থেকেও আসছে তারা
আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে
সপ্ততারার ফাঁকে ফাঁকে
আলোর দোলনায়,
খুকুমণি অবাক হয়ে অবাক চোখে চায়।

খুকুমণি কে ঘুমুবে তোমায় রেখে একা ;—
যারা ঘুমোয় ঘুমুক তারা
তোমায় ফেলে ঘুমোয় কারা
যারা ঘুমোয় দাও ঘুমোতে
তুমি তো নও একা !
তোমায় ঘিরে ছড়িয়ে আছে
ভাসান্ পরীরা,
পেরজাপতির রঙীন পাখে
যে সব পরী লুকিয়ে থাকে
লুকিয়ে থেকে চাইছে কাকে
—চোখ যেন হীরা,
ঘুম ফেলে সব আগলে আছে
সেই সে পরীরা।

ওমা খুকু পড়ছ নাকো
—সামনে খোলা বই !
তাই কি পিদীম হাসছে খালি
দেখে তোমার এই গাফিলি ;
খোলা বই এর সামনে খোলা
এক জোড়া চোখ কই ?

চোখের ওপর চশমা বাবার,
কায়দা করে কলম আবার
ঠোঁটের মাঝখানেই ;
সবই আছে তুমিও আছ
মনটা শুধুই নেই।

মনটা তোমার কোথায় খুকু
কোথায় ফেরে মন ?
সাতদরিয়ার পারে যেথায় কলমীলতার বন
তেরো নদীর পারে ছোটে
মন কি অনুক্ষণ !
সেই সে বনের সবুজ পারে মানস সরোবর
রাজ হংসের জড়িয়ে গলা
ভাসছে রাজার মেয়ে
পারের দিকে তোমার পানে চেয়ে।
সেথায় যেতে করেছে কি পণ—
তোমার উধাও মন ?

শেলেট ও বই তাইতো খুকুর যাচ্ছে গড়াগড়ি,
গড়িয়ে কোথায় গেছে হাতের খড়ি।
বই যেখানে যায় না নিয়ে,
খড়ির রেখাও শেষ
দিগন্ত যার পায় না নাগাল
সেই সে চাঁদের দেশ !—
সেই দেশেতে ফিকে আলোয় এগোয় তাড়াতাড়ি,
ঝড়ের আগে চলল খুকু
স্বপ্ন দোলায় পাড়ি।

নাকি যেথায় দত্যি ভীষণ উদগরাসে খায়
গাঁয়ের মানুষ বনের কিনারায়।
সবার শেষে রাজকুমারীর পালা এল ক্রমে,
সেথায় এসে খুকুর মনের
রথ গিয়েছে থেমে।
ভাবছ তুমি সামনে বসে বজ্রমুঠি হাত,
এগিয়ে যাবে দত্যিটাকে
লড়বে তুমি মারবে তাকে
করবে কুপোকাত?
একমাত্র রাজার মেয়ের জীবন যে আজ যায়
ভাবছ কেন?
দত্যি এসে ধরল বুঝি প্রায়!

* * * *

খুকুমণি ভোর যে হোল
সময় যে আর নাই
—আমরা এবার যাই।
আসছে আলো আকাশ জুড়ে,
আমরা এবার গেলাম দূরে
আর কি থাকা যায়!
বুনতে থাকো স্বপ্নেরই জাল,
আমরা আবার আসব যে কাল,
স্বপ্ন দিয়ে এসেছিলাম
স্বপ্ন দিয়েই যাই;
—পার নাকি চিনতে মোদের ভাই!

আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল

১৮৬৪ সালের আশ্বিনমাস ; বাংলাদেশে ঝড়ে চারিদিক তোলাপাড়া করছে। তারই মধ্যে আমাদের এই কলকাতা সহরে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হল। তাই শিশুর মা শিশুটির নাম রাখলেন 'ঝোড়ো'। মায়ের কোলে শুয়ে শুয়েই শিশু আকাশের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত। মা অবাক হয়ে ভাবতেন—এ দার্শনিক শিশুটি কে ? কি সে আকাশের দিকে চেয়ে একমনে ভাবে ! ক্রমে শিশু বড় হয়, পৃথিবীও এই আকাশ-চাওয়া শিশুটিকে তখন তার মাটির দিকে টানে। বনের ধারে পুকুরের পাড়ে গাছপালা পশুপাখীদের মাঝে এই ঝোড়ো শিশু শান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকল। কৌতূহলী বিজ্ঞান মন তখন তার জাগল। তারপর—রামলীলায় রামায়নের গল্পের মুখোসপরা অভিনয়, রাম রাবনের সে জাব্বাজোব্বা সাজপোষাকের ঘটা দেখতে দেখতে এই শিশু ঘন্টার পর ঘন্টা কেমন কাটিয়ে দিত। তারপর একদিন চড়ক পূজোর মেলাতে এই শিশুটিকে দেখা গেল, শূলে বেঁধা সন্ন্যাসীদের সে কাণ্ড দেখতে দেখতে হঠাৎ এক টুকরো পাথর তার চোখে এসে লাগে। ফলে প্রায় অন্ধ হয়ে শিশুকে ৬ মাস মায়ের কোলে আশ্রয় নিতে হয়। তারপরই তার শিশুমন আবার অবাক হয়ে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে থাকে। বোধ হয় চোখে তার কোন প্রশ্ন ভাসে।

এই ভাবুক দার্শনিক শিশুটিকে তার উত্তর জীবনে পৃথিবী আচার্য্য শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলে চিনেছিল।

কিসে লোকে বড় হয়? পৃথিবীর সুখ ও আরাম তুচ্ছ করে যিনি জ্ঞান সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন, মানুষের দৃষ্টির সামনের সব আগাছা তুলে দিয়ে যিনি নূতন আলোর বীজ বপন করেন, সাধনার বিশাল ক্ষেত্রে সহজ ও সুস্থ জীবন প্রবাহের যিনি উন্মুক্ত উদার পথ দেখান—তিনিই তো বড়।

এমনি শৈশব থেকেই জ্ঞানের তপোবনে ঋষির মত সাধনা সুরু করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। শৈশবে আরব্ধ এই সাধনায় ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভ করে তিনি মহাজ্ঞানী হন।

ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্য হল অগাধ। শিক্ষক ও ছাত্র ভীড় করে পাশাপাশি তাঁর কাছে দিক্ষা নিল। তাদের সম্মুখে দর্শনগুরু আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ জ্ঞান সাধনার বিশাল ক্ষেত্রে যে সহজ ও সুস্থ জীবন প্রবাহিত তার উদার পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। আর শুধু জ্ঞানাতুর ছাত্র শিক্ষকের কাছেই তাঁর মহৎ জীবন উৎসর্গ হয়নি, গরীব দুঃখীরাও তাঁর বিশাল মনে পরম আশ্রয় পেত। তিনি নিজেও সরল অনাড়ম্বর জীবনের ভক্ত ছিলেন। যৌবনে তাঁর সাথী ছিলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের বানী—সেবাধর্ম্মে তিনিও তাঁর মত মন্ত্রপূত ছিলেন।

তাঁর ছেলে বেলার গল্প তাঁর নিজের কথায় তোমাদের কিছু বলি :—

পশুপাখী গাছপালাই আমার কৌতুহলে সবপ্রথম সাড়া দিলে। প্রথম বইর ছবি দেখে তারপরই দমদমে আমাদের সাতপুকুর ও বাগান—সাতপুকুরের জঙ্গল, পশুপাখী আমার মন টানল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প আমার ভারী ভাল লাগত। রামলীলাতে রামায়ণ মহাভারতের দৃশ্যগুলি আমাকে মুগ্ধ করত। রামায়ণের গল্পের মুখোসপরা অভিনয়, জাব্বাজোব্বা সাজপোষাক, সে সব দৃশ্য দেখে আমার মন এত মুগ্ধ হত যে তখন থেকেই রামায়ণ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করতে আমার মন চেয়েছিল।

তারপর—চড়কপূজোর সন্ন্যাসীদের সেই খেলা দেখে আমার কি ভয় হয়েছিল! সেখানেই যখন আমি সন্ন্যাসীদের শূলে ঘোরা দেখছিলাম হঠাৎ আমার চোখে এক পাথরের টুকরো এসে লাগে, ফলে আমি ছয়মাস প্রায় অন্ধ হয়েছিলাম আর কি! তারপরই আমার সমস্ত অন্তপ্রেরণা আমার অন্তর্মুখী হল।

যখন আমার বয়স বছর চারেক তখন আমি পাঠশালায় ভর্ত্তি হই। ভজু বলে আমাদের এক পুরণো চাকর আমাকে রোজ কাঁধে করে পাঠাশালায় নিয়ে যেত। গুরুমহাশয় যখন বন্ধ ঘরে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক টানতেন আর মুখ থেকে রাশিকৃত ধোঁয়া ছাড়তেন তা দেখে ভয়ে আমি পড়া ভুলে যেতাম। দিন দশবারো এই রকম চলল তখন গুরুমশায় বাবার সঙ্গে দেখা করে বললেন—এ-ছেলের কিছু হবে না—এ একেবারে গাধা।

হায়! গুরুমশাই তখন যদি জানতেন, উত্তর জীবনে এই ছেলে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে দর্শনে এম্, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবে! যদি জানতেন, এই ছেলে একুশ বছর বয়সে নাগপুর মরিস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হবে!

১৯০৫-৬ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণ করেন ও বহু সভাসমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কয়েক বছর পরে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে তিনি 'স্যর' উপাধি পান। তারপর ক্রমশঃ তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ শতজন্ম বার্ষিকি সভায় তিনি সভাপতি হন। জনসাধারণের সম্মুখে সেই যে তাঁর শেষ আবির্ভাব কে জানত? তার পরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে পড়ে। প্রথম পক্ষাঘাত পরে হঠাৎ নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে, গত ৩রা ডিসেম্বর শনিবার ভোরের প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মহৎ আত্মা পৃথিবীর মাটির মায়া ত্যাগ করে তাঁর শৈশবের প্রিয় অনন্ত আকাশে লীন হয়।

বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমাঝারের তপোবনে
সত্যদ্রষ্টা, যেথায় যুগযুগান্তরের ধ্যানের গগনে
গূঢ় যত উদ্ঘারিত জ্যোতির্ম্ময় সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে—
নিত্য সুন্দরের আমন্ত্রণ। যেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে বুলালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি। (রবীন্দ্রনাথ)
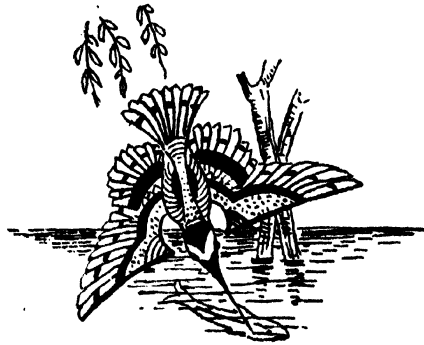
রংমশালের পাঠকপাঠিকা ভাইবোন,

এবারকার কাগজ যখন তোমাদের হাতে গিয়ে পড়বে তখন তোমাদের সামনে বড় দিনের উৎসব। খৃষ্টধর্ম্মের এই পরবটির নাম কে যে আমাদের দেশে বড়দিন লিখেছিল তা ঠিক জানিনা। কোথায় 'খৃস্‌মাস্‌' আর কোথায় 'বড়দিন'! ওপর থেকে দেখতে গেলে নামটি দেওয়া ভুল হয়েছে বলেই মনে হয়। কিন্তু গভীর ভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান পরবের এর চেয়ে উপযুক্ত নাম বুঝি আর হতে পারে না।

বড়দিন সত্যিই বড় দিনের উৎসব। খৃষ্টধর্ম্ম যাঁর জীবনের সাধনা ও বাণী থেকে গড়ে উঠেছে, সেই মহাপুরুষ দু' হাজার বছর আগে মানুষের দিন আরো বড় করবার জন্যেই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যে অন্ধকার রাত্রি মানুষের মনের জগৎ ছেয়ে আছে,—যে অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত লোভ, হিংসা, নীচতা, স্বার্থপরতা ঘুরে বেড়ায়, যে অন্ধকারে মানুষ নিজের সত্যকার কল্যাণের, আনন্দের পথ চিনতে পারেনা, সেই অন্ধকার দূর করে তিনি চেয়েছিলেন মানুষের জীবনে স্বর্গের আলো আনতে। অন্ধ অজ্ঞ মানুষ সে দিন তাঁর চেষ্টার মূল্য দেয়নি, ভুল বুঝে তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করে তারা শাস্তি দিয়েছিল।

তাঁর সে শাস্তি আজো শেষ হয়নি, এইটেই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে লজ্জার সবচেয়ে দুঃখের কথা। মানুষের দিন এখনো ছোট হোয়েই আছে, কত মানুষের জীবনে দিন ত দূরের কথা প্রভাত পর্য্যন্ত এখনো হয়নি। এখনো রাত্রির অন্ধকার মানুষের মন ছেয়ে আছে, সে অন্ধকারে নিজেদের পথ চিনতে না পেরে আমরা টানাটানি মারামারি করে মরছি, পৃথিবীর ইতিহাস, লোভে নীচতায় স্বার্থপরতায় পঙ্কিল রক্তে কলঙ্কিত হয়ে উঠছে।

বড়দিনের উৎসব পৃথিবীর খৃষ্টান অনুষ্ঠান বহু দেশে এবার সুরু হবে। প্রতি বৎসরই হয়। সে উৎসবে মাতবার সময় কারুর কি মনে পড়বে যে যাঁর নামে এই উৎসব তিনি আজো হিংসার তীক্ষ্ণ শলাকায় মূঢ় সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে আছেন? মনে পড়বে কি, মানুষের দিন সত্যি করে বেড়ে না উঠলে তাঁর শাস্তির শেষ নেই?

তোমাদের সম্পাদক মশাই।

এবারে চলন্তিকার পাতায় প্রথমেই আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে দুটি শোক সংবাদ জানাচ্চি। মৌলানা সৌকত আলি এবং আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল আর ইহ জগতে নেই। মৌলানা সৌকত আলি গত অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। সেই সময় মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মৌলানা সৌকত আলির গুণগান করে লোকের মুখে মুখে যে ছড়া চলেছিল তা আজও সকলের মনে আছে। মৌলানা সাহেবের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ একজন নির্ভীক নেতাকে হারাল। আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ শীল ছিলেন ভারতের দর্শন গুরু। অগাধ পাণ্ডিত্যে তিনি পৃথিবীর খ্যাতি পেয়েছিলেন। কত ছাত্র কত শিক্ষক তাঁর কাছে প্রেরণা পেয়েছে। ১৯২০—৩০ খৃষ্টাব্দ অবধি তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মহীশূর রাজ্যের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। ৩রা ডিসেম্বর শনিবার প্রাতঃকালে তিনি দেহত্যাগ করেন। আজ তাঁকে হারিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ শোক করছে।

* * * * *

জীবন এবং মৃত্যু এরা মানুষের কাছে চিরদিনই রহস্য। প্রাণের আশা মানুষ সহজে ত্যাগ করে না। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কতই না চেষ্টা—মৃত্যুর দিন পেছিয়ে দেবার জন্য কত বৈজ্ঞানিক গবেষণা। রাশিয়ায় এইরকম মানুষের আয়ু দীর্ঘ করবার বহুদিন ধরে নানা গবেষণা চলছে। সম্প্রতি সেখানকার ইউক্রেনিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর এ, এ বোগোমোলেৎজ্‌ বলেছেন, যে কোন লোকের পক্ষে ১২৫ থেকে ১৫০ বছর পর্য্যন্ত সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব।

* * * * *

এই সম্পর্কে রাশিয়ার আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার তোমাদের বলছি। সোভিয়েট রাশিয়াতে ডাক্তারী বিদ্যা ও চিকিৎসা যাতে জনসাধারনের সকলের কাছেই পৌছতে পারে

তার চেষ্টা হচ্চে। প্রত্যেক সোভিয়েট অধিবাসীর সোভিয়েট চিকিৎসার ওপর সমান দাবী থাকবে। সে দেশে গরীব ও বড়লোক নেই, সবাই সমান, সকলেরই সব বিষয়ে সমান অধিকার। সোভিয়েট চিকিৎসা কেবল ব্যক্তি বিশেষকে সুস্থ রাখবার মন দেয়নি, যাতে সমস্ত জাতি সুস্থ থাকতে পারে সে বিষয়ে পণ করেছে। এই সম্পর্কে সোভিয়েট একটা "Medical City" তৈরী করছে। এ একটা আশ্চর্য্য সহর হবে। রাশিয়ার বিখ্যাত চিকিৎসক পাভ্‌লভ্‌—তাঁর ছাত্র ফিওডোরোভ এই সহরের দেখা শোনার ভার নিয়েছেন। এই Medical Cityতে রাশিয়ার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা পর্য্যবেক্ষণ করা হবে—যেমন কাজকর্ম্মের পর লোকেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাওয়া দাওয়ার পর তাদের শরীর পরীক্ষা, নিদ্রার পর শরীর পরীক্ষা ইত্যাদি। তারপর এই সহরে নানা গৃহ তৈরী করা হবে—এক একটি গৃহে এক একরকম জলহাওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে। যেমন, কোন গৃহ করা হবে ভারতবর্ষ বা আফ্রিকার মত খুব গরম, কোন গৃহ হবে উত্তর মেরুর মত তুষার শীতল ; এমনকি কোন কোন গৃহে সমুদ্রের তলায় যেমন হাওয়া তাপ সেরকম বন্দোবস্ত হবে, আবার কোথাও আকাশের বায়ু বা অক্সিজেন স্তরের সীমা ছাড়িয়ে যে স্তর অর্থাৎ Stratosphere সেখানকার তাপমানে গৃহ তৈরী হবে—আর এই সব গৃহে লোকেদের স্বাস্থ্য কেমন করে সুস্থ রাখা যায় তার গবেষণা হবে। এই আশ্চর্য্য সহরে ৫৫০০ ডাক্তার, নার্স, ছাত্র থাকবে আর লোক বা রোগী থাকবে ৬০০। প্রত্যেক রোগীর জন্য আলাদা এক একটি ঘর থাকবে—ও প্রত্যেকের জন্য এক একটি গবেষণাগার থাকবে! এরকম আদর্শ ও এরকম যুগান্তকারী ব্যাপার পৃথিবীতে আর কোথাও হয়নি।

বায়োস্কোপ তোমরা প্রায়ই দেখে থাক। বায়স্কোপে নানারকম বিস্ময়কর জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ছবি জলের নীচে তোলা হয়েছে—শুনেছ কখনও ? সম্প্রতি আমেরিকার ফ্লোরিডা অন্তর্গত ওকালা নামে এক জায়গায় ১৮ ফুট জলের নীচে তোলা "সিলভার ফিস" (silver fish) বলে একটা অদ্ভুত ছবি তোলা হয়েছে। মানুষ জলের নীচে একবারে এক মিনিটের বেশী থাকতে পারে না। তাহলে একটা সম্পূর্ণ ছবি তুলতে বায়স্কোপের লোকেদের কতবার ওঠা নামা করতে হয়েছে একবার ভেবে দেখ!

* * * * *

জার্ম্মাণীতে ইহুদি অত্যাচারের কথা তোমরা কিছু কিছু শুনেছ। কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে যে ব্যাপার হয়ে গেল তাতে সমস্ত সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গেছে। প্যারিসে

১৭ বছরের একটি ইহুদী ছেলে জার্ম্মান দূত হের ফন্‌রাথকে গুলি করে। তার ফলে হাঁসপাতালে ফন্‌রাথের মৃত্যু হয়। ইহুদি ছেলেটি নাকি তাদের জাতির প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেই ফন্‌রাথকে গুলি করে। এই রকম হত্যাকাণ্ড যদিও একেবারে সহ্য করা যায় না তবু জার্ম্মাণীর ভয়ঙ্কর বিচারের কথা ভেবে আমরা লজ্জিত না হোয়ে পারি না। প্রথমতঃ ইহুদিদের ঘর, দোকানপাট লুটপাট করে জার্ম্মাণ জনতা তাদের হিংস্র ক্রোধ জানায়। তারপর রাষ্ট্র থেকে হুকুম আসে সমস্ত ইহুদি অধিবাসীদের কোটি মুদ্রা 'ফাইন' দিতে হবে। তাছাড়াও আরও অন্যায়ভাবে ইহুদিদের সমস্ত নাগরিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্চে। শুধু তাই নয়, তাদের ওপর অত্যাচারের অন্ত নেই। বহু ইহুদী পরিবার জার্ম্মাণী থেকে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে পালিয়ে বেঁচেছে।

* * * * * *

আমাদের দুটি কিশোর গ্রাহক পাটনার নসু সেন ও খসু সেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস প্রতিযোগিতায় খেলছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস প্রতিযোগিতা বড়দের জন্য— তাও যাঁরা পাকা বড় খেলোয়াড়। নসু ও খসু দুটি বাচ্চা ছেলের খেলা দেখে কিন্তু পাকা খেলোয়াড়রাও চমকে যাচ্চেন। নসু খসু হেরে যাবে এটা ঠিক, কিন্তু সেটা তাদের অপমান নয়। বরঞ্চ এই পাকা খেলোয়াড়দের সঙ্গে যে তারা খেলছে এই যথেষ্ট বিস্ময়কর। শুধু খেলেছে না, এখনও তারা হেরে যায়নি। অনেক পাকা খেলোয়াড়দের তারা হারিয়ে দিচ্চে। এই কয়েক দিন আগে খসু সেন আমাদের বড় লাটের এক ছেলেকে—তিনি পাকা খেলোয়াড়ই তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে! ছোটদের মধ্যে আর একটি ছেলে এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস প্রতিযোগিতায় খুব ভাল খেলেছে ও নাম করেছে— সে দিলীপ কুমার বসু। এদের খেলা কলিকাতা সাউথ ক্লাবে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। অনেকে বলছেন বড় হলে এদের হারান ভারতবর্ষের এমন কি বাইরেরও প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের পক্ষে সহজ হবে না।

* * * * * *

রংমশালের পাতায় তোমরা সকলেই শ্রীশচীন্দ্র সেনগুপ্তের নাটিকা "ভাইটামিন" পড়েছ। অনেক জায়গা থেকে আমরা খবর পেয়েছি— এই সুন্দর ছোট নাটিকাটি ছেলে-মেয়েরা অভিনয় করেছে। সম্প্রতি শ্রীবিমল বসুর প্রযোজনায় এই নাটিকাটি ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতা রেডিয়োতে অভিনীত হবে। তোমরা এই তারিখটি নিশ্চয় মনে রাখবে ও শুনবে কেমন হয়েছে। এই সম্পর্কে আর একটি কথা শুনে তোমরা সুখী হবে, যে গত ভাদ্র মাসের রংমশালে শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিকের যে 'ছেলেদের গান' প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি শীঘ্রই গ্রামোফোনে রেকর্ড হবে

শেফালিকা

শ্রীশিবানী সরকার

ওগো শেফালিকা রাতের আঁধারে চুপে
এসেছিলে তুমি কি মনোমোহিনী রূপে,
প্রভাতেবেলায় কখন পড়েছ ঝরে'
কোমল তৃণের শ্যামল শয্যা' পরে।

ওগো শেফালিকা শুভ্র তোমার দেহে
পীত অংশুক পরেছ কত না স্নেহে,
সিক্ত করিছ শ্যামল ধরিত্রীরে
বিদায়ব্যথার শিশির অশ্রুনীরে।

ওগো শেফালিকা রজনী না হতে ভোর,
বিদায় চাহিছ চুরি করে মন মোর ?
শরতের মেঘ ফিরিছে তোমারে ডাকি
তোমারে চাহিয়া ছলছলে তার আঁখি।

ওগো শেফালিকা, শ্যামল দীঘির জলে
ফুটেছে কমল তারো আঁখি ছলছলে।
এমন করিয়া কাঁদাবে এ বনভূমি,
কি পাষাণে আজি বেঁধেছ হৃদয় তুমি ?

ওগো শেফালিকা তোমারে চাহিয়া আজ
শরতের মেঘ পরেছে শুভ্র সাজ
কাশবনে আজি তাই লেগে গেছে দোল
আকাশ বীণায় বাজিতেছে হিন্দোল।

ওগো শেফালিকা তোমার গন্ধ লুটি
দিকে দিকে আজি বাতাস চলেছে ছুটি
শস্যের ক্ষেত ভরে গেছে পাকা ধানে
পৃথিবী আজিকে মেতেছে হাসি ও গানে।

ওগো শেফালিকা কাঁদায়ে এ ধরণীরে
এমন করিয়া যেয়োনা, যেয়োনা ফিরে,
চেয়ে দেখো ঐ তোমারি লাগিয়া আজ
আকাশ পৃথিবী পরে উৎসব সাজ॥

ঝরাফুল

শ্রীঅসীম কুমার সরকার

শেফালির পাদদেশে কত ঝরাফুল
চারিদিক্ আলো করি রয়েছে পড়িয়া;
গন্ধে তার মুগ্ধ হয়ে আসে অলিকুল
অজানা প্রদেশ হতে উড়িয়া উড়িয়া!

এ ফুলে হয়নি পূজা কোনও দেবতার
কোনও নর ঘ্রাণে তার হয়নি বিহ্বল;
দেয় নাই প্রিয়জনে কেহ উপহার
তবু জন্ম তাহাদের হয়েছে সফল!

সে কি শুধু মানবের বিলাসের তরে
বৃক্ষশাখে ফুলরাজি ফুটে থরে থরে?

ছোটমেয়েদের ঝগড়া

শ্রীগৌরাঙ্গ রায়

দুটি টুকেটুকে সুন্দর ছোট মেয়ে—একটির নাম সুশী আর একটির নাম টুকু। দুজনেরই সোনালী চুল বব্ করে ছাঁটা, গাঢ় নীল চোখ। দুজনেরই বেশ ভাব। রাতে জল হয়ে গেছে; সামনের ডোবায় জল জমে, সেইখানেই তারা দুজনে খেলা কচ্ছিল। টুকু বড় লোকের মেয়ে; সে দামী পোষাক পরে এসেছে আর সুশীর গায়ে একটা সাধারণ ফ্রক।

খেল্‌তে খেল্‌তে হঠাৎ সুশী দিয়েছে টুকুকে জলে ঠেলে, আর যায় কোথায়! টুকু অমনি উঠল কেঁদে, টুকুর বাবা সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন; তিনি এসে টুকুকে জল থেকে উঠিয়ে সুশীকে বেদম প্রহার দিলেন। সুশী যেই তার মামাকে গিয়ে সেই কথা বলেছে, অমনি তিনি তেলে বেগুনে হয়ে ছুটলেন টুকুদের বাড়ী। সেখানে সামান্য কথাকাটা থেকে, হাতাহাতি শেষটা মারামারিতে পরিণত হল। টুকুর বাবা বড় লোক, সঙ্গে সঙ্গে থানায় লোক পাঠালেন। ও তরফ থেকে সুশীর মামা নিজেই থানায় গেলেন। এ দিকে বাড়ীতে সুশীর আর টুকুর যা অবস্থা হল, তা আর কি বলব! সুশীর মা মেরে সুশীর গায়ের চামড়া তুলে ফেল্লেন প্রায়; এদিকে টুকুকে তার মা সুশীর সঙ্গে খেল্‌তে মানা করে দিলেন।

সন্ধেবেলা সুশীর মামা আর টুকুদের বাড়ী থেকে যিনি থানায় গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরে আস্‌তেই রায়েদের পুকুরের পাড়ে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন, টুকু আর সুশী রায়েদের পুকুরের পাড়ে বসে খোশ মেজাজে গল্প কর্চ্ছে। সুশী বল্‌ছে, "ভাই টুকু, আর আমি কখনও তোকে জলে ফেলে দেব না ভাই, কেমন?" টুকু বল্‌ছে, "অমন রে কত হয়ে থাকে—তার জন্য আর ভাবনা কি? আয় আমরা আগডুম বাগডুম্ খেলি।"

দিন মজুর

শ্রীশিবানী সিংহ

শীতের ভোর; চারিদিকে জমাট কুয়াশা। ভোরের আবছা আলোয় দূরে কুয়াশায় ঢাকা গাছ ও সারি সারি খোলার বস্তি—ঝাপসা দেখায়। অনতিদূরে চটকলের ভোঁ দিগন্ত কাঁপাইয়া বাজিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অগণিত কুলী বস্তি হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের বেশ—জীর্ণ ও মলিন। উপযুক্ত পরিচ্ছদের অভাবে শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। চোখে অলসতার ঘোর তখনও কাটে নাই; মুখে চোখে দীনতা ও নৈরাশ্যের অপরিসীম কালিমা। কিন্তু কি ক্ষিপ্র তাহাদের গতি! সময়ে না পৌছিলে মজুরী মিলিবে না। দেহের রক্ত জল করিয়া হাড় পিষিয়া পয়সা রোজগার; তাই এত ছুটোছুটি।

বস্তি অপরিচ্ছন্ন; বাতাসে বিশ্রী পচা গন্ধ। কোন অপরিসর কক্ষে জীর্ণ খাটিয়ায় শ্যামল শুইয়াছিল। নিকটে বার তের বছরের একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল—"দাদা, ওরা সব চ'লে গেল, আর তুমি এখনও শুয়ে। আজকাল তোমার কি হয়েছে বলত?"

বিকৃতকণ্ঠে শ্যামল বলিয়া উঠিল—"আমি না যাই তোর কি? আমার গায়ে জর, আমি ওদের মত খাটতে পার্‌বো না। আমি যাব না। তুই বেরো সাম্‌নে থেকে বলচি কাজল।"

কাজল বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিতে ছোট ছিল না। চার বছর আগে একদিন সব হারাইয়া, অভাবের দুর্দ্দান্ত তাড়নায় সে তাহার নিরক্ষর ভালমানুষ দাদাটির হাত ধরিয়া এই বস্তিতে আসিয়াছিল। এখন শ্যামলের বয়স বাইশ কিন্তু আরও বেশী মনে হয়; পূর্ব্বের সে স্বাস্থ্য নাই; তাহার উপর যখন তখন জর আসে। কাজলের কান্না পাইতেছিল।

হঠাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া শ্যামল বলিল—"কাজল, আমি চল্‌লুম।" সে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল। কাজল বহুবার ডাকিয়াও ফিরাইতে পারিল না।

দিনের আলো নিভিয়া আসিল। কলের ভোঁ একটু আগেই বাজিয়াছে। দিনমজুরের দল ধীর মন্থর গতিতে গৃহপানে ফিরিতেছিল; এবারকার মূর্ত্তি আরও রুক্ষ ও মলিন। দানবযন্ত্রের নিস্পেষণে বুঝিবা ইহাদের সবশক্তি উজার হইয়া গিয়াছে। টলিতে টলিতে শ্যামল ঘরে ঢুকিয়া কোনমতে শুইয়া পড়িল। কাজলকে ডাকিয়া সস্নেহে এবং রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"কাজল, দেরী হলে সর্দ্দার খুব মারে, আজ মজুরীও দেয়নি। না দিক্‌গে। উঃ! গায়ে কাঁথাটা চাপিয়ে দেত, বোন্‌।"
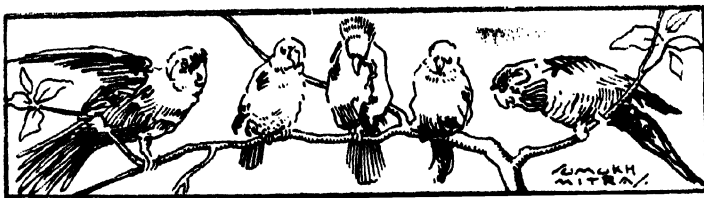
পরিচালিকা—**দিদিভাই।**

আমার সোণার ভাই বোনরা !

তোমাদের আশ্চর্য্য ও উৎকণ্ঠার সীমা নেই একথা জানি—আমার হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের জন্য। কিন্তু আমি হারিয়ে যাইনি—তোমাদের মত সোণার বন্ধু যার সে কখনও হারিয়ে যেতে পারে ?

নিমন্ত্রণ বাড়ীতে মানুষের সমারোহ—দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারের জন্য অসংখ্য পাতা পড়েছে—বড় ছাদের চারিদিকে। তোমরা যদি লক্ষ্য করো তো দেখতে পাবে এই ভীড়ের ভেতর একখানা পাতা বাদ পড়ে গেছে—আমরাও সেই অবস্থা ঘটেছিল। যাহোক অগ্রহায়ণ গিয়ে পৌষ এসে পড়লো, শীতটা বেশ জমে এসেছে আর রোদও বেশ মিষ্টি লাগছে। সময় মত 'দিদিভাই'এর দেখা না পেয়ে তোমাদের পর্ব্বত প্রমাণ রাগ ও অভিমান জমা হয়ে আছে। মেঘ ঢাকা চাঁদের মত তোমাদের মিষ্টিমুখ আমার চোখের সামনে ভাসছে আর তোমাদের কথা ভাবতে দপ্তর খুলছি।

চমকে চেয়ে দেখি অজস্র চাঁদ হাসছে পূর্ণিমার পরিপূর্ণতা ও স্নিগ্ধতা নিয়ে।

শিবানী সিংহ (কলিকাতা) গ্রাঃ ৪৮৪

আশা করি তুমি এমাসের রংমশাল পেয়েছ। দিদিভাইকে ধন্যবাদ জানাতে হয়না তা বুঝি জানো না বোনটী ? তোমার লেখা কি আছে পাঠিয়ে দিও—দেখে বলবো।

নিলিমা চক্রবর্ত্তী (নিউদিল্লী)

তুমি কাকে লেখনী বন্ধু চাও জানিও আর তুমি কি ব্যাজএর জন্য টাকা পাঠিয়েছিলে ? টাকা পাঠিয়ে যদি ব্যাজ না পেয়ে থাকো পরিচালক মশাশয়কে একখানা চিঠি লিখো—তাহলে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হবে ভাই।

আলপনা দাস (ধুবড়ী)

আলো! তোমার লজ্জা ও ভয়ের জন্য আমি সত্যি দুঃখিত বোন। গ্রাহিকা হওয়া সম্বন্ধে যে কথা লিখেছ ভাই আমি তাতে আন্তরিক দুঃখিত হয়েছি—এ বিষয় আমি পরিচালক মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে তোমায় জানাবো। আমায় যেমন তোমার ভালোলাগে তোমাকেও ঠিক তেমনি ভালো আমার লাগে। নিশ্চয়ই তোমার দিদির অভাব পুর্ণ করবার চেষ্টা করবো ভাই। চিঠি যখন লিখবে—ঠিকানাটী সমস্ত ভাল করে লিখো কেমন? বৌদিকে আমার কথা বলো আর প্রীতি দিও।

গৌরাঙ্গ রায় (ধানবাদ) গ্রাঃ ১১৮৩

তোমার লেখার খবর যথাসময়ে পাবে ভাই। গৌরাঙ্গ চৌধুরীর ঠিকানা আমি শীঘ্র তোমায় পাঠাচ্ছি। আবার আমার ছবির কথা! কোন্ কাগজে কি আছে ভাই তা যদি করা হয় তাহলে রংমশালের স্বাতন্ত্র থাকে কি? আমায় একটা যাহোক কল্পনা করে নিও না—সেই তো বেশ।

তরুণ ঘোষ (কলিকাতা) গ্রাঃ ১০৬৬

তোমার অনুযোগ শুনে দুঃখিত—আমি সত্যি তোমার চিঠি পেলে ঠিক উত্তর দিতাম ভাই—যে কোন কারণেই হোক আমার কাছে এসে পৌঁছয়নি তাই লিখতে পারিনি। কিছু মনে করোনা—এই তো উত্তর দিচ্ছি ভাই—অভিমান যেন না থাকে কেমন? লেখনী বন্ধু কাকে চাই তোমার?

শিবপ্রসাদ সেন (নিউদিল্লী) ৫৮৯

তোমার চিঠিটা পড়ে খুব ভাল লাগলো। তুমি লিখেছ—পূজায় খুব আনন্দ করেছি। এখানে খুব বড় পূজা হয়…বোধহয় এতগুলি বাঙ্গালী একসঙ্গে পূজা কোথাও করেনা। এবার সবচেয়ে ভাল লাগলো রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বল্লেন।…দুর্গাপূজা সম্বন্ধে ছোট করে একটা বক্তৃতা দিলেন। তিনি বল্লেন দুর্গাপূজা শুধু আনন্দ দেয় না, আমাদের শক্তি দেয়। আমরা যেন ভুলে না যাই ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীতে বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজ ফুরায় না বরং সেখানেই আরম্ভ। দুর্গার বোধন করতে হবে অন্তরে অন্তরে, বাহ্যিক আড়ম্বরে নয় তা যেন আমরা ভুলে না যাই।

শিবপ্রসাদ তুমি যে বলেছ ভাই আমায় চিনতে পেরেছ তা জেনে খুব খুশী হলাম—কিন্তু কে তোমায় বলেছে আমি লেখিকা? এটি একেবারে ভুল। তোমার দিল্লী যাবার নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করছি ভাই।

রহিমা খাতুন (ষোলঘর) ৭৭৭

রমু! তোমার নতুন চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। কিন্তু তোমার কথা ভুল—আমার কাছে যে সব ভাই বোন সমান ভাই—পক্ষপাতিত্ব নেই, তোমরা সকলেই আমার স্নেহের ও আদরের। ভাষা সুন্দর নয় কে বলেছে! আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছে। তোমার ভালবাসা ও মা ঠাকুমার স্নেহ আমি সাদরে গ্রহণ করেছি।

মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর) ৫৭৭

তোমাদের একত্রিত করবার দিন একটু বদলান হয়েছিল ভাই সকলের সুবিধার জন্য। অঞ্জলি বোনটীর মৃত্যুর জন্য আমরা সবাই আন্তরিক দুঃখিত ও মর্ম্মাহত। শ্রীভগবান যেন তার পরিবারবর্গের মনে শান্তি দেন—আর তার আত্মার কল্যাণ হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

বিনয় চন্দ্র (কটক) ১০৩৮

তোমার মতামত গুলি পড়েছি ও ভাল লেগেছে—এবিষয় যদি পরিচালক মশাইকে জানাও তাহলে ফল বেশী হয়—তোমরা সেই চেষ্টাই করো ভাই।

দ্বিজেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য (রেঙ্গুণ)

নামটা ভাই তোমার বড্ড বড়, ছোট নাম নিশ্চয় একটা আছে সেটাই জানিও আমায়। তোমার ধাঁধার ব্যাপার শুনে খুব আনন্দ পেলাম। গত পূর্ব্ব মাসে বিশেষ কারণে রংমশাল বেরতে দেরী হয়েছিল সেজন্য প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারনি। এবার থেকে যাতে তোমাদের অসুবিধা না হয় তার চেষ্টা আমরা করবো।

কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায় (জামালপুর) ৬৭৮

তোমাদের সুবিধার জন্যই বড়দিনের সময় তোমাদের একত্র করবার দিন স্থির হয়েছে লেখা পাঠিও।

দুর্গা বসু (শালকিয়া) ৬৬১৬

তুমি যে সব অনুযোগ করেছ ভাই—এসব আমায় না লিখে তোমরা যদি পরিচালক মশাই কে জানাও বড় ভাল হয় আর তোমাদেরও সুবিধা হয়।

প্রেমাংশু ঘোষ (কলিকাতা)

আমাদের দলের নিয়ম তুমি তো ভাই জানো—সুতরাং পত্রোত্তর বা লেখনী বন্ধু সম্বন্ধে আমি নতুন করে কি বলবো ? রংমশাল যে তোমাদের আনন্দ দেয় এজন্য আমরা সবাই সুখী।

শেখর সেন (ভবানীপুর) ৯৫১

তোমাদের কথামত সম্মিলিত করবার দিন পেছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নামের বিষয় একটা চিঠি পরিচালক মশাইকে দিয়ে দিও ভাই—কেমন ?

আরতি সেন (ভবানীপুর) ৯৫১

আমার ছোট্ট বোন ! তোমার চিঠিটা পেয়ে ভারী খুসী হয়েছি। লেখনী বন্ধু তুমি কাকে নেবে তার নাম লিখো।

শৈলেন্দ্র নাথ নন্দী (শ্রীরামপুর) ১০৯০

তুমি কবিতা লিখতে পারোনা—একথা সবাইকে বলতে বারণ করেছ—আচ্ছা আমি বলবো না। রংমশালের বার্ষিক সূচীপত্র সম্বন্ধে যা লিখেছ তার বিষয় পরিচালক মশাইকে লিখো ভাই।

কুমুদ সেন (কলিকাতা) ১১৭৮

আমি মোটেই ভাবি নি যে তুমি এলে জ্বালাতে আমায়। তোমার ধারণা ভুল, রাগ কি আমি করতে পারি ভাই? কোন্ শৈলেনের সঙ্গে আলাপ করবে পুরো নাম লিখো—ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো। আমার ছবির কথা পূর্ব্বেই তো বলেছি ভাই।

শিবরাম বন্দোপাধ্যায় গ্রাঃ ৮৭৬

তোমাদের দেশ বন্যায় ডুবে গেছে শুনে খুব দুঃখিত হলাম ভাই। তোমাদের একত্র করার দিন অগ্রহায়ণের রংমশালে জানান হয়েছিল।

তরুণ তপন ঘোষ (কলিকাতা) গ্রাঃ ৭৬৭

তোমার খুব বড় চিঠি একটি আমি পেয়েছি। চিঠিখানি আমি সম্পাদক মহাশয়ের কাছে পাঠিয়েছি যা উত্তর পাবো তোমায় জানাবো। বারে বারে কেন নাম জিজ্ঞাসা করছ ভাই? দিদিভাই এর নাম দিদি ভাই ছাড়া আর কিছু নয়।

রবীন্দ্র নাথ মিত্র (কলিকাতা) ১০৭৭

তোমার লেখা যথাযোগ্য স্থানে দেওয়া হয়েছে। তুমি যা জিজ্ঞাসা করেছ তার উত্তর আমি একটু ভেবে দেবো।

অলকা ঘোষ (কট্রাসগড়)

তোমার চিঠি অনেকদিন পরে পেলাম। গ্রাহক নম্বর লিখতে ভুলেছ। তোমরা বেড়িয়ে এলে আর রংমশালের 'কাজীর বিচার' আর 'প্রেমের ঠাকুর' অভিনয় করেছিলে শুনে খুব সুখী হলাম। তুমি যার নাম লিখেছ সে ঠিকই বলেছে—তার কথা বিশ্বাস করতে পারো। যে অভিযোগ জানিয়েছ সে সম্বন্ধে প্রতিকার করবার চেষ্টা করবো।

মহম্মদ গুলজার আলী (শালিখা) ১১৮৫

তোমার চিঠি পেয়েছি। খবর দেওয়া সত্ত্বেও তুমি এসে ফিরে গেছ শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। ভুত প্রেতদের ফটো-তোলা যায় না লিখেছ, আমি ও বোধ হয় ঐ দলেরই হবো।

শিবাণী সরকার (কলিকাতা) ৪০৮

অনেকদিন পরে দিদিভাইকে মনে পড়লো কেমন? আমি তোমাদের কাউকে ভুলিনি ভাই। তোমাকে রংমশাল দলে ভর্ত্তী করা হয়েছে, তোমার ব্যাজ শীঘ্র পাবে। প্রীতির খবর কি? তাকে আমার কথা বোলো।

সুরথ বসু (চুঁচুড়া) ১১১৮

রথীশের ঠিকানা পাঠাবো। এরপর থেকে প্রত্যেক চিঠিতে ভাই পুরো ঠিকানা নাম ইত্যাদি লিখো, তাতে সুবিধা হয়।

মিণ্টুরাণী ও পিণ্টুরাণী বসু (চুঁচুড়া) ১১১৮

তোমাদের উভয়ের চিঠি আমি পেয়ে খুব সুখী হলাম। লেখনী বন্ধু কাকে চাই তোমাদের?

মাষ্টার পণ্টু (কলিকাতা)

গ্রাহক নম্বর নেই কেন? নতুন চিঠি হলেও ভাল লাগলো। দেখা হবে না, কে বলেছে?

নিশানাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা) ১০০৯

তোমার কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছি ভাই। তুমি অল ইণ্ডিয়া ইণ্টার স্কুল গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে একটা কাপ পেয়েছ শুনে ভারী সুখী হলাম। এবার তবে আমাদের মিষ্টান্ন মিতরে জনা হয়ে যাক!

প্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

আবার ভুলে গেছ গ্রাহক নম্বর, স্থানের নামও নেই কেন? শান্তিনিকেতনের গ্রাহিকা আছে, গ্রাহক নেই। গল্প যথাস্থানে দিয়েছি—যথা সময়ে জানতে পারবে ফলাফল।

তোমরা আর যারা চিঠি দিয়েছ, তাদের উত্তর দিবার মত কিছু পাইনি ভাই! তোমরা সকলে আমার প্রীতি ভালবাসা নিও। হ্যাঁ, একটা কথা—আমার কাছে অভিযোগ আসছে, রংমশাল দলের যা নিয়ম কানুন ও বিধি নিষেধ আছে, তোমাদের ভিতর কেউ কেউ তা রাখছো না। এজন্য দুঃখের চেয়ে লজ্জা আমার বেশী হয়, দুঃখিতও হয়েছি খুব এই সব অভিযোগ শুনে। আশা করি, এরপর তোমরা আর আমায় লজ্জা দেবেনা। ভবিষ্যতে এদিকে দৃষ্টি রেখে তোমরা কাজ করবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

ইতি—

তোমাদের

আমাদের কলমটা মাঝে মাঝে পাগলামি সুরু করে, এটা লিখে পড়তে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল,— কোন্ দেশের ভাষারে বাবা! কলমটা যা বলেছে তার কম বা বেশী একটি অক্ষরও সে নড়ায়নি, অথচ পাগলামি আছে ষোল আনা। দেখ কি লিখেছে, তোমরা যদি কেউ এর অর্থ করতে পারো!

(১) বালাই বুবু কখস্ত মুরছিল,
মানুষ ফাড়ানো অনে ব্যাকারনে কয় ওরা।

(২) 'দাবি রদা, আড়ি বাছো
দাড় ব নেড়ি বাই।
গেথায় কোল?
নানি জা।

(৩) রে কিচ্ছে হ?
খুমুন ওড়ছি।
হ কিবে?
বাঁত ভাধবো।

(৪) মকন খোনি মকন খোনি
ক তুচ্ছ কিমি?
দেই এখনা কেমি আমন
এঁবি ছকেছি!

নতুন প্রতিযোগিতা

ব্যাঙ-এর পাতা গল্প প্রতিযোগিতা

তোমরা গত মাসের রংমশালে ব্যাঙএর পাতার গল্পের কথা জান ও সকলেই পড়েছ। এই ব্যাঙএর পাতা রংমশালে আমরা প্রায়ই বার করব। এবার কিন্তু তোমাদের ভার—এই ব্যাঙএর পাতা গল্পে সাজিয়ে লিখে তোমাদের পাঠাতে হবে এ মাসের প্রতিযোগিতায়। মনে রেখো কিন্তু পাতাটা ব্যাঙএর, তোমাদের নয়। পাঠাবার শেষদিন ১৫ই মাঘ।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

কার্ত্তিক মাসের অঙ্গুলী-স্মৃতি কবিতা প্রতিযোগিতা

বড়দের মধ্যে প্রথম—শ্রীশিবানী সরকার, কলিকাতা, গ্রাঃ নং ৪০৮। কবিতার নাম—শেফালিকা।

ছোটদের মধ্যে প্রথম—শ্রীমান অসীম কুমার সরকার, পুরুলিয়া, গ্রাঃ নং ৩২১
কবিতার নাম—ঝরাফুল।

অগ্রহায়ণ মাসের ছোট-গল্প প্রতিযোগিতা

বড়দের মধ্যে প্রথম—শ্রী শিবানী সিংহ, গ্রাঃ নং ৪৮৪, গল্পের নাম—দিনমজুর।

ছোটদের মধ্যে প্রথম—শ্রীগৌরাঙ্গ রায়, গ্রাঃ নং ১১৮৩, গল্পের নাম—ছোটমেয়েদের ঝগড়া।

কবিতা দুটি ও গল্প দুটি এবার রংমশাল বৈঠকে প্রকাশিত হল।

গতমাসের ছদ্ম-বেশ ধাঁধার উত্তর

A=11	E=10	L=12
C=8	H=15	M=2
D=7	K=3	N=6
	O=16	

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

সাধনা অর্চ্চনা গোপাল রাখাল (গৌহাটি), শ্রীদিলীপকুমার সেন (চাঁইবাসা), শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য (রেঙ্গুন), কামাক্ষাচন্দ্র বল (ডালটনগঞ্জ), ইন্দিরা ঘোষ (ঢাকা), মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর), শিবানী সিংহ, অসীমকুমার সরকার (পুরুলিয়া), বেলা দাসগুপ্তা (কলিকাতা), প্রতিভা, রেণু, নীলা (জামসেদপুর) অর্চ্চনা সেন (কলিকাতা), অরুণ, তরুণ, সুভাষ, উষা, মীরা, মুক্তি, কিরণ, সুকুমার (কুচবিহার), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (খুলনা)।

দুটি ভুল উত্তরদাতাদের নাম

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মোহাম্মদ গুলজার আলি, সামশের আলি আহমদ; শ্রীলেখা বসু; লীলা, ইলা মন্মথ, অশোক, লীলা, শান্তা, হাঁদু, উষা, সুহাসিনী; বিনয়কুমার ঘোষ (ধানবাদ); ভাদুড়ী ভ্রাতৃবৃন্দ; নক্ষত্র রায় (কলিকাতা); বিজয়লক্ষ্মী পোদ্দার (কলিকাতা); সুবোধকুমার গুপ্ত, মণি, কালুদা, মা, বাবা, নিখিলদা, ঠাকুমা চঞ্চল, (আসানসোল); প্রদীপ, বুনু (কলিকাতা); রেবা মুখার্জ্জী (কালিঘাট); বিমলরঞ্জন রায় (পাটনা); সুরেখা বসু (কলিকাতা); সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (শিবপুর); রেখা, বাদল ও বিশু (এলাহাবাদ); শিবানী সরকার; মন্মথনাথ পাল (কিশোরগঞ্জ); মা, বাবা, জ্যোতির্ম্ময় ও জগদীশ (তেলেনীপাড়া) ছবি বিশ্বাস (কলিকাতা); অমিয়া ও আরতি দত্ত; শচীন দাস, পঞ্চানন, সমর, প্রভাত, কৃষ্ণ, প্রফুল্ল, বলাই (গোপালনগর); জগদীশ, প্রশান্ত, অনন্ত, গোবিন্দ সিংহ (কলিকাতা); তরুণ ঘোষ (কলিকাতা); প্রণব ও বিজন গোস্বামী; ব্যোমকেশ ঘোষ (হাওড়া), কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য (নাগপুর); গৌরাঙ্গ রায় (ধানবাদ) শান্তিময়ী গোস্বামী কালিঘাট); সুলতা ও সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় (বৈদ্যবাটী); পারুল সেনগুপ্ত (লাহোর) যশোধন ভট্টাচার্য্য (বিষ্ণুপুর); মিন্টু, পান্টু, বান্টু (দ্বারভাঙ্গা); শান্তি মজুমদার (গয়া); যতীন্দ্রনাথ দাস, কানাই লাল চৌধুরী (কলিকাতা); প্রভাসচন্দ্র দাস (কলিকাতা); শান্তিময় গুহ (ঢাকা); রূপবাণী রায় (ভবানীপুর) ধীরেন ঘোষ (ডিব্রুগড়); তুষারকান্তি দত্ত (ভবানীপুর); শিবপ্রসাদ সেন (নিউদিল্লী); রহিমা খাতুন (ঢাকা) বিমল ও রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; জনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (খিদিরপুর); নীরেন্দ্র চন্দন, রবীন্দ্র (আঠারবাড়ী) নিলিমা, নমিতা, নির্ম্মল, অমল (নিউদিল্লী); সন্দীপ রাও (কটক); কেয়ারাণী চৌধুরী (মধুপুর); বুলু সেন (ভবানীপুর); অরুণ ব্যানার্জ্জী (কলিকাতা); নীলিমা নাগ (টালা); নীলাদ্রি সেন (কলিকাতা); বেলাবাণী ব্যানার্জ্জী; শীলা মিত্র (গৌহাটি); অমিতাভ, মনোজিৎ, [illegible], বাসু, খুকু, বুড়ো (পুরুলিয়া); মণীন্দ্র, কানু খুকু, কৃষ্ণা, বেণু, ফড়িং (কলিকাতা); নাসীম আরা বেগম (কলিকাতা)।

ভীলের মেয়ে

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে] [শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু

আকাশ পারে

সতীকান্ত গুহ

আকাশ পারে সূয্যি তারা চাঁদের আনাগোনা
মেঘ কালো হায় সাধ তবু তার রঙের বাণী শোনা।
চাঁদ ভাবে, ছিঃ, তাও কি বা হয়!
তারারা কয়, কক্ষণো নয়!
সূয্যি তবু মেঘের মুখে ছড়িয়ে দিলেন সোনা।

তাই না দেখে ঘোমটা খুলে নিশীথ রাতে চাঁদ
জোছ্‌না আলোর রঙটি ঢালে মেঘ ভোলানোর ফাঁদ।

তালপাতার সেপাই।

সুকুমার দে সরকার

(তিন অঙ্ক নাটিকা)

পাত্র পাত্রীগণ।

তালপাতার সেপাই।	কঙ্কণ-না রাজকন্যা
লালকমল—গরীবের ঘরের ছেলে	লালকমলের মা
কঙ্কণ-না দেশের রাজা	তিন ডাইনি বুড়ি।
হুহুঁঙ্কার—দৈত্যরাজ	কঙ্কণ-না সভাসদগণ, নকীব,
কঙ্কণ-না রাণী	রাজদূত, প্রহরী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চৈত্রের শেষ। ছোট্ট গরীবের কুঁড়ে ঘর। ঘরের ভেতর সম্পূর্ণ নিরাভরণ। একদিকে একটা তেলের প্রদীপ মিটমিট করে জলছে, চারটি বাসন সাজান, একটা ভাঙ্গা প্যাঁড়ার ওপর কয়েকটা আধময়লা কাপড় কোঁচান। খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার আকাশে রাশিরাশি তারার ঝকমকি। একদিকে একটা ভাঙ্গা তক্তপোষ, তারওপর ময়লা বিছানায় লালকমল শুয়ে আছে। তারপাশে তার মুখের দিকে চেয়ে তার মা। লালকমলের বয়স বছর ছয়, মিষ্টি ফুটন্ত ফুলের মত মুখ, রোগে মলিন হয়ে গেছে। লালকমলের মা, গ্রাম্য মেয়ে অপরূপ সুন্দরী। হাতে তাঁর একটা পাখা। লালকমল চোখবুজে ছিল, হঠাৎ নড়ে উঠে চোখ খুলে মায়ের মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকাল।

মা। কি হয়েছ লাল ? কি হয়েছে অমন করে দেখছিস কেন ?

লাল। মা মা !

মা। কি রে, কি হয়েছে বাবা ? এইত আমি রয়েছি, এখনও ঘুমোস নি তুই ?

লাল। না ঘুম আসছে না, মা। চোখ বুজলেই যেন মনে হচ্ছে কারা সব আমায় ডাকছে, সেই কোথায় কতদূরে এক প্রকাণ্ড মাঠের ভেতর তারা আমায় খেলতে ডাকছে। তাদের হাতে সব কত খেলনা। কারো হাতে বা কাঠের ঘোড়া, কারো হাতে তরোয়াল, কারো হাতে বা তীর ধনুক, আবার একজন,

জান মা; তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছে। সে ভেঁপুটা প্রকাণ্ড লম্বা ঠিক যেন সেই যে রাজপুরীর গল্প বলেছিলে তুমি সেখানকার কত্তোয়ালের শিঙ্গে।

মা। কি বলছিস তুই লাল? একটু ঘুমো দেখি বাবা।

লাল। ঘুম যে আসছে না। আচ্ছা মা সব ছেলেদের কত সব খেলনা আছে, আমার জন্যে বাবা কিছু আনে না কেন?

মা। (চোখ মুছে) হা কপাল! আনবে বাবা আনবে, তুমি ভাল হও।

লাল। ওমা তোমার চোখে জল কেন?

মা। (সামলে নিয়ে) দূর বোকা চোখে জল কোথায়? চোখে একটা কুটি পড়ল কিনা তাই চোখ মুছলাম।

লাল। না আমি জানি আমরা গরীব কিনা তাই তুমি কাঁদ।

মা। (কপালে চুমো খেয়ে) কে বলেছে বাবা আমরা গরীব? এমন লাল যার আছে সে কি কখনও গরীব হতে পারে?

লাল। জানো মা আমি বড় হলে খুব বড় মানুষ হব। আমি চলে যাব সেই সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে প্রকাণ্ড এক দেশে, সেখানে কোন গরীব নেই, সেখানে কথা বললেই খেলনা পাওয়া যায়। সেই দেশে আমি বড় হয়েই চলে যাব।

মা। আর আমি বুঝি এখানে পড়ে থাকব রে?

লাল। না না তোমাকেও নিয়ে যাব আর বাবাকেও। হ্যাঁ মা, বাবা কবে আসবে?

মা। শনিবারে বাবা। জানিস লাল, এবারে তোর বাবাকে চড়কের মেলা থেকে তোর জন্যে একটা তালপাতার সেপাই আনতে বলে দিয়েছি।

লাল। (উঠে বসে) সত্যি মা সত্যি?

মা। হ্যাঁ রে।

লাল। বাঃ বেশ হবে, বেশ হবে। আমার অসুখ করে অবধি কারো সঙ্গে আমি খেলতে পাইনা, এবার এই বিছানায় বসে বসেই খেলব। হ্যাঁ মা তালপাতার সেপাই কি রকম?

মা। তালপাতার সেপাই লিকলিকে গড়ন, হাতে এক মস্ত তলোয়ার, মাথায় টুপি আর কথায় কথায় সে তলোয়ার উঁচিয়ে লাফ মারে তিড়িং তিড়িং।

লাল। বাঃ কি মজা! তালপাতার সেপাই লড়াই করে?

মা। করে বৈকি

লাল। আমিও লড়াই করব তাহলে—

মা। সে কিরে? তোর সেপাইয়ের সঙ্গে তুই লড়াই করবি?

লাল। না না তালপাতার সেপাইয়ের সঙ্গে নয়, আমি লড়াই করব দত্যিদের সঙ্গে, সেই যে তুমি বলেছিলে দত্যিপুরীর রাজা রাজকন্যাকে চুরী করে নিয়ে গেছে, আমি সেই দত্যিপুরীর রাজার সঙ্গে লড়াই করে রাজকন্যেকে কেড়ে নিয়ে আসব।

মা। আচ্ছা বাবা, এবার ঘুমিয়ে পড়, না হলে অসুখ আবার বেড়ে যাবে।

লাল। মা একটা গল্প বল না?

মা। শোন একটা ছড়া বলি—

কঙ্কণ-নার দেশে চাঁদের আলো হাসে
তেপান্তরের মাঠের শিরে মেঘের ভেলা ভাসে
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে দত্যি পুরীর দেশ
সোনার বরণ রাজকন্যে চোখের জলে শেষ
সেথায় যাবে কে?
আমার সোনার লালকমল আজ সেপাই সেজেছে

লাল। (ঘুমজড়ান স্বরে) সেপাই সেপাই তালপাতার সেপাই।

মা। তেপান্তরের মাঠে সেথায় বেজায় অন্ধকার
কঙ্কণ-নার দেশ লুটেছে দত্যি হুহুঙ্কার
অন্ধকারের মাঠ ভেঙেছে তালপাতা সেপাই
সঙ্গে যদি যাবি রে ভাই আয় ছুটে সবাই।

ঘুমিয়ে পড়েছে লাল আমার, ঘুমিয়ে পড়েছে। পাগলা ছেলে, খেলনা খেলনা করে পাগল কিন্তু এমন কপাল নিয়ে এসেছিলুম বাছার হাতে একটা কিছুও তুলে দিতে পারলুম না। হে ঠাকুর, একবার মুখ তুলে চাও, আমাদের জন্যে কিছু চাইনা কিন্তু বাছার মনে যেন কিছু দুঃখ না থাকে।

(লালকমলের মা উঠলেন, প্রদীপটা নিভিয়ে দিলেন।)

যাই ঘরের কাজগুলো সেরে রাখিগে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লালকমল ঘুমোচ্ছে, বিছানার ওপর ছেঁড়া মশারী ফেলা। ঘরে প্রদীপ নেই। জানলা দিয়ে চাঁদের মৃদু স্নিগ্ধ আলোয় ঘর মিটমিট করছে। জানলা দিয়ে একটা ধানের মরাই দেখা যায়, তারপরে মাঠ

নিশুতি রাত, চাঁদের আলোয় ধূ ধূ। জানলার গরাদ তিনটে ভেঙে গেছে একপাশে শুধু একটা উইধরা গরাদ জানলার জানলাত্বের সম্মান এখনও বজায় রেখেছে। জানলার ঠিক ধারেই একটা বকুল গাছ থেকে ফুল ঝরছে টুপটুপ। বকুল গন্ধে ঘর ভরপুর।

সেই ভাঙা জানলার মধ্যে দিয়ে প্রথমে একটা পা ঢুকতে দেখা গেল। পায়ে দরোয়ানদের মত লাল ফেট্টি জড়ান, শুঁড় তোলা দেশী জুতো। তারপরে সমস্ত শরীরটা এসে ঘরে ঢুকল। গায়ে খাকী হাঁটু অবধি লম্বা পিরাণ। কোমরে লাল শালুর ফেট্টি। মাথায় তালপাতার সৈন্যটুপী, এক হাতে মস্ত এক তালপাতার তরোয়াল আর এক হাতে লম্বা এক তালপাতার ভেঁপু। লিকলিকে প্যাংলা চেহারা, মাথায় লালকমলের চেয়ে একটু বড়। মূর্ত্তিটা ঘরে ঢুকে হাত পা ছুঁড়ে একপাক ঘুরে নিল, তারপরে মৃদু মিহিগলায় সুর করে বলে উঠল :—

তালপাতার ঝড়ে
একানড়ে নড়ে
আয়রে আয় কে যাবি ভাই
ভেঁপুর পিঠে চড়ে।

তারপরে লালকমলের বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে দর্শকদের দিকে ফিরে মূর্ত্তিটা ভেঁপুতে এক ফুঁ দিল। ভেঁপুর গম্ভীর আওয়াজ ঘরে কেঁপে কেঁপে ঘুরতে লাগল। লাল বিছানায় চমকে উঠল।

লাল। কে?

মূর্ত্তি! (চুপি চুপি) লালকমল, লালকমল?

লাল মশারী তুলে বেরিয়ে এল।

লাল। কে? তুমি কে ভাই?

মূর্ত্তি। আমি তালপাতার সেপাই
চোখের পলকে আমি তরোয়াল চমকাই

লাল। (বিস্মিত হয়ে) ও তুমি তালপাতার সেপাই?

সেপাই। হ্যাঁ তুমি যে ডাকছিলে...

লাল। কই?

সেপাই। সেই যে ঘুমোবার আগে...

লাল। একি আমি কি এখন জেগেছি? কিন্তু ঘরের ত কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমার সামনে ধূ ধূ মাঠ, ধানের গোলার পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা রাঙা পথ, চাঁদের আলোয় বকুল ফুলের গন্ধ নাচছে। একি হোল আমার ঘর কোথায় গেল? আমি কি ঘুমোচ্ছি না জেগে আছি?

সেপাই। তুমি ঘুমোচ্ছ

লাল। তবে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি কি করে?

সেপাই। ঘুমোলেই ত আমায় দেখা যায়। ঘুমের দেশের ওপার থেকে যে আমি আসি। একটি বার জেগে দেখ আর আমাকে দেখতে পাবে না, তোমার নিশ্বাসের ফুঁয়ে আমি উড়ে যাব।

লাল। না না তুমি যেয়ো না, তুমি আমার সঙ্গে খেলা কর

সেপাই। তুমি কি খেলা জান? নাচতে জান?

(সেপাই হঠাৎ হাত পা ছুঁড়ে তিড়িং তিড়িং করে নাচতে সুরু করে দিল।)

আমার নাম রামখেল সিং
তাই নাচি তিড়িং মিড়িং

কই নাচো না।

লাল। আমি জানি না

সেপাই। এঃ তুমি কিছু না। না নাচলে কি মন হাল্কা হয়? আর মন হাল্কা না হলে কি ওড়া যায়? আচ্ছা তবে কি জান? লড়াই লড়াই খেলা জান?

লাল। কার সঙ্গে?

সেপাই। কেন দত্যিদের সঙ্গে

লাল। দত্যি? হ্যাঁ হ্যাঁ দত্যিদের সঙ্গে যে আমার লড়াই করতে হবে। রাজকন্যাকে কেড়ে আনতে হবে। কিন্তু আমার যে তরোয়াল নেই।

সেপাই। সেজন্য ভাবনা কি? ওই যে মাঠের শেষে হলুদ পুকুরের ধারে একানড়ে তালগাছটা দেখা যায়, ওই যে তালের পাতা হাতছানি দিয়ে ডাকছে, ওরি তলায় গিয়ে আমি তোমায় তালপাতার তরোয়াল বানিয়ে দেব, ভাবনা কি? চল না যাই।

লাল। কিন্তু কোথায় যাব?

সেপাই। আগে যেতে হবে কঙ্কণ-না রাজার দেশে

লাল। তারপরে?

সেপাই। তারপরে রাজাকে জিজ্ঞেস করতে হবে—মহারাজ, দত্যিরাজ হুহুঙ্কার আপনার মেয়েকে চুরী করে নিয়ে গেছে, তাকে যদি আমরা ফিরিয়ে আনি তা হলে কি দেবেন?

লাল। রাজা বলবেন, অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে

সেপাই। রাজকন্যে? উঁহু রাজকন্যে নিলেই মহা মুস্কিল। তাদের বড় বায়না। এই আল্লাদী পুতুল চাই, এই পুঁতীর মালা চাই, এই বিয়ে করার জন্যে রাজপুত্তুর চাই। সে বড় বিপদ। আর রাজত্ব সে আরও বিপদ।

লাল। কেন?

সেপাই। রাজা হওয়ার মহা জ্বালা। একটু নাচতে ইচ্ছে হলে নেচেছ কি অমনি বুড়ো মন্ত্রী দাড়ী নেড়ে ছুটে আসবে। আহা আহা, করেন কি মহারাজ? আপনার সব নটীরা আছে তারা নাচবে দেখুন। কেনরে বাপু? তারা কি আর আমার মত তিড়িং তিড়িং নাচতে পারে?

আমার নাম রামখেল সিং
তাই নাচি তিড়িং মিড়িং

(সেপাই নেচে দেখিয়ে দিল)

লাল। তবে?

সেপাই। আচ্ছা আগে চলত, তারপরে দেখা যাক রাজা কি দিতে চান।

লাল। বেশ চল। আমাকে একটা তরোয়াল করে দিতে হবে কিন্তু।

চলে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজ সভা। মাঝে প্রকাণ্ড সিংহাসন রাজার। পাশেই রাণীর সিংহাসন। দুটো সিংহাসনই খালি। একপাশে একটা পাথরের ফোয়ারা। দুপাশ দিয়ে দুজন নকীবের প্রবেশ। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। দুজনেরই নকীবের বেশ।

ছেলে নকীব। শোন গো শোন

মেয়ে নকীব। মন দিয়ে শোন

ছেলে নকীব। কক্ষন-না রাজা
কেবল খান খাজা

মেয়ে নকীব। কক্ষন-না রাণী
মাথায় দোলে বেণী—

ছেলে নকীব। দত্যি হুহুঙ্কার
ঘর করেছে আঁধার

মেয়ে নকীব। কঙ্কন-না রাণী
তাই চোখে ঝরে পানি

ছেলে নকীব। কঙ্কণ-না রাজা
বেজায় মরা হাজা।

মেয়ে নকীব। আরে চুপ চুপ মহারাজ আসছে

ছেলে নকীব। এইরেঃ সেরেছে এখনি খাজা আনতে ছুটতে হবে।

মহারাজার প্রবেশ। গায়ে জমকালো রাজপোষাক। বয়সে বৃদ্ধ ইয়া লম্বা পাকা পাকা গোঁফ। মহারাজ এসে সিংহাসনে ধা করে বসে পড়লেন।

রাজা। আঃ বসে বাঁচলুম, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আর পারা যায় না। ওরে কে আছিস।

নকীবরা। (একসঙ্গে) কি হুকুম মহারাজ ?

রাজা। (চমকে) অ্যাঁ তোরা কি করছিলি এখানে ?

নকীবরা। মহারাজার গুণ-গান করছিলুম।

রাজা। (ছেলে নকীবকে) যা খাজা নিয়ে আয়, না খেয়ে খেয়ে পেট্টা ভরে উঠেছে।

নকীব। যো হুকুম মহারাজ !

আলুথালু বেশে রাণীর প্রবেশ ! রাণী অপরূপ সুন্দরী। মাটিতে তাঁর আঁচল লুটছে বেণী দুলছে পিঠে।

রাণী। রাজা রাজা !

রাজা। কি মহারাণী ?

রাণী। কিছু কি উপায় করবে না ? বাছা কি আমার চিরদিন দত্যিপুরে বন্দী হয়ে থাকবে ! আর তুমি খাজা খাবে !

মেয়ে নকীব। স্থির হোন রাণীমা

রাণী। কে কে আমায় মা বলে ডাকল ? (নকীবের দিকে ফিরে) ও তুই ? না না তোরা আমায় মা বলে ডাকিস নি। মা বলে যে ডাকত সে রইল দত্যিপুরে বন্দী হয়ে, কিসের মা আমি ? কিসের রাণী ?

রাজা। তাইত একটা কিছু উপায় ত করতে হয়। ওরে আমার খাজা কই ? খাজা না খেলে যে বুদ্ধি খুলছে না।

আগামী বারে সমাপ্য

প্যারাডাইস লষ্ট

[Paradise Lost]

শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হঠাৎ মানুষের কণ্ঠে সেই নির্জন যায়গায় তাকে এইভাবে কে ডাকছে শুনে, ঈভের মন বিচলিত হয়ে উঠলো !

যত রকম মিষ্টি কথা আছে, তাই দিয়ে, স্যাটান ঈভের মন প্রথমে ভোলাতে চেষ্টা করতে লাগলো। মিষ্টি কথায় কার না মন ভোলে ?

বিস্মিত হয়ে ঈভ জিজ্ঞাসা করলো, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! তুমি তো মানুষ নও, তবে মানুষের ভাষা কোথা থেকে পেলে ?

এই প্রশ্নই শোনবার আশা সে করছিল। গম্ভীরভাবে সে বল্লে, এই বাগানে এমন একটী গাছ আছে, যার ফল খেয়ে আমার এই দিব্য শক্তি হয়েছে ! দেখবেন, দেখবেন, সেই গাছ ?

এই বলে সে তাড়াতাড়ি ঈভকে জ্ঞান-বৃক্ষের তলায় নিয়ে গেল।

এই গাছ ! এই গাছের ফলে আমার অমরত্ব ! কোন ভয় নেই ! কিসের ভয়, এই তো আমি খেয়েছি !

এইভাবে নানা কথায় স্যাটান্ ঈভের কোমল মনকে বশীভূত করে ফেল্লে। মন্ত্র-চালিতের মত ঈভ তার নিজের হাতে গাছ থেকে একটা ফল পেড়ে খেয়ে ফেল্লে !

সেই মুহূর্ত্তে পৃথিবী যেন হঠাৎ আহত হয়ে দুলে উঠলো—সমস্ত প্রকৃতি যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সর্পরূপী স্যাটানও অদৃশ্য হয়ে গেল। কারণ, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে গিয়েছে।

ওধারে আদম কাজ সেরে, ঈভের মাথায় পরিয়ে দেবে বলে, নিজের হাতে একটা মালা গেঁথে ছুটতে ছুটতে ঈভের কাছে এলো।

সেই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়ে ঈভের মনে কেমন একটা ভয় এলো। যখন সে দেখলো তার সামনে থেকে সাপও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তখন ভয়ে সে ভেঙ্গে পড়লো। আদমকে দেখে সে সব কথা বল্লে। শুনে আতঙ্কে আদমের হাত থেকে গাঁথা মালা মাটীতে পড়ে গেল !

—কি সর্ব্বনাশ! একি করেছ তুমি! এর ফল যে মৃত্যু।

ঈভ তখন বুঝতে পারলো যে স্যাটান তাকে প্রতারিত করে গিয়েছে। কি হবে? তবে কি আদমকে ছেড়ে চলে যেতে হবে?

আদম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে, ভয় করো না তুমি ঈভ্। তোমাকে ছাড়া আমার জীবনে কি লাভ? যদি ঈশ্বরের অভিশাপে তোমার হয় মৃত্যু, তোমার সঙ্গে আমিও সে ভাগ্য বরণ করে নেবো! তুমি আর আমি অবিচ্ছেদ!

এই বলে আদম নিজে গিয়ে সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেলে।

তখন হঠাৎ দুজনার মনে কি এক পরিবর্ত্তন এলো। এতোদিন তারা লজ্জা কাকে বলে জানতো না। যেই তারা দুজনে সেই ফল খেলো, অমনি আর তারা আগেকার মতন দুজন দুজনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। ছুটে তারা দুজনে দুদিকে দুই ঝোপে গিয়ে লুকোলো। তারপর পাতার কাপড় তৈরী করে, তারা আবার পরস্পরের সামনে বেরুলো।

এধারে গার্ডেন অফ ইডেনে যে সব দেবদূত রক্ষী ছিল, তারা বুঝতে পারলো যে স্যাটান তাদের ঠকিয়ে সর্বনাশ করে গিয়েছে। তারা স্বর্গে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরকে সব জানালো।

ঈশ্বর বল্লেন, আমি জানতাম এ হবে! তবে আজ থেকে আমি অভিশাপ দিলাম, সাপের মূর্ত্তিতে স্যাটান মানবকে ভুলিয়েছে, চিরকাল তাকে নীচ হয়ে মাটীতে বুক দিয়ে হাঁটতে হবে। আর এই অপরাধের জন্যে মানবকে মৃত্যুর দুঃখ ভোগ করিতে হবে....স্বর্গে আর তার কোন স্থান নেই!

দেবদূত এসে আদম আর ঈভকে ঈশ্বরের সেই অভিশাপের কথা জানালো।

সেইদিন তারা গার্ডেন অফ ইডেন থেকে চিরকালের মত বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে ঢুকলো!

ঈভ কেঁদে উঠলো, এই মৃত্যু-ময় পৃথিবীতে সে একলা কেমন করে থাকবে?

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে দেবদূত বল্লে, একলা তোমাকে থাকতে হবে না। তোমার পাশে তোমার সঙ্গে থাকবে তোমার স্বামী! তোমার স্বামী যেখানে যাবে, তোমাকে যেতে হবে সেখানে। যেখানে থাকবে তোমার স্বামী, সে-ই হবে তোমার ঘর, তোমার নতুন জন্মভূমি!

এই বলে দেবদূত অদৃশ্য হয়ে গেল।

আদিম মানব আর আদিম মানবী পাশাপাশি মৃত্যুময় পৃথিবীতে প্রবেশ করলো।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

এরপর অনেকগুলো বছরকে পার হয়ে যেতে দিতে হবে। এর মধ্যে ছোট খাট বিপদ মংলুর জীবনে অনেক এসেছে গেছে। কিন্তু তারা আমাদের কাহিনীর বাইরেই থাক। এর মধ্যে ভাল্লুকদের সাথে মংলুর অদ্ভুত জীবন বেড়ে উঠেছে। সে আজকাল নিজের পায়ে ভাল্লুকদের সঙ্গে ছুটে বেড়ায়। ভাল্লুকের দুধ খেয়ে এই সাত বছর বয়সেই তার বুকের ছাতি দেখবার মত। তার নখর দুই হাতে বেশ প্রচণ্ড ক্ষমতা। কালার সঙ্গে মাঝে মাঝে তার কুস্তি লাগে। তখন কে হারে কে জেতে বলা যায় না। কালা আর তার দুই ভাই এখন প্রায় পূর্ণ আকারের ভাল্লুক। তার বন্য জীবনের শিক্ষার ভার নিয়েছে নালুখ।

প্রথম প্রথম মংলু ভাল্লুকদের মত চার হাত পায়ে ছুটে চলত। নালুখই তাকে শেখাল যে তার দুপায়ে চলতে হয়। হাত দুটো অন্য কাজের জন্য।

মংলু বলেছিল—কেন তুমিও চারপায়ে চল ভাল্লুকমা, কালা ভাই সবাইত চার পায়ে চলে। তবে।

নালুখ বলে—আমরা হলুম ভাল্লুক, আমাদের চারটে পাই চলবার জন্যে। যে জাতের যা। দেখিস না ময়ূর হাঁটে দুই পায়ে, সাপ চলে বুক দিয়ে? তুই হলি মানুষের ছানা তোকে দুপায়ে চলতে হবে।

—মানুষ? সে আবার কি?

নালুখ বলে—জানবি জানবি—একদিন জানবি

সে কি! আজ তার সময় হয়নি।

ভাল্লুক মা বলে—কেন ওকে ওকথা শেখাচ্ছ? ও ভাল্লুকদের মংলুই থাক। ও আমারই ছানা। নালুখ হেসে বলে—কেউটে সাপ কি কখনও তার দাঁতের বিষ ভুলতে পারে? ওকে সব শিখতে হবে শুধু ভাল্লুকদের জ্ঞান নিয়ে বাঁচলে ওর চলবে না। মংলু টিকটিকি টিকটিকিও নয়, সাপও নয় শেয়ালও নয় ভাল্লুকও নয়! ও মানুষই! মংলুর কিন্তু সে সব খেয়াল নেই। সে ভাল্লুকদের সঙ্গে ভাল্লুক হয়ে থেকেই সন্তুষ্ট। অন্ততঃ আপাততঃ। গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে, বসন্ত আসে, শীত আসে। তারা ফিরে ফিরে যায়। প্রতিটি বছরে তার বাহুতে শক্তি বাড়ে, বুকের ছাতি শক্ত হয়। ভোর বেলা উঠেই সে কালার বেঁড়ে লেজটা ধরে টান লাগায়—এই কালা ওঠ না! আকাশে আলোর গোলাটা যে দেখা দিল।

কালা আধো জাগা আধো ঘুমে শুয়ে শুয়ে তার বেঁড়ে লেজটা নাড়তে থাকে। মংলু সেই লেজ ধরে আবার টান লাগায়। কালা গর্জ্জন করে ওঠে—হু—উ—ম্!

মংলু আবার টান লাগায়। কালা চটে মটে লাফিয়ে উঠে মংলুর কাঁধে এক থাবড়া লাগায়। সেই ভাল্লুকি থাপ্পড়ে যে কোন মানুষের খোকা চেপ্টে যেতে বাধ্য কিন্তু মংলু ভাল্লুকের দুধ খেয়ে মানুষ। সে এক লাফে গুহার বাইরে এসে প্রশস্ত উরু দুটোয় দু হাতে চাপড় মেরে কালাকে ডাকে—চলে আও! কালার ততক্ষণে ঘুম ছুটে গেছে। সে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ দিয়ে শব্দ করে—অর্‌র্! মংলু বলে—ওতে ভয় পাচ্ছিনা। চলে এসো। কালা ঝাঁপিয়ে পড়ে মংলুর কাঁধে। মংলুও কালার কাঁধ দুটো ধরে লাগায় বিষম টান। দুজনে লেগে যায় কুস্তি। তারপরে একবার মংলু নীচে একবার কালা নীচে। মাঝে মাঝে কালার নখের ঘায়ে মংলুর গা ছড়ে যায়। মংলু তখন কালার কাঁধ ধরে তার পায়ে নীচে হাত চালিয়ে দিয়ে তাকে এক বিষম আছাড় মারে। কালা কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই লাফিয়ে উঠে দুই থাবা দিয়ে মংলুকে সজোরে ঠেলা মারে। মংলু গড়াতে গড়াতে সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ে।

গুহার মুখে বসে নালুখ কখনও বলে—সাবাস কালা!

কখনও বলে—সাবাস সাবাস মংলু।

সাবাস্ কালা! সাবাস্ মংলু!

পৃষ্ঠা ২৫৪

কুস্তির মধ্যেই কখনও হয়ত তারা দেখে একটা রং চঙে প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে।

মংলু বলে—ওভাই ওই দেখ একটা প্রজাপতি

কালা বলে ওঠে —কই কই ?

—ওই যে !

তখন কালা আর মংলু আর দুই ভাল্লুক ছানা ধর ধর করে প্রজাপতির পেছনে ছোটে। কিন্তু বাতাসের প্রজাপতিকে তারা ধরতে পারবে কেন ? খানিকটা ছোটাছুটিই সার। তবু তাদের বেশ মজা লাগে। খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে হাঁফাতে হাঁফাতে তারা আবার গুহার মুখে ফিরে আসে। নালুখ বলে—চল যাই নদীর ধারে, খাবার জোগাড় দেখিগে।

নালুখের পেছু পেছু মংলু আর ভাল্লুক ছানারা বেড়িয়ে পড়ে।

ভাল্লুকরা সাধারণতঃ ফলমূল মধু খায়। মাঝে মাঝে মাংসও যে শিকার করে খায় না তা নয়। মংলু কিছু দিন কাঁচা মাংস খেয়ে দেখেছে। কিন্তু মোটের ওপর কাঁচা মাংস তার ভাল লাগে না। তার নানা রকম ফল, মধু বাদাম ইত্যাদি খেতেই ভাল লাগে। বনে ওগুলো কোনটারই অভাব নেই।

নালুখ পথে যেতে যেতে তাদের নানা জিনিস শেখায়। হয়ত কোথায় একটা ঘাসের ডগা বাতাসে নড়ে উঠল। নালুখ অমনি থমকে দাঁড়াল ব্যাপারটা বুঝে নেবার জন্যে। কারণ বনে সামান্য একটু স্পন্দন, সামান্য একটু শব্দরও একটা মানে আছে। প্রথম প্রথম মংলু ততটা খেয়াল করত না। একদিন অমনি তারা বেরিয়েছে। খেলা লোভী মংলু একধারে ছুটকে এগিয়ে গেছে। তার পায়ের কাছে খানিকটা ঘাস নড়ে উঠল। মংলু খেয়াল করে নি। খেয়াল হোল যখন কেউটের মাথাটা ফোঁস করে তার সামনে গর্জ্জে উঠল। একেবারে সামনেই সাক্ষাৎ যম। সাপের মাথাটা হিস্‌স্‌ করে ছলে পেছিয়ে গেল। তখন আর পালাবারও সময় নেই কারণ সাপের ছোবল তখন পড়ছে। কিন্তু বনে গড়ে ওঠা ভাল্লুকদের মংলু অদ্ভুত ক্ষিপ্র। সাপের ছোবলটা তার বুকে পড়ার আগেই বিদ্যুতের মত তার একটা হাত খপ্‌ করে সাপের মাথাটা বজ্র মুষ্টিতে চেপে ধরল। সে মুঠ ছাড়াবার সাপের সাধ্যি নেই যতই কেন সে ছপটির মত লাফিয়ে উঠে মংলুর হাতে পাকাক না কেন। নালুখ ততক্ষণে এসে পড়েছে। সে দেখেই বলে উঠল—খবরদার মংলু ছাড়িস নি। মুঠো চেপে ধরে সাপের মাথাটা ওই পাথরে ঘস্‌। মংলু নালুখের কথা মত সাপের মুণ্ডুটা পাথরে ঘসতে সুরু করল।

আধ ঘন্টার মধ্যে কেউটে সাবাড়।

মংলু লাফিয়ে উঠে আকাশে মুখ তুলে হুঙ্কার ছাড়ল। শত্রু জয় করে বনকে জানিয়ে দিতে হয় এটা বনের নিয়ম।

আর সেই থেকে মংলু শব্দ চিনতে শিখল। ক্রমে ক্রমে প্রত্যেকটি পাতার মর্ম্মর, প্রত্যেক ঘাসের ডগাটির উপর গরম রাতের উষ্ণ শ্বাস, প্যাঁচার ডাকের প্রতিটি স্বরভঙ্গী,—গাছের বাকলে বাদুড়ের ডানার প্রতিটি মৃদুতম আঁচড়ও মংলুর কাছে অর্থময় হয়ে উঠল। নদীর জলে মাছের লাফ, বাঘের পায়ের সামান্য শব্দ, শেয়ালের হাঁচি, সজারুর কাঁটা ঝাড়া কিছুই তার কাছে গোপন রইল না। প্রতিদিন বনের প্রতিটি রহস্য তার কাছে উন্মুক্ত হয়ে যেতে লাগল।

অবশ্য এ সবের সমস্ত কৃতিত্ব নালুখের। সে এমন করে কোন ভাল্লুক ছানাকে শেখায় নি। কারণ ভাল্লুকদের অতশত দরকার হয় না। কিন্তু মংলু মানুষের বাচ্চা, ভাল্লুকদের চেয়ে তার সাধারণ ঔৎসুক্য অনেক বেশী। দিন কেটে যেতে লাগল। কখনও শান্ত শিথিল অলস দিন, কখনও ক্ষিপ্র, অদ্ভুত ভয়ঙ্কর দিন।

মোটের উপর ভাল্লুকদের মংলু এই বন্য জীবনে বেশ খাপ খেয়ে গেল। সে তখনও জানে না যে মানুষ বলে কোন জানোয়ার কোথাও আছে বা কি তাদের জীবন। সে জঙ্গলের জানোয়ারদের জীবন দেখেছে। ভাল্লুকরা কি করে, চীল কি করে ছোঁ মারে। সাপ কেমন করে ব্যাঙ ধরে, বাঘ কি করে সম্বর শিকার করে। এ সমস্ত জীবনের একটা সঙ্গতি আছে। সরল অনাড়ম্বর ও প্রয়োজনীয়।

সেদিন ভাল্লুকদের সাথে মংলু নদীর ধারে গেছে। ভাল্লুকদের মাছ ধরা বেশ দেখবার জিনিস। পাথরের ছোট ছোট টিলায় টিলায় নাচতে নাচতে পাহাড়ে নদী ছুটে চলেছে। রূপোলি জলে সূর্য্যের আলো ঝিকমিক। মাঝে মাঝে দু' একটা মাছ জলে লাফিয়ে উঠছে। নালুখ দূর থেকে তাই দেখে বলল—মাছের ঝাঁক চলেছে নদী বেয়ে, চল কালা মাছ ধরিগে। ভাল্লুকরা চুপি চুপি নদীর পাড়ে এসে জলের ওপর মুখ বাড়িয়ে বসল। তখন তাদের দেখে মনে হোতে পারত যে এরা যেন কিছুই জানে না, এমন বোকা জানোয়ার বুঝি পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু মাছের ঝাঁক যেই সেই কিনারাটা দিয়ে যেতে গেছে অমনি অত্যন্ত সহজে নালুখের মুখটা জলে ডুবেছে আর সঙ্গে সঙ্গে একটা মাছ তার মুখে উঠে এসেছে। তাই দেখে মংলুর কি হাততালি।

একবার একটা বড় মাছ নালুখের মুখ থেকেই ঝটপট করতে করতে পালিয়ে গেল। নালুখ ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে মাছটাকে ধরতে গেল। কিন্তু হাজার হোক ডাঙ্গার প্রাণী জলে জলের মাছকে ধরতে পারবে কেন?

মংলু কিন্তু ব্যাপার দেখে অবাক। সে নালুখকে জিগেশ করল—বাঃ জলে পড়ে তুমি ডুবে গেলে না?

নালুখ বলল—না, ডুবব কেন। জলে কি কেউ ডোবে কাছিমে না কামড়ালে ?

—আমি কিন্তু ডুবে যাব

নালুখ বলল—কই দেখি

এখন ভয় বলে কোন জিনিস মংলুর ছিল না। নালুখ বলা মাত্র মংলু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাল্লুকদের যদিও সাঁতার শেখাতে হয় না তারা অনুভূতির বলে আপনি শেখে— মংলুর বেলা কিন্তু নালুখ খানিকটা ব্যাপার আন্দাজ করে ছিল। তাই মংলুর সঙ্গে সেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মংলু এদিকে জলে পড়েই হাবুডুবু। সে আঁকুপাকু করতে সুরু করল। কয়েক ঢোঁক জল খেল তখনও নালুখ তাকে কোন সাহায্য করল না। তারপরে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বশে মংলুর হাত ক্রমে জলকে নীচের দিকে ঠেলতে লাগল, আর দুপায়ে ঝুপঝাপ। মংলু কোনরকমে মাথাটা জলের ওপর ভাসিয়ে তুলে দম নিতে পারল। তখন নালুখ তার একটা থাবা মংলুর পেটের তলায় দিয়ে তাকে তুলে ধরেছে। মংলু জল থেকে মাথা তুলে একমুখ জল ছেড়ে বলল—হুস্! বাব্বাঃ!

নালুখ বলল—প্রথমটা ওরকম বোকামি করলি কেন ? হ্যাঁ এইবার ঠিক হচ্ছে। সাবাস সাবাস মংলু।

নালুখ তার পেটের তলা থেকে থাবাটা সরিয়ে নিল। দুজনেই তখন স্রোতে ভেসে চলেছে।

নালুখ বলল—চল ওই দিকের ডাঙ্গায় উঠি। না উল্টো দিকে নয়, স্রোতে পা ভাসিয়ে দে। মংলু ঝুপ ঝুপ করে সাঁতার কাটতে কাটতে, স্রোতে ভেসে কূলের দিকে এগিয়ে চলল।

এমনি করে মংলু প্রথম সাঁতার কাটতে শিখল। তারপরে দিনের গতির সঙ্গে সাঁতারে সে এমন ওস্তাদ হয়ে উঠল যে ক্রমে নালুখও তার কাছে হার মানতে সুরু করল জলে।

সেদিন দুপুরে সমস্ত বন বিশ্রামে শান্ত অলস। দূরে গারো পাহাড়ের মাথার ওপর রোদে গরম একটা বাষ্প ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে যাচ্ছে। বাবুই তার তৈরী বাসার গরবে থেকে থেকে গলা বাড়িয়ে ডেকে উঠছে—কুক্ কুক! জলার ওপর নুয়ে পড়া বাঁশঝাড়ে মাছরাঙা চোখ বুজে স্থির। তার সকালের মত মাছধরা শেষ। তাই মাছেরাও অবসর বুঝে থেকে থেকে জলার ওপর ছিটকে লাফিয়ে উঠছে। জলসিক্ত তার রূপোলি দেহে আলোর ঝকমকি।

ভাল্লুকরা গুহার সামনে শাল গাছের তলায় বসে ঝিমুচ্ছে, জানোয়াররা বিশ্রামের মুখ্যে

জানে। মংলু ভাল্লুক মায়ের বুকে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় দুপুরের সেই নিস্তব্ধ অলসতা কাঁপিয়ে, আকাশে চীলের তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা গেল।

ভাল্লুক মা ওপরে তাকাল।

চীল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসছে। দুই পাখা সে ভাসিয়ে দিয়েছে বাতাসে।

—ভাল্লুকদের জয় হোক! শিকার টিকার ভাল জুটুক। ভাল্লুক গিন্নী বলল—কি গো চিল, কি খবর?

—খবর শুনে এলাম।

চীল এসে শালের মাথায় বসল।

ভাল্লুক গিন্নী বলল—কি কি?

"—কালকেতু শেয়ালকে বলছে "তোর কথায় মংলু টিকটিকিকে শিকার করতে গিয়ে একদিন প্রাণে মরতে মরতে বেঁচে গেছি। কিন্তু সে অপমান আমি ভুলিনি। তখন মংলু ছিল শেয়ালদের খাবার উপযুক্ত। এখন সে বড় হয়েছে। সে এখন বাঘের শিকার।"

তারপরে? ভাল্লুক মা বলল।

'—শেয়াল বলল "সাবাস দাদা! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ভুলেই গেছ। ওই মানুষের ছানাটা যে জানোয়ারদের মত নির্ভয়ে বনে ঘুরে বেড়ায় এ দেখে আমার গা জ্বালা করে।"

'বাঘ বলল—"হুঁ! দেখা যাক!"

ভাল্লুক গিন্নী নালুখকে ঠেলা দিয়ে বলল—শুনছ গা?

নালুখ ঝিমুতে ঝিমুতে জবাব দিল—হুঁ!

চিল বলল—খুব সাবধান ভাল্লুক গিন্নী, খুব সাবধান!

কালকেতু মোটেই সুবিধের জানোয়ার নয়!

চিল আবার চীৎকার করে আকাশে উঠে ডানায় ডানায় কালো একটা ফোঁটা হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

সাত বছর পরে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মানুষের জীবনকে রেললাইনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কোন বিশেষ ষ্টেশনথেকে তার যাত্রা আরম্ভ, কোনো বিশেষ ষ্টেশানে তা' শেষ। মাঝেপথে আছে কত অরণ্য আর মরুভূমি আর নদী; কত বৈচিত্র, কত রহস্য।

অতীতের লুপ্ত ইতিহাসের ভেতর স্মৃতির ডুবুরিকে পাঠিয়ে দিলে খালি হাতে কখনই সে ফিরে আস্‌বে না। সব সময়ে মণি-মুক্তো না পাওয়া যাক, এমন কিছু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যা কোনো বর্ষা সন্ধ্যায় চা-চপ্‌ সহযোগে অন্যদের শোনানো যায়।

হঠাৎ এই সব খাপছাড়া কথার অবতারণার কারণটা বলি। আমি বর্ত্তমান এক প্রৌঢ় অজীর্ণরোগী বাঙালী উকিল। কি রকম পসার জমেছে সে কথাটা না হয় নেপথ্যেই রইলো; কিংবা, যদি বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হই তা হলে, একটু ঘুরিয়ে বল্‌লেই এক রকম বোঝা যাবে; সব দিন ট্রাম-বাসের 'চিপ-মিডডে-ফেয়ার'ও জোটে না।

এই যে আমি, এই আমার জীবনেও একবার অত্যন্ত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল। ঠিক আমার জীবনে অবশ্য ঘটে নি, আমি ছিলুম একজন দর্শক মাত্র—ঠিক দর্শকও নয়, ছিলুম উক্ত ঘটনার একজন সাক্ষী। তবে তাতে কিছু যায় আসে না, সবটা শুন্‌লেই বুঝতে পারবে।

য়ুনিভারসিটির গণ্ডী পেরিয়ে সবে তখন কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেছি। ছাত্রাবস্থায় ছিলুম একজন নামজাদা খেলোয়াড় তাই কর্ম্মজীবনের সূচনায় সেই নিটোল স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি সংগ্রহ করে উন্নতির স্বর্ণাভ শিখরের জন্যে যাত্রা সুরু করেছিলুম। সকাল থেকে বিকেল পর্য্যন্ত বিপুল উৎসাহে খাট্‌তুম। শুধু সন্ধেগুলো নিজের জন্যে পাওয়া যেতো, খেলোয়াড়ী সবল মন তখন জেগে উঠতো, তাকে শান্ত করার জন্যে নির্জ্জন দম্‌দম রোড ধরে অনেকখানি বেড়িয়ে আস্‌তুম। সমস্ত দিনের কাজের আবর্জ্জনার ভার সেই দীর্ঘ ভ্রমণের জন্যে ফুস্‌ফুস্‌ থেকে নেমে যেতো। এই রকমেই বেড়াবার পথে একদিন অর্জ্জুণের সঙ্গে আমার আলাপ আর তার মাস দুই পরে আমার জীবনে আসে সবচেয়ে অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা।

সবে তখন শীত পড়তে সুরু হয়েছে। সন্ধেগুলো শিরশিরে ঠাণ্ডা হয়ে আসে। নির্জ্জন পথ দিয়ে হন্‌হন্‌ করে একা এগিয়ে চলেছি। মহানগরীর অক্টোপাস এদিকটায় ক্রমশঃ

এগিয়ে আস্‌ছে। বেশ বোঝা যায় আর অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই নির্জ্জনতাপ্রিয় লোকদের কর্ম্মক্লান্ত ফুস্‌ফুসের আবর্জ্জনার ভার নামাবার জন্যে অন্য কোন পথ আবিষ্কার করতে হবে!

শীতের সূচনায় সেই সন্ধ্যায় কিন্তু বসন্তের হাওয়া বইছিল। পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশ, জ্যোৎস্নার নীল আলো আকাশ চুঁইয়ে আশেপাশের গাছের ডালপালা বেয়ে নির্জ্জন পথের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। এগিয়ে এসেছি অনেক দূর। আর না এগিয়ে এবারে ফেরার জন্যে ফিরে দাঁড়ালুম।

কি অদ্ভুত পরিষ্কার রাত! গতিকে শ্লথ আর দৃষ্টিকে আল্‌গা করে ধীরে ধীরে আবার চল্‌তে সুরু করলুম। হঠাৎ একটা বাড়ী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বস্তুতঃ বাড়ীটার পাশ দিয়ে আগে অনেকবারই আসা-যাওয়া করেছি। কিন্তু দিনের আলোয় যা ভালো করে চোখে পড়ে না, আজ রাত্রির স্বচ্ছ অন্ধকারে তা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

বিরাট বাড়ী। রাস্তা থেকে খানিক পেছিয়ে নিজের বাগানের ভেতরে তা' স্তব্ধ, নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একবার দেখলেই বোঝা যায় কোনো বিলাসী ধনীর এটা বাগান-বাড়ী ছিল এককালে। তার বাগান পথ আর দেয়াল ইত্যাদি দেখলে সহজেই বোঝা যায় তাকে যত্ন করার জন্যে কেউই এখন আর নেই। একটা করুণ ছন্নছাড়া ভাব তার সর্ব্বাঙ্গে। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ফিরছিলুম হঠাৎ বিশেষ একটা ঘটনায় আমার চিন্তারস্রোত অন্য দিকে মোড় ঘোরালো।

কিছু দূরে একটা মোটারকার ঝড়ঝড় শব্দ করতে করতে এগিয়ে আস্‌ছিল, তার সামনেই দেখতে পেলুম একটা চলন্ত সাইকেলের কম্পিত হল্‌দে আলো। পথে শুধু তারাই ছিল চলমান বস্তু, (অবশ্য নিজেকে বাদ দিয়ে)। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তবুও তাদের ধাক্কা লাগল! দোষটা অবশ্যই সাইকেল আরোহীর, মোটরকারটার সাম্‌নে কেনো যে সে হঠাৎ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আস্‌তে গেল, তা বোঝা শক্ত। ব্রেক করে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গেল, পথের একপাশে সাইকেল আরোহী ছিট্‌কে পড়েছে। এক দৌড়ে ঘটনাস্থলে চলে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ ঘটল একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। মোটর চালক আলোগুলো নিভিয়ে সশব্দে গিয়ার বদলে অকস্মাৎ ছুটে বেরিয়ে গেল আমার পাশ দিয়ে। বোধ হয় সে আমাকে স্থানীয় পুলিশ বলে ভুল করেছিল।

গায়ের ধুলো ঝেড়ে লোকটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, তারপর একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে আবার বসে পড়ল।

তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস্ করলুম, "খুব লেগেছে কি? কোথায়?"

"হ্যাঁ...না-না, তেমন কিছু নয়, এই আমার গোড়ালির কাছটায়, সামান্য"

যন্ত্রনায় ভদ্রলোকের কপালটা কুঁকড়ে উঠল, "কিন্তু যন্ত্রণা হচ্ছে বেশ। আপনার হাতটা বাড়িয়ে দেবেন কি ? উঃ..."

আমার হাতটা ধরে কোন রকমে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু একটা পা শূন্যেই রয়েছে। "এটা মাটিতে নামাতে পারছি না" আমার কাঁধে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো। বয়েস খুব বেশী নয় তার রক্তহীন পাণ্ডুর ঠোঁট আর বড় চোখ দুটোর ভীতু দৃষ্টি দেখলেই তার দুর্ব্বল স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনরকম সন্দেহ থাকে না।

"কোথায় থাকেন ?"

"এইখানে।" সেই স্তব্ধ অন্ধকারময় বিরাট বাড়ীটার দিকে সে আঙুল দেখালো। "বাড়ী পর্য্যন্ত আমায় নিয়ে যাবেন কি ?"

"নিশ্চয়।" সাইকেলটাকে বাড়ীর বাগানের একধারে রেখে এসে তাকে নিয়ে চল্‌লুম। কোথাও একটুও আলো নেই। সিঁড়িগুলো পেরিয়ে আমরা বিরাট্ হল-ঘরটায় এলুম। এখানকার নিস্তব্ধ অন্ধকারের দিকে চাইলে মনেই হয় না কেউ এখানে কোনকালে ছিল।

"ডানদিকের দরজা দিয়ে যেতে হবে", ভদ্রলোক বল্‌লো। হাৎড়াতে হাৎড়াতে আমরা আর একটা ঘরে এলুম। টেবিলের ওপর কোরোসিনের একটা বাতি ছিল। সেটা জ্বালিয়ে সে বল্‌ল "এখন আমি সম্পুর্ণ সুস্থ বোধ করছি। আপনি যেতে পারেন, বহু ধন্যবাদ।" ভদ্রলোক আরাম কেদারাটায় এলিয়ে পড়ে' একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলো!

আমার অবস্থা তখন যে কি রকম শোচনীয় ধরণের অসহায়, সহজেই তা' অনুমেয়। রক্তহীন ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে, মুখের রঙ্‌ও বিভৎস শাদা। প্রথমে মনে হয়েছিল ভদ্রলোক বুঝি বা মারাই গেলো! কারুর কাছে সাহায্য পাবার জন্যে ঘরের বাইরে এসে সেই অন্ধকারেই বার কয়েক চীৎকার করলুম, "বেয়ারা বেয়ারা" কিন্তু নিরুত্তর নিস্তব্ধতা দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'ল না এই বিরাট বাড়ীটায় আর কেউ থাকে! আমি আরো কয়েকবার ডাকাডাকি করলুম, অপেক্ষা করলুম আরো খানিক, কিন্তু সেই নির্ম্মম অন্ধকারে জীবনের কোন মর্ম্মরই জাগল না। কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা যায় না, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে একলা ফেলে আলোটা নিয়ে আমাকে বেরুতে হল সাহায্যের জন্যে।

ঘরের বাইরে এসে কিন্তু বিস্মিত হলুম। হল ঘরটা খালি, দোতালায় ওঠবার সিঁড়িটায় কারপেট নেই, অনেকটা পুরু হয়ে ধুলো জমেছে তার ওপর। এগিয়ে চল্‌লুম। প্রত্যেকটা ঘরেই সেই এক ধরণের অসহায় রূপ। দেয়ালের কোনে কোনে কত বছর ধরে মাকড়সাদের জালগুলো পুরু হয়ে উঠেছে কে জানে! একটা বিচ্ছিরি স্যাঁৎসাঁতে গন্ধ। কতকাল ধরে এই দীর্ঘ অসহায় নির্জ্জন ঘরগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু এ বাড়ীতে আর

কেউ যে থাকে তার সামান্যতম ইঙ্গিতও পেলুম না! আর একটা বারান্দায় এসে পড়লুম, এটা শেষ হয়েছে বিরাট একটা তামাটে দরজার কাছে। দরজাটা তালা বন্ধ এবং সেই বন্ধ তালার ওপর লাল গালা দিয়ে শিলমোহর করে দেওয়া হয়েছে। দেখেই বোঝা যায় বহুদিন ধরে এটা ঐ রকমভাবে পড়ে রয়েছে কারণ ধূলো জমেছে প্রচুর আর লাল গালার রঙটা বদ্‌লে গিয়েছে। তখনো আমি কৌতূহলী হয়ে চেয়ে ছিলুম দরজাটার দিকে, এমন সময় আচমকা একটা আর্ত্তনাদ বাতাসে ভেসে এলো। এক দৌড়ে সেই আগেকার ঘরটায় চলে এসে দেখি ভদ্রলোকের জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং কোনোখানে আলোর চিহ্ন নেই দেখে সে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছে খুব।

"আলোটা নিয়ে কেনো আপনি বাইরে গিয়েছিলেন?" রুক্ষ গলায় ভদ্রলোক প্রশ্ন করলো।

"আমি সাহায্য পাবার জন্যে বাইরে গিয়েছিলুম।"

"আপনার বোঝা উচিত ছিল এখানে আমি একাই থাকি।"

"খুবি খারাপ কথা। যদি হঠাৎ আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন?"

"তা ঠিক। এ' রকম আচম্‌কা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া আমার অন্যায় হয়েছে। মা'র কাছ থেকে এই ধরণের দুর্ব্বল হার্ট পেয়েছি। সামান্য উত্তেজনা বা যন্ত্রনাতেই এ রকম প্রতিক্রিয়া আমার ওপর হয়। কিছুদিন এখন এ' রকম অসুস্থতায় কাটবে, তাঁর যেমন কেটেছিল—কিন্তু আপনি কি ডাক্তার?"

"না উকিল—শৈলেশ চৌধুরি আমার নাম।"

"আমার নাম অর্জ্জুন রায়। কিন্তু অদ্ভুত, একজন উকিলের সঙ্গে এ'ভাবে আমার আলাপ হওয়া। কারণ আমার বন্ধু নির্ম্মল বল্‌ছিলেন শীগগিরিই একজন উকিলের সাহায্য আমাদের লাগবে।"

"অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই আমি সাহায্য করব।"

"কিন্তু নির্ম্মলবাবুর ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনি কি আলো নিয়ে একতলার সমস্ত ঘরগুলোয় ঘুরেছেন?" উত্তেজনায় তার চোখ দুটো চক্‌চক্ করতে লাগল।

"হ্যাঁ।"

"সব ঘরেই?" মানসিক উত্তেজনাকে দাঁতের মধ্যে পিষে ফেলে আবার সে জিগগেস্ করলো।

"আমার তো তাই মনে হয়। আশা করে ছিলুম, কারুর দেখা..."

বাধা দিয়ে অর্জ্জুন বল্‌লো, "সব ঘরের মধ্যে কি আপনি গিয়েছিলেন ?" সেই তীক্ষ্ণ চক্‌চকে চাউনি আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন ছড়িয়ে পড়ল।

"হ্যাঁ, যে সমস্ত ঘরে যাওয়া সম্ভব।"

"ওঃ,তা' হলে তো নিশ্চয়ই আপনি সেটা লক্ষ্য করেছেন।" সে অবসাদে ভেঙ্গে পড়লো।

"লক্ষ্য ? কি ?"

"কেনো, সেই শিল-মোহর করা দরজাটা ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি বটে।"

"ভেতরে কি আছে জান্‌তে কৌতূহল হয় নি আপনার ?"

"কতকটা ; মানে কি রকম অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল, এই পর্য্যন্ত।"

"আপনি কি বছরের পর বছর এ' বাড়ীতে একা থাক্‌তে পারেন ? অপেক্ষা করে থাক্‌তে পারেন কি সেই দিনের জন্যে যে-দিন ঐ বন্ধ ঘরের রহস্য জান্‌বার জন্যে তালাটা খুল্‌তে পার্‌বেন ?"

"আপনি কি বল্‌তে চান ও ঘরে কি আছে জানেন না ?" উত্তেজিত হয়ে আমি প্রশ্ন কর্‌লুম।

"না, আপ্‌নার চেয়ে বেশী কিছুই জানি না।"

"কিন্তু কেনো আপনি চেষ্টা করেন নি জান্‌তে ?"

"বারণ আছে!" ক্লান্তি ও উত্তেজনা মিলিয়ে অর্জ্জুণবাবুর গলার স্বরটা কি রকম যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠ্‌ল।

এতোক্ষণে মনে হ'ল অন্য লোকের গোপনীয় খবর জান্‌বার কৌতূহল অনেক আগেই আমার চেপে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়ায় আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি অসাড় হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক্‌, অর্জ্জুন যখন সুস্থ হ'য়ে উঠেছে তখন আর অনর্থক দেরী করার মানে হয় না। তাই আমি দাঁড়িয়ে উঠে বিদায় চাইলুম।

"আপনার কি তাড়াতাড়ি আছে ?"

"না ; এখন আমার কোনো কাজ নেই।"

"আরো কিছুক্ষণ এখানে থাক্‌লে বিশেষ আনন্দিত হব। আমার মত নির্জ্জন নিঃসঙ্গ জীবন আর কেউ কাটায় বলে মনে হয় না।"

বসে পড়ে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লুম। আস্‌বাব পত্র বিশেষ কিছুই নেই। এই বিরাট রিক্ত বাড়ীটার কথা বারবার মনে পড়তে লাগ্‌ল : মাকড়সার জাল আর পুরু ধূলির প্রলেপ আর সেই বন্ধ দর্‌জাটা!

"শৈলেশবাবু, ক্ষমা করবেন, আমার শরীর অসুস্থ বলে কিছুই অতিথেয়তা করতে পারছি না। ঐখানে সিগারেটের টিনটা আছে, কষ্ট করে যদি নিয়ে আসেন! —হ্যাঁ; আপনি তাহলে উকিল ?"

"হ্যাঁ।"

"আর আমি ? কিছুই না।—একজন ক্রোড়পতির হতভাগ্য ছেলে! বিলাসিতার মধ্যে আমার শৈশব কেটেছে, কিন্তু এখন দেখতেই পাচ্ছেন: গরীব; না আছে চাকরি না আছে স্বাস্থ্য। ঐ বাড়ীটা যদিও আমার, তবু একে যত্ন করে রাখার মত সামর্থও আমার নেই। এটা একটা ভয়ানক খাপছাড়া ব্যাপার নয় কি ?"

"কিন্তু এ'কে বিক্রী করে দেন না কেন ?"

"বারণ আছে।" আবার সেই অসহায় স্বর।

"তা হলে ভাড়া দিন।"

"না, তা-ও অসম্ভব।"

আমি বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলুম আর আমার নতুন বন্ধু ফিকে দুর্ব্বল হাসতে লাগলো।

"আপনি যদি বিরক্ত না হ'ন সমস্ত ব্যাপারটা খুলেই বলি।"

"বিরক্ত ? নিশ্চয়ই নয়। সব ব্যাপার জানতে আমার তো অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে।"

কোনো ভূমিকা না করেই ভদ্রলোক বল্লো, "আমার বাবার নাম হয়তো শুনে থাকবেন —নীরেন্দ্রনাথ রায়, ব্যাঙ্কার।"

আমি চমকে উঠলুম! নীরেন্দ্রনাথ রায় ? বছর ছ'-সাত আগে হঠাৎ তাঁর গা-ঢাকা দেওয়াটা সমস্ত সমাজের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

"আপনার মনে আছে দেখছি," অর্জ্জুন রায় বলে চল্লো, "হ্যাঁ, বাবাকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। কারণ তাঁর ব্যাঙ্কের টাকা তিনি যে স্পেকুলেশানের জন্যে খরচ করেছিলেন তা প্রথমে সফল হয় নি। তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, এই দুর্ঘটনা তাঁর বিচার-শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। আইনত তিনি কোনো অপরাধ করেন নি। কিন্তু লজ্জায় আর অনুশোচনায় কারুর কাছেই তিনি মুখ দেখাতেন না, এমন কি আমাদের সাম্‌নে আসতেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করতেন।—বিদেশে অপরিচিত লোকদের ভেতর তিনি মারা গেছেন, কিন্তু কখনই তিনি জানান নি, কোথায় আছেন।"

"তিনি মারা গেছেন ?" চমকে উঠে আমি জিগগেস করলুম।

"তাঁর মৃত্যুর প্রমাণ কিছু নেই, কিন্তু আমরা জানি এ' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না

কারণ, তিনি যে স্পেকুলেশান করেছিলেন তা' আবার সফল হয়েছে। এখন তো তাঁর আর লুকিয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। বেঁচে থাক্‌লে নিশ্চই তিনি ফিরে আস্‌তেন। কিন্তু গত দু' বছরের মধ্যে তিনি মারাই গিয়েছেন নিশ্চয়ই।"

"কিন্তু গত দু' বছরের মধ্যে কেন?"

"কারণ, তাঁর শেষ চিঠি আমরা দু' বছর আগে পেয়েছিলুম।"

"তিনি কোথায় আছেন সে কথা কি জানান নি তা' হলে?"

"চিঠিটা রেঙ্গুণ থেকে এসেছিল। কিন্তু কোনো ঠিকানা ছিল না। আমার মা তখন সবে মারা গিয়েছেন। চিঠিতে কতকগুলি উপদেশ ও ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা ছিল। সেই শেষ চিঠি।"

"এর আগেও কি খবর পেতেন তাঁর?"

"ও, হ্যাঁ, আগেও তাঁর চিঠি পেয়েছি, এবং সে চিঠিতেই ওই বন্ধ ঘর সম্বন্ধে প্রথম ইঙ্গিত পাই। ওই সুট্‌কেশটা আমার দিকে এগিয়ে দেবেন কি?—ধন্যবাদ। এটাতেই আমার বাবার চিঠিগুলি আছে। নির্ম্মলবাবু ছাড়া আপনিই প্রথম বাইরের লোক যিনি এ' চিঠি পড়ছেন।"

"নির্ম্মলবাবু কে আমি কি জিগ্‌গেস্ করতে পারি?"

"তিনি আমার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন এককালে। তারপর থেকে আমাদের সংসারের পরামর্শদাতা এবং বন্ধুই তিনি এখন। নির্ম্মলবাবু না থাক্‌লে কি যে আমাদের হত, জানি না। তিনি ছাড়া এ' সব চিঠি আর কেউই দেখেন নি।—এইটা প্রথম চিঠি; বাবা যে দিন নিরুদ্দেশ হন, প্রায় সাত বছর আগে, ঐ চিঠিটা এসেছিল ঠিক তার পরের দিন। পড়তে পারেন ওটা।"

চিঠিটা তাঁর স্ত্রীকে লেখা। আমি পড়্‌তে লাগ্‌লুম:

"—ডাক্তারের মুখে শুনেছি তোমার স্বাস্থ্য কি রকম খারাপ। সেজন্যে আমার ব্যবসার কথা কোনোদিনই তোমার সঙ্গে আলোচনা করিনি, পাছে অত্যধিক উত্তেজনার জন্যে আরো বেশী অসুস্থ হ'য়ে পড়। কিন্তু এখন এমন সময় এসেছে যা'তে তোমাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি। ব্যবসার অবস্থা এখন বিশের খারাপ, সে জন্যে কিছুদিনের জন্যে বিদায় নিতে হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আবার দেখা হ'বে। ঐ কারণে অনর্থক দুঃখিত বা চিন্তিত হয়ে তোমার স্বাস্থ্য আর খারাপ কোরো না।

"এখন যা' যা' বলি মন দিয়ে শোনো। যে অন্ধকার ঘরে আমি ফটোর কাজ করতুম সেখানে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যা' আমি কাউকে দেখাতে চাই না। কিন্তু নিশ্চিন্ত

থেকো, সে ঘরে এমন কিছু নেই যার জন্যে তোমরা লজ্জিত হ'তে পারো। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আমি চাই না তুমি কিংবা খোকা সে ঘরে যাও। সে ঘরে তালা লাগানো আছে, এবং আমার একান্ত অনুরোধ এ' চিঠি পাবার পরেই সেই তালার ওপর যেন গালা দিয়ে 'সিল্' করে দেওয়া হয়। ঐ বাড়ী বিক্রী কোরো না, বা ভাড়া দিয়ো না, কারণ তা' হলে সমস্তই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। খোকা যখন একুশ বছরে পড়বে তখন সে ঐ ঘরে আস্তে পারে, তার আগে নয়।

"নির্ম্মলের ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাকে সব কথা বল্তে পারো আর সময়ে-অসময়ে যে কোনো সাহায্য নিতে পারো। এখন বিদায়। ৭।১।১৭

নীরেন্দ্রনাথ রায়।"

অর্জ্জুন রায় চিঠিটা পড়া হয়ে যেতেই বল্লো, "আপ্নার সাহায্য দরকার হবে বলেই নিতান্ত গোপনীয় এই চিঠি দেখালুম।"

"আপনার বিশ্বাসের জন্যে আমি সম্মানিত," আমি বল্লুম, "এবং সমস্ত শুনে অত্যন্ত কৌতূহলীও হয়ে উঠেছি।

"আর দেখুন, বাবা ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী। তাই যখন তিনি লিখেছেন যে আবার দেখা হ'বে এবং ওই বন্ধ ঘরে এমন কিছু নেই যার জন্যে আমরা লজ্জিত হতে পারি,—এ' কথায় নিঃসন্দেহে বিশ্বাস রাখা যেতে পারে।"

"কিন্তু তা' হলে আর কি হ'তে পারে?"

"সেইটাই তো মস্ত একটা ধাঁধাঁ— আমি কিংবা মা কেউই অনেক ভেবেও এর কোনো উত্তর পাই নি। তাঁর কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। ঘরটায় তখন থেকেই সিল্ করে দেওয়া হয়েছে। মা'র হার্ট খুব দুর্ব্বল ছিল, কিন্তু তবুও বাবার চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি আরো পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন। মা, বাবার কাছ থেকে আরো দু'টো চিঠি পেয়েছিলেন তাঁর অদৃশ্য হ'বার প্রথম ক' মাসের মধ্যেই। সে দুটো চিঠিতেও একই কথা ছিল; শিগগীরই দেখা হবে। সে দু'টো চিঠিতেও রেঙ্গুনের পোষ্ট-অফিসের ছাপ ছিল। তারপর সব চুপ্‌চাপ্, যতদিন পর্য্যন্ত না মা মারা যান। তারপর এলো আমার নামে আর একটি চিঠি। এতো গোপনীয় ধরণের যে তা আপনাকে দেখাতে পারবো না। তবে তার প্রধান বক্তব্য ছিল এই, যে মা যখন মারা গিয়েছেন তখন আর ও ঘর বন্ধ রাখার অত বেশী প্রয়োজন নেই। তবে সে ঘরে এমন কিছু আছে যা প্রকাশিত হলে অনেকেই, বিশেষ করে আমি, অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'ব। সে কারণে আমার একুশ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন ও ঘর না খুলি। ওই ঘরের সমস্ত ভারই আমার ওপর এসে পড়ল। অতএব বুঝ্তে

পার্‌ছেন, নিজের সাংসারিক ও আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কেনো আমি এ-বাড়ী ভাড়া দিতে কিংবা বিক্রী কর্‌তে পার্‌ছি না। একে একে বাড়ীর আস্‌বাব-পত্র বিক্রী কর্‌তে হয়েছে, চাকরদেরও ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। —কিন্তু আর দু' মাস মাত্র আমাকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে। তারপরই আমি বন্ধ-ঘরের রহস্য জান্‌তে পারবো।"

"কিন্তু হয়তো আপ্‌নার বাবা বেঁচে আছেন।"

"কখনই তা'হ'তে পারে না, নিশ্চয়ই তিনি মারা গিয়েছেন। নইলে তো ফিরেই আসতেন।"

"কিন্তু তাঁর চিঠিগুলো আসে কি করে?"

"জানি না।"

"কেন তিনি ঠিকানা লুকিয়ে রাখ্‌লেন?"

"জানি না।"

"কেনো আপনার মা'র মৃত্যুর সময়েও তিনি এলেন না?"

"জানি না।"

সেই অল্প আলোয় ভরা ঘরে আমরা দু'জনে অনেক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌ বসে রইলুম। তারপর নিজের ঠিকানা তাঁর কাছে রেখে বিদায় নিলুম।

সেদিন সকালে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলেন, উক্ত ঘটনার অনেক দিন পরে। ইতিমধ্যে নানা কাজের চাপে অর্জ্জুন রায়ের কথা প্রায় ভুলেই এসেছি।

ভদ্রলোকের নাম নির্ম্মল লাহিড়ী; ছোট্ট বেঁটে লোক, তামাটে রঙ্‌, শুক্‌নো চাম্‌ড়া, কিন্তু চোখ দুটো বেশ উজ্জ্বল।

"অর্জ্জুনের কাছে বোধ হয় আমার নাম শুনে থাক্‌বেন।" নমস্কার করে ভদ্রলোক আমাকে বল্‌লেন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি।"

"সে তার বাবার অদৃশ্য হওয়ার খবর আপনাকে বলেছিল, আর সে বন্ধ ঘরের কথাটাও। আপনি বলেছিলেন সাহায্য কর্‌বেন। ভুলে যান নি বোধ হয়।"

"নিশ্চয়ই না," জোর দিয়ে আমি বলে উঠলুম।

"আজ অর্জ্জুনের জন্মদিন, সে একুশ বছরে পড়্‌ল।"

উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌লুম, "ঘরটা কি খোলা হয়েছে?"

"এখনো নয়," গম্ভীর গলায় ভদ্রলোক বলে চল্‌লেন, "আমার মনে হয় একজন সাক্ষীর এক্ষেত্রে দরকার। আপনি একজন উকিল এবং ঘটনার বিবরণও জানেন। আপনি কি দয়া করে এ' বিষয়ে সাহায্য কর্‌বেন?"

"নিশ্চয়ই।"

"সারাদিন আপনি কাজে ব্যস্ত থাকেন। আমারও কাজ আছে। সন্ধ্যের দিকে কি সুবিধে হবে আপ্‌নার?"

"বেশ, সন্ধ্যের সময়েই যাবো।"

"বহু ধন্যবাদ। আমরা আপ্‌নার জন্যে অপেক্ষা করে থাক্‌বো।" আবার নমস্কার জানিয়ে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

সে দিন সমস্তক্ষণ অত্যন্ত অস্বস্তিকর উত্তেজনার মধ্যে কাট্‌লো। যাই হোক সন্ধ্যের মুখে আবার সেই বিরাট্ স্তব্ধ বাড়ীটায় এসে পৌছুল্‌ম। সেই ছোট ঘরটায় নির্ম্মল লাহিড়ী আর অর্জ্জুন রায় আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। অর্জ্জুনের মুখ চোখ উত্তেজনায় ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে আর সেই শুক্‌নো-চামড়া ছোট্ট লোকটিও অস্থির হয়ে সমস্ত ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

"চল্‌ন, যাওয়া যাক্। এই অভিশপ্ত বাড়ীতে আর এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না।" অর্জ্জুন রায়ের গলায় অস্বাভাবিক অসুস্থ উত্তেজনা।

সেই প্রৌঢ় লোকটি আলোটা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্‌লেন। আমরা চল্‌ল্‌ম পেছনে। সমস্ত বাড়ীটা আর তার বিরাট অসহায় ঘরগুলো মাকড়সার জাল বুকে নিয়ে যেন বিরাট একটা ভয়ঙ্কর কিছুর জন্যে নিশ্বেস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমরা সেই ঘরটার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল্‌ম। প্রৌঢ় লোকটির হাত অস্বাভাবিক রকম কাঁপচে, আমাদের ছায়াগুলো দেওয়ালের ওপর দুল্‌ছে সেই অপ্রচুর আলোর কম্পনে।

"শোনো খোকা," ভাঙা গলায় প্রৌঢ় ভদ্রলোক অর্জ্জুনকে বল্‌তে সুরু করলেন, "আমাদের একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত হওয়া ভালো।"

"কেনো, ভেতরে কি আর থাকতে পারে?" সাহস দেবার জন্যে আমি বল্‌ল্‌ম।

"তা তো আমাদের জানা নেই, তবে....তবে, তবুও আমাদের প্রস্তুত...হ্যাঁ, প্রস্তুত হওয়া উচিত যদি..." প্রত্যেক কথার মধ্যে তাঁকে থাম্‌তে হচ্ছিল, এবং শেষে হঠাৎ যেন আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে তিন চুপ্ কর্‌লেন আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল; আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারল্‌ম ওই প্রৌঢ় শুক্‌নো-চামড়া ভদ্রলোকটি সমস্তই জানেন এবং ঘরের ভেতর নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কোন দৃশ্য সাত বছর ধরে ল্‌কিয়ে রয়েছে।

"এই নাও চাবি, কিন্তু খোকা প্রস্তুত হ'য়ে নাও।"

এক রকম ছিনিয়েই অর্জ্জুন রায় সেটা নিল। প্রৌঢ়ের হাত থেকে আলোটা নিয়ে আমি তালাটার ওপর ধরল্‌ম। তালাটা ভাঙা হল, চাবিটা ঘুর্‌ল একপাক, খুল্‌ল তালা,
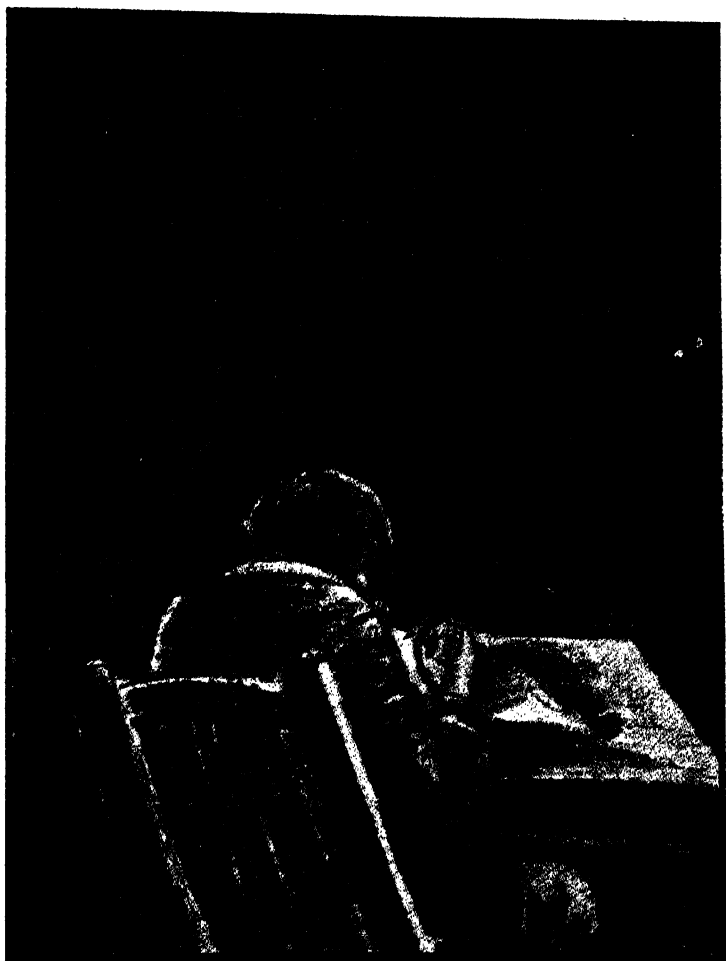
প্রথমে জীবন্ত বলেই মনে হয়েছিল — পৃষ্ঠা ২৬৮

হুড়মুড় করে অর্জ্জুন রায় ঢুক্‌লো ঘরে, তারপরেই বিভৎস একটা চীৎকার আর অর্জ্জুন রায়ের জ্ঞানহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

আমার দেহ অত্যন্ত সবল ও সুস্থ না হলে অন্ততঃ আলোটা নিশ্চয়ই হাত থেকে পড়ে যেতো। ঘরটার কোনো জান্‌লা নেই, কতগুলো ফোটোগ্রাফির যন্ত্রপাতিতে ভরা। শেল্‌ফের ওপর নানা ধরণের ওষুধ পত্র ; ঘরে সাত বছরের রুদ্ধ ভাপ্‌সা একটা গন্ধ। ছোট একটা টেবিল, তার সাম্‌নে একটিমাত্র চেয়ার আর সেই চেয়ারে আমার দিকে পেছন করে এক ভদ্রলোক বসে আছেন লেখার ভঙ্গীতে। প্রথমে জীবন্ত বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু ভালো করে আলোটা পড়তেই সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠ্‌ল : তাঁর গলার জায়গাটা কুঁক্‌ড়ে অস্বাভাবিক সরু আর কালো হয়ে গিয়েছে—পুরু হল্‌দে ধূলো জমে উঠেছে তার ওপর, সাত বছরের পুঞ্জিত ধূলো ; ধূলো জমে উঠেছে তাঁর চুলে, তাঁর কাঁধে, তাঁর হাতে। মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, কলমটা তখনও বিবর্ণ কাগজের ওপর রয়েছে ধরা।

"নীরেন বাবু নীরেন বাবু......," প্রৌঢ় ভদ্রলোকের গলা থেকে আর্ত্তস্বর বেরিয়ে এসে সেই সাত বছরের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে লাগ্‌ল, "নীরেনবাবু, নীরেনবাবু..."

"কি বল্‌লেন ?" আমিও উত্তেজিত গলায় প্রশ্ন কর্‌লুম, "ইনিই কি নীরেনবাবু ? অর্জ্জুনবাবুর বাবা ?"

"সাত বছর ধরে এখানে ইনি বসে রয়েছেন ! আমি কত তাঁকে বোঝালুম, কত বল্‌লুম, এমন কি পায়েও ধর্‌লুম, কিন্তু শুনলেন না তিনি কিছুতেই। টেবিলের ওপর এই যে চাবি দেখ্‌ছেন এই চাবি দিয়ে তিনি ভেতরের দরজাটায় তালা লাগিয়ে দেন। তিনি আরো কি লিখেছেন ; এ' চিঠিটা আমরা বাইরে নিয়ে যাবো।"

"চিঠিটা শিগ্‌গীর নিয়ে বাইরে চলুন, ঈশ্বরের দোহাই ; ঘরের বাতাসে বিষ ছড়িয়ে পড়েছে।"

সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর আমি অর্জ্জুনকে ধরাধরি করে ছোট ঘরটায় নিয়ে এলুম। ক্রমশঃ তার জ্ঞান ফিরে এলো, "বাবা ঐ চেয়ারে বসে রয়েছেন। কিন্তু নির্ম্মলবাবু আপনি তো সব জান্‌তেন ? সাবধান করে দেবার সময় এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন আপ্‌নি !"

"হ্যাঁ খোকা, আমি জানতুম। সাত বছর ধরে কি কঠিন অভিনয়ই না কর্‌তে হয়েছে আমাকে। সাত বছর ধরে আমি জানি তোমার বাবা ও ঘরে মরে পড়ে রয়েছেন !"

"এ' কথা জেনেও আপ্‌নি জানান নি কিছু ! এ' চিঠিগুলো, এগুলো কি সব জাল ?"

"তোমার বাবা নিজেই ওগুলো লিখে খামে বন্ধ করে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে আমি পালন করেছি। নিজে প্রত্যেক চিঠি ডাকে দিয়েছি

রেঙ্গুনে গিয়ে।" নির্ম্মলবাবু খানিক চুপ করে ধীরে ধীরে আবার বলে চল্‌লেন, "তোমার বাবার দুঃসময়ের কথা তো সবই জানো। তিনি ভেবেছিলেন শুধু তাঁরই দোষের জন্যে অনেক লোককে অনেক টাকা লোকসান দিতে হচ্ছে। তাঁর মন এতো সরল এতো কোমল ছিল যে এ' চিন্তা কিছুতেই সহ্য করার মত শক্তি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। এ' চিন্তা তাঁকে এতোদূর বিচলিত করল যাতে তিনি আত্মহত্যা করাই ঠিক করলেন। খোকা, যদি তুমি জান্‌তে আমি কত অনুনয়, কত মিনতি করেছিলাম তা' হলে কিছুতেই আমাকে দোষ দিতে না। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নড়ানো গেল না। এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞার কথা তাঁর দু'চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ল। তিনি শুধু আমাকে বল্‌লেন আমি কি চাই না তাঁর মৃত্যু যাতে স্বস্তির হয়? আমার সাহায্য না পেলেও তিনি আত্মহত্যা করবেন এবং মৃত্যুর সময় একটা ভয়ানক অশান্তি নিয়ে যেতে হবে।—খোকা, আমার অসহায় অবস্থার কথা মনে কর, এক্ষেত্রে তাঁর শেষ ইচ্ছে আমি কি করে অপূর্ণ রাখি?" সেই শুক্‌নো চামড়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির পঞ্চাশ বছরের পুরানো চোখে যে জলের ফোঁটাগুলো ফুলে উঠ্‌ল সে রকম বেদনার অশ্রু আর বুঝি তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যে আসেনি!

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার তিনি সুরু করলেন, "তোমার বাবা জান্‌তেন তাঁর স্ত্রীর হার্ট কি রকম দুর্ব্বল। সে কারণে, যাতে তিনি কোনো রকম আঘাত না পান তার জন্যে আমার কাছে কতগুলো চিঠি আগে থেকেই লিখে রেখে গেলেন। চিঠিতে যখন তিনি লিখ্‌লেন শীগ্‌গিরই দেখা হবার কথা, তখন তোমার মা'র মৃত্যুর কথা ভেবেই লিখেছিলেন। কারণ তিনি জান্‌তেন যে তোমার মা ও রকম দুর্ব্বল হার্ট' নিয়ে আর বেশী দিন বাঁচ্‌বেন না। তোমার মা'র মৃত্যুর পর তুমি যে চিঠিটা পাও সেটাও আমি নিজে পোষ্ট করেছি। তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিল তুমি যতদিন যথেষ্ট বড় না হও ততদিন তোমাকে যেন কিছু না জানান হয়। আজ তোমাকে তিনি নিজেই সব কথা জানালেন। তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে এই আঘাতের তীব্রতা যে কমে যাবে এ' কথা তিনি ভালো করেই জান্‌তেন।"

তারপর সেই চিঠিটা পড়া হল, যেটা লিখ্‌তে লিখ্‌তে তিনি মারা গিয়েছেন:

—এইমাত্র বিষটা খেয়েছি। তার ক্রিয়া শিরার ওপর আরম্ভ হয়েছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি, খুব কষ্টকর নয় কিন্তু! এ' চিঠিটা যখন পড়া হবে তার অনেক বছর আগেই আমি মরে গিয়েছি, যদি আমার শেষ ইচ্ছে ঠিকমত পালন করা হয়! খোকা, আমাদের এই পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো। কে জানে, আমার জন্যে যাঁদের লোক-সান দিতে হয়েছে এতোদিনে তাঁদের সেই অসন্তোষ কিছু কমেছে কিনা।

---

* একটি বিলিতি গল্প থেকে নেওয়া।

অবসর

কুমারী শিবানী সরকার

আজ এই সকালবেলা,
নীল আকাশের তলে তলে শাদা মেঘের খেলা,
কেন, লাগলো আমার ভালো ?
কেন অকারণ,
ইচ্ছা করে থাকতে চেয়ে কেবল সারাক্ষণ,
ওদের সাথে খেলা করে সকালবেলার আলো।

এদিক থেকে ওদিক কেবল নীল আকাশের তলে,
মেঘ ছুটে যায় দলে দলে।
দেয় না ওরা ধরা,
ওরা যেন মুক্তশিশু হাসিখেলায় ভরা,
সকালবেলার আলোর মাঝে রূপোর মত জ্বলে।

কোথায় সে কোন্ দূর,
কোথা হ'তে এল ওরা কোন্ সে রাজার পুর,
ছুটীর খবর নিয়ে হঠাৎ কখন এল ছুটে,
সকল বাঁধন টুটে,
বাক্য যেথায় স্তব্ধ শুধু সেথায় জাগায় সুর।

উদাস করে মন,
ওদের দেখে আকুল হ'ল কাশকুসুমের বন,
ওদের সুরে সুর মেশালো ভোরের শিউলীঝরা,
ওরা, মাতিয়ে তোলে ধরা।

আজ এই সকালবেলা,
দেখছি বসে নীল আকাশে শাদা মেঘের খেলা,
মুখের 'পরে পড়ছে এসে সকালবেলার আলো,
লাগছে আমার ভালো ॥

টি, বি সম্বন্ধে দু'একটী কথা

শ্রীসুজাতা রক্ষিত

যক্ষ্মা কেন হয়? এই কথার উত্তর দেওয়া শক্ত। তবে ডাক্তারেরা বলেন, শরীরে যদি জোর, পুষ্টি ও সহ করবার শক্তি বেশী থাকে তাহলে টি, বি বড় একটা হয় না। আবার দেখা যায় যে খুব ভাল স্বাস্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও এ অসুখ হয়। ইংরাজীতে একটী কথা আছে যে টি, বি কাহাকেও ছেড়ে কথা কয় না।

যক্ষ্মা বীজাণু হাওয়ার সঙ্গে, খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতির সঙ্গেই মিশে আছে অথচ তার মধ্যে থেকে আমাদের বাঁচতে হবে ও সকলকে বাঁচাতে হবে কিন্তু কি করে? সেটাই জানা উচিৎ।

অনেকেই হয়ত বলবেন্ ভাল জায়গায় বাস কর। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেদের যেরূপ অবস্থা তা'তে সবার পক্ষে ভাল জায়গায় বাস করা সুবিধা হ'য়ে ওঠে না। তবুও ওরই মধ্যে আমাদের বাস উপযোগী একটা বাড়ী দেখে নিতে হবে। প্রথমতঃ বাড়ীর দরজা, জানালা, আলো, বাতাস প্রভৃতি দেখে বাড়ী ব্যবস্থা করতে হবে কারণ এঁদো পল্লীতেই বেশীর ভাগ যক্ষ্মা হয়। তর্ক ওঠান যেতে পারে যে এঁদো পল্লীতেই বা কেন হবে আর ভাল হাওয়া বাতাস ও রোদযুক্ত স্থানেই বা কেন হবে না? আজকালকার দিনে সকলেই বোধহয় জান যে যক্ষ্মা বীজাণুর পক্ষে পাঁচ মিনিটকাল রৌদ্রই যথেষ্ট অর্থাৎ যক্ষ্মা বীজাণুর রৌদ্রই হচ্ছে একমাত্র শত্রু। ধর কোন গলি দিয়ে টি, বি রোগী যাচ্ছে ও কাসতে কাসতে সেইখানেই খানিকটা গয়ের ফেলে দিলে অথচ সেখানে রোদ কখনই আসে না—তার কিছুক্ষণ পরে কোন ছোট ছেলের বল খেলতে খেলতে রাস্তায় সেই জায়গায় গিয়ে পড়ল—ছেলেটী কিছুই জানেনা, সে বলটি তুলে নিয়ে এসে আবার খেলতে আরম্ভ করলো—কখনও মুখে, গায়ে দিচ্ছে আবার কখন বা সেটা খাবার জিনিসে গিয়ে পড়ছে। এই রকম করেই টি, বি বিস্তার লাভ করে।

বাড়ী ঠিক মত হ'ল ত এইবার খাদ্যের দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিৎ। টি, বি হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের শরীরে পুষ্টির অভাব। আমরা (বিশেষ বাঙ্গালীরা) যা খেয়ে জীবন ধারণ করি তার মধ্যে বিশেষ কোন পুষ্টিকর জিনিস থাকে না।

যেরকম পরিশ্রম করতে হবে সেই অনুপাতে ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন কিন্তু দুঃখের বিষয় যেটুকু দরকার আমরা তার সিকি ভাগও খাইনা। ছোট মেয়েরা সকাল নটার সময় কোনও রকমে খেয়ে স্কুলে যায় আর আসে সেই বেলা পাঁচটার সময়—এই এতটা সময় এরা কিছুই খায় না অথচ পরিশ্রম সমানই হয়, তারপর বাড়ীতে এসে সামান্য কিছু খেয়ে আবার যায় মাঠে খেলা করতে; খেলা অবশ্য খুব ভাল কিন্তু বেশ ভাল রকম পেটভরা থাকা চাই। যদি না খেয়ে ফের খেলা ধূলা করা যায় তাহলে ফল হয় উল্টা—শরীরের ক্ষয় হয় বেশী ও ফলে চেহারা হয় ফ্যাকাশে ও রোগা!

আমাদের দেশে টি, বি বেশীর ভাগ পেটে ও বুকেই হয়; ম্যাও ও হাড়ে ছোট ছেলেদেরই হয়—অনেক রোগ আছে যে বড়দের হয় যেমন—ক্যান্সার ব্লাডপ্রেসার প্রভৃতি সেইরকম ম্যাওও হাড়ে ছোটদেরই হয়।

হাড়ে হয় বটে তবে যেখানে সেখানে হয় না। শিরদাঁড়া হাড় বা প্লেন হাড় সেখানে একেবারেই হয় না। হাড়ের জোড়ে জোড়ে হয় যেমন হাঁটুতে, পায়ের গাঁটে, হাতের ওপর দিকের জোড়ে, শিরদাঁড়া প্রভৃতি, এইরকম জায়গায় হয়।

আমরা সাধারণতঃ টি, বি রোগী নামেই ভয়ে আঁতকে উঠি কিন্তু ভয় পাওয়াটা একেবারে অমূলক, ভয় পাবার কোন মানে হয় না। প্রথমেই বলেছি আকাশে, বাতাসে, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সব জায়গায় টি, বি সব বীজাণু মিশে রয়েছে ও সময়ে খাদ্যে ও নিশ্বাসে শরীরের মধ্যে আমরা নিচ্ছি। তোমরা মনে মনে বিবেচনা করে দেখ যে যক্ষ্মা রোগীর দেহ থেকে যে ব্যারাম নেবার ভয় (ইনফেকসন্) থাকে যার জন্য আমরা ভয় করি সেত চব্বিশ ঘণ্টাই নিশ্বাসের সঙ্গে নিচ্ছি তবে আর তাকে ভয় কিসের? ভয় যদি করতে হয় তাহলে আমাদের নিশ্বাস নেওয়াও বন্ধ করতে হয়।

এমন বহুরোগীর সঙ্গে আমরা অজ্ঞানাতে মিশছি, খাচ্ছি বেড়াচ্ছি তাঁতে ত কই আমাদের ভর করে না। কিন্তু মজা যে যাঁহাতক জানলাম যে সে রোগী তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গ ত্যাগ করলাম। একটা জানা রোগীর সঙ্গে মেশার থেকে ঢের বেশী ভয়ের কারণ ট্রেনে জাহাজে, ট্রামে বাসে ও হোটেলে। এর কারণ সহজেই অনুমেয়—জানা রোগীর সঙ্গে যতটা সাবধান হ'য়ে মেশা যায় ততটা অজ্ঞানাতে হয় না। আমি এমন বহু রোগী দেখেছি যে তাদের চেহারা দেখলে কার সাধ্য বলে যে তাদের টি, বি হ'য়েছে এমন সুন্দর চেহারা অথচ তাদের স্পিউটাম পজিটিব অর্থাৎ কি না গয়েরে বীজাণু মজুত রয়েছে!

টি, বি আবার দুরকম হয়—একরকমকে বলে Open case আর একরকমকে বলে closed case. যে সমস্ত রোগীর গয়ারে টি, বি বীজাণু পাওয়া যায় তাদের বলে Open case ও যাদের পাওয়া যায় না তাদের বলে closed case. T. B. জীবাণুযুক্ত গয়ারকে স্পিউটামপজিটি ও যে গুলিতে পাওয়া তাকে বলে নেগেটিব।

যাক যা বলছিলাম—এই সমস্ত অজানা রোগীরাই আমাদের পক্ষে বিপদ্দজনক। তার কারণ আগেই বলেছি যে অজানাতে লোকে সাবধান হতে পারে না। জানতে হোক অজানাতে হোক close caseকে ভয় করবার কিছুই নেই! কারণ এদের গয়ার ওঠেনা ও এখানে সেখানে অজ্ঞাত ভাবে থুথু ফেললেও তাতে T. B. বীজাণু না থাকার জন্য অসুখ ছাড়তে পারেনা কিন্তু ভয়ের কিছুই নেই বলে এঁটো খাওয়া, একসঙ্গে শোওয়া রোগীর জিনিসপত্র ব্যবহার করা চলবে তা মোটেই নয়। টিবির লক্ষণ—

অসুখ হবার আগে অথবা হ'লে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঘুসঘুসে জর, কাসি, গয়ের, রাত্রির ঘাম, বিকেল দিকে সামান্য জর বা জর ভাব, মাথা ধরা ও সর্ব্বদাই অবসন্ন ভাব, ক্ষিদে কমে যাওয়া, হজম না হওয়া অনিদ্রা প্রভৃতি যত রকম খারাপ হ'তে হয় সব রকম হয়। কারও বা স্পিউটামের সঙ্গে রক্তের ছিট দেখা যায় বা কাসতে কাসতে রক্ত বমি হয়।

টি, বি হ'লে কিছুতেই ভাল লাগে না মনে হয় কেবলই শুয়ে পড়ি। সামান্য জর অথবা বিকালের দিকে শরীর খারাপ হ'লে বড় একটা কেউই যত্ন নেয় না—মনে করে ও কিছু নয় দুদিন পরে সেরে যাবে কিন্তু তা যায় না। হয়ত কারও থুথুর সঙ্গে সামান্য একটু রক্ত বেরুল—কিন্তু মোটেই গ্রাহ্য করলে না।

বাড়ীর লোকে অথবা সে নিজে মনে করে ও দাঁতের রক্ত অথবা গলার রক্ত পরে শেষে অগ্রাহ্যের ফলে একেবারে শরীর শেষ সীমায় পৌছায়। এই কটী লক্ষণ প্রকাশ পেলেই বাজে চিকিৎসা না করিয়ে প্রথমে ray করান দরকার ray করাইলেই একেবারে সমস্ত ধরা পড়ে। এবারে চিকিৎসা সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলি কেমন? টিবির চিকিৎসা হচ্ছে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য, বিশুদ্ধ বায়ু, অস্ত্র চিকিৎসা।

সম্পূর্ণ বিশ্রাম কাকে বলে? সম্পূর্ণ বিশ্রাম মানে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম শরীর মনকে বিশ্রাম না দিয়ে যত যাই চিকিৎসা করা হোক না কেন কিছুতেই কোন ফল পাওয়া যাবে না বরং মৃত্যুর পথে রোগী এগিয়ে চলবে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম করতে হ'লে নড়াচড়া যত কম হয় ততই ভাল এমন কি বিছানায় মল মূত্র ত্যাগ ও শুয়ে শুয়ে খাওয়া নিয়ম। একজন জার্ম্মাণ ডাক্তার তাঁর চিরজীবনের সাধনার ফলে বের করেছিলেন যে টি, বির পূর্ণ বিশ্রামই একমাত্র চিকিৎসা। ফুসফুসে টি, বি হ'লে যতরকম চিকিৎসা করা হয় তাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য যাতে ফুসফুস সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায়।

পুষ্টিকর খাদ্য বলতে (অবশ্য যক্ষ্মা রোগীর উপযোগী) মাংস, ডিম, মাখন, ঘি, দুধ, টাকা শাক স্জী প্রভৃতি বোঝায়। মাংস আধ পোয়া, ডিম দুটো, মাখন আধপোয়া, দুধ একসের থেকে পোয়া পর্য্যন্ত খেলে তবে যদি রোগীর ওজন বাড়ে—যারা মাংস বা ডিম খায় না তাদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে মাছ মাখন, ক্রীম প্রভৃতি খাওয়া উচিত। তোমরা হয়ত বলবে যে এত সব খেতে হ'লে পয়সার দরকার গরীবরা কি করে খাবে? কিন্তু এ রোগটাই যে রাজা রোগ,—টাকার ঘণ্ট না করতে পারলে এ রোগ থেকে সারা বড় মুস্কিল। এই দেখা না সব থেকে কম ভাড়ায় যাঁরা থাকেন তাঁদেরও মাস গেলে ১০০৲ টাকা খরচ করতে হয়। অনেক লোককেই দেখলাম যে তাঁরা বেশ সারতে আরম্ভ করেছেন কিন্তু শেষে তাঁরা এখানে থাকতে পারেন না, টাকার অভাবে চলে যান এবং পরে আবার রোগ বেড়ে যায়।

যেখানে ধোঁয়া, ধূলা, নোংরা প্রভৃতি নেই সেখানের বাতাসকেই বিশুদ্ধ বায়ু বলে অর্থাৎ উত্তম আবহাওয়া। সাঁওতাল পরগণা, পাহাড় বা সহর ছাড়িয়ে গ্রামের আবহাওয়া খুব ভাল। এ রোগের পক্ষে পাহাড়ে থাকাই প্রশস্ত। কারণ গরমে এ রোগ বাড়ে, পাহাড়ে থাকলে ক্ষিদে বাড়ে, হজম হয় ও মশা মাছি বিরক্ত করতে পারে না. রাত্রিতে ঠাণ্ডার দরুণ খুব ভাল ঘুম হয়। রোগীকে যত রকম শান্তিতে রাখাযায় ততই ভাল।

টি, বি রোগীর পক্ষে স্যানাটোরিয়ম চিকিৎসাই সব চেয়ে ভাল। বাড়ীতেও চিকিৎসা হয় বটে তবে সকলের পক্ষে বাড়ীতে থেকে সমস্ত নিয়ম পালন করা সম্ভবপর হয় না টি, বি র পক্ষে ঠাণ্ডা দেশই উপযোগী ঠাণ্ডা দেশে থাকলে—হজমের তত গোলমাল হয় না।

এমন ঢের দেখা যায় যে অনেকে স্যানাটোরিয়মে থেকে ভাল হ'য়ে চলে যায় কিন্তু আবার কিছুদিন পরে তাদের অসুখ ফের হয়। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। রোগীরা যখন স্যান্যাটোরিয়মে থাকে তখন তাদের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সমস্ত নিয়ম পালন করতে হয়। বাড়ীতে এলে তাদের সুবিধাই হয় নিয়ম পালন মোটেই করতে হয় না। কাজেই আবার অসুখে বাড়ে। খালি রোগীদের দোষ দিলেই হয় না—বাড়ীর অভিভাবকদেরও অল্প বিস্তর দোষ থাকে। সাধারণতঃ রোগীরা যখন স্যানাটোরিয়ম থেকে ফিরে

আসে তখন দেখতে বেশ মোটা হ'লেও শরীর সম্পূর্ণ ভাবে সারতে আরও কিছুদিন লাগে। সেখানকার আবহাওয়ায় থেকে রোগীরা শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখে কিন্তু যখন অভিভাবকেরা দেখেন, যে চেহারা বেশ ভাল হয়েছে, জ্বর হয় না, বা কোন উপসর্গ নেই, তখন তাঁরা চান যে তাঁদেরই মতন রোগীও কাজ কর্ম্ম করুক—নিয়ম পালন করা তাঁরা বিষ দৃষ্টিতে দেখেন। রোগীরা আপত্তি করলে শোনেন না। মনে করেন শরীর যখন সেরে গেছে তখন বসে বসে বাবুগিরির কোনও দরকার নেই। রোগীরা তখন মরিয়া হয়ে মনে করেন যে যা হয় হোক (এটা মেয়েদের পক্ষেই বেশী করে খাটে)। তারপর আর কি, কিছুদিন পরে যে—কে সেই !

এত বড় ভারতবর্ষের মধ্যে মাত্র ১২।১৩ টি স্যানাটোরিয়ম আছে। এটা বড়ই দুঃখের কথা যে রোগীর তুলনায় জায়গা মোটেই নেই।

বাউল

প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস

তুই চল্‌বি যদি চল রে ছুটে
জলের মতোই চল,
সময় যে তোর যায় রে ব'য়ে
যেমন নদীর জল !
লোকে কি বল্‌বে না-বল্‌বে
এখন ভাবলে কি চল্‌বে
আর পথের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকার
সময় কোথায় বল ?

হয় তো পথে চলতে কত
কাঁদবি পাষান মূলে,
আছাড় খেয়ে পড়বি কেবল
উপল উপকূলে।
তবুও তোকে চল্‌তে হবে
সকল বাধা দল্‌তে হবে
এই চলার পথেই রয়েছে তোর
সব সাধনার ফল ॥

বুদ্ধির অঙ্ক

শ্রীধর

তা বেশ রাত। অঙ্কের খাতা নিয়ে বসে আছি, শক্ত একটা বুদ্ধির অঙ্ক কিছুতে মিলছে না! কেমন করে মিলবে? ও-বাড়ীর দেয়ালের ঐ অদ্ভুত ভুতুড়ে তিনটে ছায়ার দিকে যে আমার চোখ পড়ে আছে!

দেয়ালে তিনটে ছায়া। তাদের মধ্যে একজন খুব ছোট্ট নাদুস নুদুস আর গোলগাল, আর একজনও তাই, তবে তার মাথাটা যা একটু হেঁড়ে। বাকি তিন নম্বর ছায়া, লম্বা দাড়িওলা সে, বেশ বুড়ো গোছের। ঘন ঘন তার মাথা দুলছে, ঘন ঘন তার ঝুলো ঠোঁট নড়ছে। মাঝে মাঝে তার সরু সরু হাতদুটো কড়িকাঠে উঠছে, কখনও মেঝেতে ঠেকছে। এক একবার সে ভারী চুপ হয়ে যাচ্চে, লম্বা হাতদুটো তার গুটিয়ে নিচ্চে। নাদুসনুদুস ছায়াদুটো বসে বসে দুলছে কি ঢুলছে! রকম দেখলে ভয়ের চেয়ে হাসি পায়।

হঠাৎ সব চুপচাপ, কেউ নড়েও না চড়েও না। কি যেন একটা ঘটবে!

যা ভেবেছিলাম। ঘটোৎকচের মত প্রকাণ্ড এক বিটকেল ছায়া কড়িকাঠ থেকে নেমে নিরীহ ছায়া তিনটের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল! তার ভীষণ চাপে তালগোল পাকিয়ে তিন তিনটে ছায়াই ম্যাজিকের মত দেয়ালের নীচের দিকে ধ্বসে গেল। ছোট্ট একটি মেয়ে ডুকরে কোথায় কেঁদে উঠল। বাস্, তারপর চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার।

গালে হাত দিয়ে ভাবছি উঠব কি থাকব। এমন সময়, ওরে বাবা! আর একটা কিম্ভুতকিমাকার ছায়া নিঃশব্দে দেয়ালের নীচে থেকে ওপরে উঠল। তার মাথামুণ্ড হাত পা কি যে কোথায় বোঝা যায় না। অন্ধকারে স্কন্ধকাটা কিম্ভুত ছায়াটা হিমসিম খেয়ে চামচিকের মত দেয়ালে নেপটে গেল। তারপরই সেটা মাঝখান দিয়ে দুভাগ হয়ে কেটে, দেয়াল ঘেঁষে দুদিকে দুটো বিটকেল মূর্ত্তি ধরে ছটকে বেরিয়ে গেল। কি কাণ্ড!

তারপর একি! দেয়ালে আবার যেসে নিরীহ তিনটে ছায়া! তেমনি বসে আছে সব, যেন কিছুই তাদের হয়নি। বুড়ো ছায়াটার ঝুলো ঠোঁট আবার নড়ছে, সরু সরু হাতদুটো তার উঁচুতে চড়ছে-আর নীচে নামছে। নাদুসনুদুস ছায়াদুটো সঙ্গে সঙ্গে তেমনি দুলছে কি ঢুলছে।

সকাল হয়েছে। ও-বাড়ীর ঘরে দাড়ীওলা থুড়থুড়ে ওদের বুড়োদাদুর কাছে বসে দুই নাদুসনুদুস নাতিনাতনি বাটি বাটি দুধ আর গাদা গাদা খাবার খাচ্চে। অঙ্কের খাতা নিয়ে বসে আছি—কালকের সে বুদ্ধির অঙ্কটা আজও মিলছে না। এমন সময় জানো-দিদি ঘরে এসে বললেন,—জানো বাবুদাদা, কাল রাতে ও-বাড়ীর রুণুর দাদু রুণুকে আর খোকাকে ভুতের গল্প বলছিলেন। হঠাৎ ওদের পিসিমা না জানো, কি দরকারে, একবার ঘর থেকে ওদের হারিকেন আলোটা নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন জানো, রুণু ভয়ে কি রকম কেঁদে উঠেছিল—তুমি শুনেছিলে বাবুদাদা?

এমা কি বোকা! বুদ্ধির অঙ্কটা তো সোজাই—এই ত মিলে গেল!

ঠায় বসে ৬২টি হাসের ডিম ভক্ষণ ও তারপর ছুজায়গায় নিমন্ত্রণ ভোজ রক্ষা করা কোন মানুষের মানুষ পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু একটি বাঙ্গালী মানুষ শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এই কীর্ত্তি অনুষ্ঠিত করেছেন। শৈলেন্দ্রনাথ আরো ২০টি ডিম উদরস্থ করতে পারেন বলেন কিন্তু তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নিরস্ত করেন। ডিম ভক্ষণে পৃথিবীর রেকর্ড হচ্চে—একজন আমেরিকানের। উক্ত আমেরিকানটি ঠায় বসে ৭২টি ডিম ভক্ষণ করে পৃথিবীর রেকর্ড করেছেন। বাঙ্গালী যুবকটি বোধ হয় আরো ১০টি ডিম অনায়াসে খেতে পারতেন।

জার্ম্মণীতে Brocken নামে একটি উঁচু পাহাড় আছে। সূর্য্যাস্তের সময় তার ওপরে দাঁড়ালে আকাশে রাক্ষসের মত কিম্ভুতকিমাকার ছায়া দেখা যায়। এই ভুতুড়ে ছায়াগুলি দেখে তো স্থানীয় লোকদের চক্ষু চড়কগাছ। এই অদ্ভুত ছায়াগুলি আবার নড়ে—ঠিক যেন যারা তাদের পাহাড়ের ওপর থেকে দেখছে তাদের ভ্যাঙচাচ্ছে। ক্রমশঃ আসল ব্যাপারটা প্রকাশ

হয়ে পড়ল। এক বৈজ্ঞানিক এসে বললেন-তোমরা যারা পাহাড়ের ওপর দাড়িয়ে ঐ ছায়াগুলো দেখছ ওগুলো তোমাদেরই ছায়া। তোমাদের সামনে শূন্যে রয়েছে মেঘ আর তোমাদের পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছেন। তোমাদের ছায়া বড় হয়ে ঐ মেঘের পর্দ্দায় গিয়ে পড়েছে। কিন্তু নিরীহ স্থানীয় লোকেরা এ কথা বিশ্বাস করে না।

জার্ম্মাণীতে যুদ্ধের সময় একটি কাণ্ড হয়। জার্ম্মাণীরা তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জেপলীন বা উড়োজাহাজ তৈরী করে আকাশে চালাচ্ছে আর শত্রুদের ওপর নিঃশব্দে অতর্কিত বোমা ফেলছে। একদিন হঠাৎ একটি জেপলীন চালাতে চালাতে তার জার্ম্মান চালক ও আরোহী দেখতে পেলে কিছুদূরে পাশাপাশি তাদেরই অনুরূপ আর একটি জেপলীন নিঃশব্দে চলেছে। কাদের এ জেপলীন? তার চেহারাটাও খুব পরিষ্কার দেখা যায় না—ছায়া ছায়া মত কেমন যেন ভুতুড়ে ভাব! চালক ঐ নিঃশব্দচারী ভুতুড়ে জেপলীন দেখে রীতিমত ভয়ে পেয়ে গেল। এখন যে আরোহীটি ছিলেন তিনি এক বৈজ্ঞানিক, চট করে সমস্ত রহস্য তাঁর কাছে পরিস্কার হয়ে গেল। তিনি দেখলেন তাঁদের পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, তাঁদের সামনে মলিন মেঘপুঞ্জ। এযে ওঁদের জেপলীনেরই ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়। চালকটি তবু কিন্তু ভয়ে ভয়ে চালাতে লাগল। কে জানে যদি ঐ ছায়ার সুযোগ নিয়ে কোন শত্রুপক্ষ তার জেপলীন চালিয়ে থাকে বা কোন সত্যিকারের ভৌতিক—!

প্রাগ ঐতিহাসিক যুগের ছেলেমেয়েরা আজকালকার মত এত সুন্দর সুন্দর কাগজে ছাপা বই পড়তে পেত না। তাদের নাকি বই ছিল কাঠের, পাথরের বা সিঙের বা তামার তৈরী। কাঠের বা পাথরের ফলকে নানারকম ছবি আঁকা থাকত—এই রকম কাঠের বা পাথরের ফলক ছিল তাদের পড়বার বই। পরে তামার ওপর লেখা ও ছবি আঁকা সুরু হল। ভারতবর্ষে এই রকম অনেক পাথরে ও তামার ওপর লেখা পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগেও নাকি কাঠের বই দেখতে পাওয়া যেতো—ক্রিকেট ব্যাটের মত দেখতে, তবে একটু চওড়া ও ছোট হ্যাণ্ডেল দেওয়া, তার ওপর রোমান হরফের লেখা পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যাট বইর ওপরে পাতলা শিঙের একটা স্বচ্ছ আবরণ দেয়া থাকত—তার মধ্যে দিয়েই লেখাগুলি বেশ পড়া যেতো। এই ধরণের অভিনব বই ছেলেমেয়েদের খুব প্রিয় ছিল। এর নাম দেওয়া হয়েছে Horn-book! নানা আকারের ছোট বড় এই horn book নাকি পাওয়া গিয়েছে।

নতুন রামায়ণ

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

ছিল তারা দুই ভাই রাম ও লক্ষণ ;
ছোটবেলা থেকে দেখে ভাব ও লক্ষণ—
বলেছিল গণকেতে "হবে এরা দারোগা,
হবে এরা মাথামোটা, কিম্বা কি পা-রোগা।"
বড় হয়ে ভুলবে কি গণকের বুলি সে !
দুই ভাই কাজ নিল শেষটায় পুলিশে।
পুলিশের কাযেতেই ভাই তারা দুইজন
কিছুদিন না যেতেই ইস্তফা দিতে মন !
দারোগা বলেন, "আহা, কেন যাবে চলে হে
কেন যাবে চলে সেটা যাবে নাকি বলে হে ?"
দারোগার প্রশ্নেতে বলে তারা দু'ভায়ে,—
"পোষায় না আমাদের সামান্য এ আয়ে,
যত আসামীকে মোরা ধরে আনি গুঁতায়ে,
জরিমানা করে তুমি নাও সব হাতায়ে !
করে দাও নিস্ব-ই, তাও যদি না জোটে
যার নেই কিছু-ই তাকে জোতো হাজতে !
কাজ দিনু ছেড়ে মোরা ওই এক কারণেই
আয় বাড়াবার হায়, বুদ্ধি কি কারো নেই !
"প্ল্যান, সব ঠিক আছে,"—ফের তারা বল্‌ল,
"কাজ সব সুরু হবে আজ বাদ কল্য !
নিজেরাই দু'ভায়ে ব্যবসা-এ ধরবো—
লালরঙওলা বাড়ী কাল ভাড়া কর্‌বো।

তার মাঝে বসাব-ই আন্‌কোরা থানা যে
শুনব না তোমাদের কোন কিছু মানা হে !
নতুন সে থানাটার দারোগা-ই এ আমি !
লক্ষ্মণ জমাদার—জমা দেবে আসামী !
দাব্‌ড়িতে ঘাব্‌ড়িয়ে বলব-এ সোজা বাৎ—
'ঘুসি খেয়ে ঘুস্ দিয়ে চলে যাও নির্ঘাৎ !'
সব কথা আমাদের শুনলে তো মন দিয়ে—
এখন বলত বাপু মন্দ কি ফন্দি-এ ?"

কল্কের ধোঁয়া
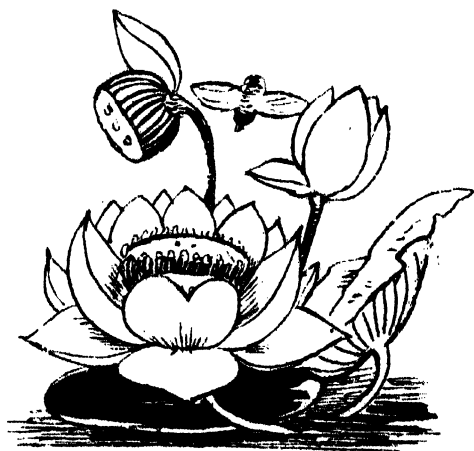
পৃষ্ঠা ২৮১

কল্কের ধোঁয়া

শ্রীনিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য

পাকা বাদামী রঙের লম্বা দাড়ী বা'র ক'রে বুড়ো দোকানদার বললে,—"আরে কাহে চাহেন মশয়, এই তো মিয়াচিনির তামুকের দোকান।"

মামার বাড়ীতে এসেছিলাম। ফেরবার সময় দাদামশাই সেদিন পাকড়াও করলেন, "যাচ্ছিস যখন চীনেবাজার, মিয়াচিনির দোকান থেকে পাঁচপো তামাকও নিয়ে আসিস্।" প্রায় আধঘণ্টা চীনেবাজার ঘুরে দোকানটী পেয়ে খুসী হ'লাম, বললাম, "কলুটোলার শ্যামরতন বাড়ুয্যে আমার দাদামশায়—তিনিই পাঠিয়েছেন।" দাদামশায়ের নাম শুনে' বুড়ো চৌকী ছেড়ে লাফিয়ে উঠিল, "আরে, আহ আহ তা দাড়াইয়া ক্যান্"—ব'লে পাশের দরজা দেখিয়ে আমাকে ভেতরে এনে, একদম তার আসনের কাছে একটা টুলে বসালে। তার মুখের কাছেই এক প্রকাণ্ড হুঁকোয় বালাখানার তামাক পুড়ছে। নলে একবার মুখ লাগিয়ে সে বলল, "তারপর, তোমার দাদামশায় আছেন ক্যামন্?" "ভালই"—আমি বললাম, "এখন যদি পাঁচপো তামাক দেন।"

"আঃ, তা ব্যস্ত হও ক্যান্। বসো, তামুক খাও,—বলি দাদামশায়ের মত রসিক আছ তো?"

আমাকে নিরুত্তর দেখে বুড়ো ত' হো হো ক'রে হেসে উঠল। হাসি কমলে বুড়ো বললে, "আর ও তো তোমার দাদামশাই ও ব'লে আমার দোকানে ঢুকেছিল, কিন্তু আজ তিরিশ বছর গত' আমার দোকানেরই খদ্দের!" আমি আশ্চর্য্য হলাম, বললাম,—"তবে কি দাদামশাই তিরিশ বছর আগে তাঁর দাদামশাইয়ের জন্য তামাক কিনতে—"

"না হে না ছোকরা, তবে শোন"—গড়গড়ায় প্রকাণ্ড একটান দিয়ে সে বললে, "তিরিশ বছর আগে আমি সামনের গলির মধ্যে তখন তামুকের দোকান খুলি, খবর পেয়ে এক পাঠশালায় পড়া দোস্ত শ্যামু তো এসে হাজির। কত হোল গল্প, শেষে শ্যামু বললে, 'যাক্, ভালই ত করলে ভায়া কিন্তু এমন মালের দোকান দিলে, আমাদের আর কি[illegible] কেনা হবে না'—আমি তখন এমনি ধারাই তামুক খাচ্ছিলাম"—ব'লে বুড়ো আরও [illegible]গা'দুয়েক টান মেরে বললে, "নলটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বল্লাম, একবার খেলে কিন্তু [illegible]বে। তারপর থেকেই তো'—" বুড়ো আরামে চোখ বুঁজে গড়গড়ায় অনবরত টান দিতে [illegible]ল। ধোঁয়ায় ঘর উঠল ভরে। কেমন যেন ভাল লাগছিল গন্ধটা। বললাম,—'আচ্ছা, [illegible]তো একটু—"

বেল ফুল

শ্রীরথীন্দ্রনাথ মল্লিক

বল্‌ত মা, ওই যে মেঘের ফাঁকে
সন্ধে হ'লে আমায় যারা ডাকে—
ওরা ফুল বুঝি মা? ফুটলো তারা হয়ে?
আর সকাল হ'লে পথের ধারে ধারে
আমায় যারা ডাকে বারে বারে
তখন, তারার আলো ফোটে কি ফুল হ'য়ে?

আমার সকল কথায় তুমি হাস
(যেন) যা বলি সব ভুল
বেশ! তোমার বুকে হাস্‌লে আমি
ফুটবে নাকো ফুল?
দেখত মা পথের ধারে হিমের হাওয়া লেগে,
বেলি ফুলের আঁখির তলে উঠেছে জল জেগে।

ওরা শীতের শিশির
পাতায় পাতায়?
নয়ক' চোখের জল?
ওদের হাসির তলে
ব্যথার মানিক
অশ্রু হাসির ছল?
তবে যখন, তোমার বুকে লুকিয়ে ছুটে আসি
চোখের জলে ভিজিয়ে তোল মিষ্টি মুখের হাসি।

কান্না হাসি, বুঝিনা মা,
একই বুঝি সব ?
হাসির গানের সুরে সুরে
অশ্রু তোলে রব ?
বলত মা ছোট্ট কলি
ফোটে কি সুন্দর
সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
সাজাল আদর।

ওদের, তুলোনা মা থাক্ না ফুটে
সবুজ আঁখির জল
মনের বনে ফুটেছে যে
ব্যথার শতদল।
একটু পরেই শেষ হবে তার
ফুল জীবনের খেলা,
রইবে নাক বুকের পরে
কালকে সকাল বেলা।
বলনা মা লক্ষ্মী তুমি
কান্না আমার আসে
কেমন করে রইবে না সে
প্রভাতে যে হাসে।

ব্যাঙের পাতা

ঘ্যাঙ ঘ্যাঙর্ ঘ্যাক্

হে পাঠকপাঠিকা তোমাদের ভাল হোক্।

আমার এই পাতাটা তোমরা যে এত সহজে মেনে নিয়েছ—তাতেতোমাদের ওপর না খুসী হয়ে পারছি না। যাগ্ ভবিষ্যতে হিংসে টিংসে আর করবে না আশা করি। তোমাদের তো যথেষ্ট পাতা রয়েছে—তাতে যত খুসী বকর বকর কর না কেন।

সম্পাদক হবার ঝক্কি বড় কম দেখছি না ; এর মধ্যেই আমার ঝুড়ি ভর্তি। গঙ্গাফড়িঙ তো তার আত্মজীবনীর প্রথম অধ্যায় পাঠিয়েছে—সেটা মন্দ নয়, তবে আমাকে দেখে শুনে না দিলে ও চলবে না। ঝিঁ ঝিঁ পোকার কবিতা তো এবারও ছাপা গেল না। সম্পাদকের বক্তব্যটাই যে এখনও শেষ হয়নি। ঝিঁ ঝিঁ কিন্তু রাগে গির্‌গির্ করে কাঁপছে। কাল সন্ধে পর্যন্ত সে জানত তার কবিতা এবার যাবে—তাই তার ছেলেপুলে নিয়ে সন্ধ্যের সময় দল বেঁধে কোরাসে কাজি নজরুলের গজল গান জুড়েছিল। বাপ্ সে কি গলা—কানে তালা ধরে আর কি! শেষেকালে আমি দু' একটা হাঁক ডাক ছাড়াতে বাছারা সব চুপ। ধমকে বলে দিলাম—এবারও তোমার ঐ কবিতার জায়গা নেই বাপু। পরে দেখা যাবে। এদিকে রাস্তায় দেখা হলেই লম্বা দেহ গঙ্গাফড়িং শুঁড় তুলে মস্ত সেলাম ঠোকে। বলে, সম্পাদকমশাই, আমার আত্মজীবনীটা একটু দেখে রাখবেন।
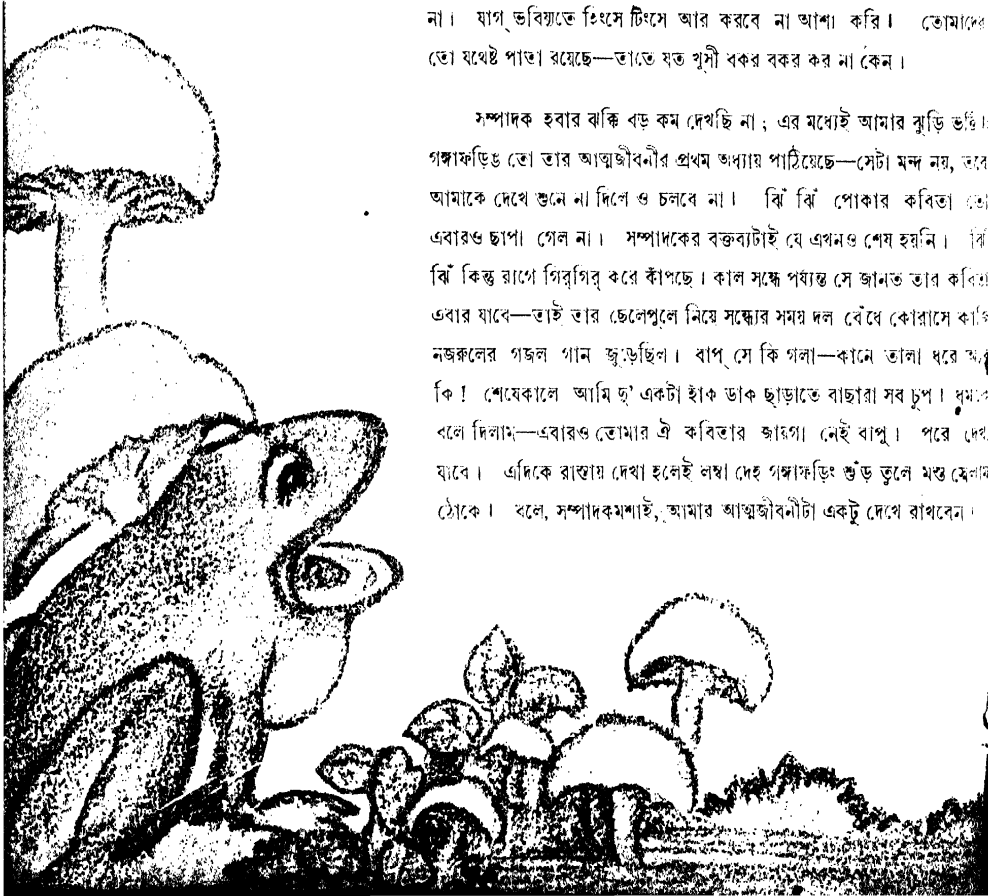
দেখছি সম্পাদকের কাজ সত্যি বড় ভারী। সকলকে আবার খুসী করাও চাই। কিন্তু তা আমি করি না, কারণ জানি সকলকে খুসী ক
াওয়া মানে কাউকেই খুসী না করা। কাল ঝিঁ ঝিঁ কে বকুনি দেবার আগে সোনা ব্যাঙকে সম্পাদকের দায়ীত্বের কথা বলছিলাম। সোনা ব
ড় আদুরে ও ছেলেমানুষ; তবে হাজার হোক ব্যাঙ তো, বুদ্ধি আছে। বোঝবার চেষ্টা করলে। ঝিঁ ঝিঁ কে কিন্তু ঐ রকম ভাবে ব
দানা চটে গেল। বললে, দাদা, সম্পাদকের মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হয়। সোনাটা বলে বেশ। তবে জানে না তো আজকালকার
াজারে কোন সম্পাদকের মাথা ঠাণ্ডা থাকে না।

ব্যাঙের যে ছাতা হয় না সেকথা তোমাদের বলছিলাম। ও ছাতার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ও ছাতা এক নীচু
ণ্ডিত জাতীয় পদার্থ। ওকে ছুঁয়ে ফেললে ব্যাঙদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। মুস্কিল হ আমরা যেখানে বাসা বাঁধি, তার কাছা
ছাতাগুলোও কোত্থেকে এসে জোটে। জোলো ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা ওদের পছন্দ। আমরাও অবশ্য জোলো জায়গায় থাকতে পছন্দ ক
ন্তু আমাদের আসল ঘর হচ্ছে জলের নীচে, যেখানে মানুষের পো গেলে দম আটকে যাবে। হি হি কিন্তু আমরা কেমন মজাসে থাকি

অবশ্য সবাই যে আমরা জলে থাকি তা ভেবে বোসো না। আমাদের কেউ কেউ জমীর ওপরও ঘর বাড়ী করে থাকেন। তোমরা
কেবারে কাৎ হবে আমাদের কোন কোন জ্ঞাত ভাইয়ের দল জলে বা ডেঙ্গায় তাঁদের ঘরদোর আর পছন্দ না হওয়াতে তাঁরা গাছের ওপর উ
চষ্টা দেখলেন। বহু বছর ধরে চেষ্টা চরিত্রি করে এক প্রতিভাশালী ব্যাঙ কল প্রদীপ গাছের ওপর উঠে বাসা বাঁধতে পেরেছিলেন। চেষ্টায় কি
হ! হাঁ, আর আমাদের চেষ্টায়! যাহোক্ তাঁদের পায়ের আঙুলে চাকতির মত চামড়ার
ক রকম তৈরী করে তার দ্বারা ক্রমশঃ তাঁরা গাছে গিয়ে উঠতে থাকেন। এঁরা আমাদেরই
াত ভাই—গেছো ব্যাঙ বলে জগতে পরিচিত।

আমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বংশ মর্য্যাদা রেখেছেন—কোলা ব্যাঙ পরিবার অর্থাৎ যে
উচ্চ বনেদী পরিবারে, হে পাঠক পাঠিকা, আমার জন্ম। লঙ্ জাম্পে আমাদের যুবকদের
েকর্ড সবচেয়ে বেশী আর এনাডউরেন্স বক্তৃতা ও কোরাস গানে তো কথাই নেই।

তারপর আমার এক খুড়তুত ভাই বহুকাল ধরে উত্তর আমেরিকাবাসী—তাঁরা ষণ্ড-
ব্যাঙ বলে সেখানে নাম করেছেন—তাঁদের সকলেই ভয় করে। সকলের কাছেই শুনতে
পাই তাঁদের প্রতিপত্তি সেখানে অনেক।

আরো কৃতিত্ব আছে এই প্রাচীন ব্যাঙ বংশে। আমরা কি আজকের! মানুষের পো
দের আসবার অনেক অনেক আগে থেকে এ পৃথিবীতে আমরা বাস করছি। মানুষের
পোকে তো আমরা জন্মাতে দেখলাম। তোমরা কিন্তু রাগ কোরো না, এ পাতাটা আমার।

ব্যাঙ পরিবারে আরো অনেক গুণকীর্ত্তি আছে কিন্তু আজ আর জায়গা নেই।

গত ২৫ শে ডিসেম্বর রবিবার ১০ নং ইন্দ্ররায় রোডে রংমশাল দলের আসর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেদিনকার অনুষ্ঠানে কোন আড়ম্বর ছিল না, জাঁকজমক ছিল না; মেলামেশা, সকলের সঙ্গে পরিচয় দেখাশুনাই ছিল সেদিনকার অনুষ্ঠানের আসল জিনিষ। অবশ্য প্রথম পরিচয়ে সকলের মধ্যেই একটা সলাজ ভাব ছিল। একটা বড় ঘরের একদিকে একটা পর্দ্দা টাঙিয়ে একটা ছোট ষ্টেজের মত করা হয়েছিল—অপর দিকে সতরঞ্চির ওপর সকলের বসবার জায়গা হয়েছিল। প্রথমে আমাদের একটি তরুণ ওস্তাদ গ্রাহক (তার বয়স ৭ এর বেশী নয়) শ্রীমান গোপাল দাস গুপ্ত—তিনি বাঙ্গলা ও হিন্দি গান করেন—তাঁর সঙ্গত করেন আর একটি ছোট ছেলে। এর পরে একটি মেয়ে গান করেন। তারপরে জনপ্রিয় ক্যারিকেচারিষ্ট শ্রীধীরেন্দ্র ঘোষ মহাশয় কয়েকটি কমিক করে সকলকে একচোট খুব হাসান। তারপর ছোট ছোট বাক্সবন্দী খাবার—দলের সকলের মধ্যে বিলি করা হয়। এরপর একজন চমৎকার সেতার বাজালেন। সেতারের পর এলেন ভারত বিখ্যাত যাদু সম্রাট পি, সি, সরকার—তিনি কয়েকটি সুন্দর সুন্দর ম্যাজিক দেখালেন। পরে রংমশাল দলের মধ্যে নানা খেলাধূলা সুরু হল। খেলাধুলার মধ্যে ছিল একটি memory test—একটি থালার ওপর ছোট ছোট কয়েকটি জিনিষ পত্র রেখে সেটি সকলকে দেখিয়ে বলা হল—দেড় মিনিট সময় যে যার সব দেখে নাও—পরে মনে করে কি কি থালায় আছে বলতে হবে। সবশুদ্ধ বুঝি ১২টা জিনিষ ছিল—১১টা পর্য্যন্ত একজন গ্রাহিকা বলেছিল। তারপরেব খেলায়, পর্দ্দার আড়ালে নানা রকম জিনিষের শব্দ করা হয়—ও জিগেস করা হয়—কিসের শব্দ? যেমন গেলাসে জল ঢালা শব্দ, কাঁচ ভাঙ্গা শব্দ, কাগজ ছেঁড়া শব্দ ইত্যাদি। এ তে খুব মজা হয়েছিল। এরপরও আরো কিছু খেলধুলো হয়—খেলাধুলা সাঙ্গ হলে সব প্রাইজ দেওয়া হয়। প্রায় আটটার কাছাকাছি আসর ভাঙ্গে।

তোমরা সকলেই স্পেনে ঘরোয়া যুদ্ধবিগ্রহের কথা শুনেচ। শুধু ঘরোয়া নয়, ইউরোপের অন্যান্য শক্তিশালী জাতিদেরও এতে স্বার্থ আছে। ইতালী স্পেনের এই অন্তর্বিদ্রোহের আগুণ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে স্পেনের লোকেদের আজ নির্যাতনের শেষ নেই, দেশে দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে। এমন কি খাবার পরবার জিনিষ নেই। স্পেনের চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের কাছে সাহায্য চেয়ে একটি আবেদন জানিয়েছে। মেয়েটির নাম মারগারিটা। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যুব-সঙ্ঘের সে সব চেয়ে ছোট্ট প্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, মারগারিটা স্পেনদেশীয় ছাত্রছাত্রী সঙ্ঘের সেক্রেটারী। এই টুকু মেয়ে নিজের দেশের কত বড় কাজ করছে ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। নীচে আমরা তার চিঠিটির মর্ম্মানুবাদ দিলাম ঃ

আমার প্রিয় ভারতীয় বোনেরা !

তারা বসুকে (একজন ভারতীয় মেয়ে প্রতিনিধি) দেখে আমার মনে হয়েছে তোমাদের সকলের বিশেষ ইচ্ছে স্পেনের লোকদের তোমরা সাহায্য কর—তাই সানন্দে আজ তোমাদের বলছি কেমন করে তোমরা এই সাহায্য দিতে পার।

সব চেয়ে ভাই আমাদের দরকার খাবার দাবার—অর্থাৎ চাল, মাখন, কফি জমা দুধ ইত্যাদি। আর একটা জিনিষ আমাদের খুব দরকার তা হচ্ছে তোমাদের মধ্যে যদি সেলাইর ক্লাব হয় তা হলে তোমরা এই শীতে ক্লিষ্ট সৈনিকদের জন্য গরম জামা, মোজা বুনে দিতে পার। আমাদের দেশে উল হয় না—তাই এটার প্রয়োজন এত বেশী। আরো দুটি জিনিষ আমাদের খুব দরকার—তুলো ও ব্যাণ্ডেজ। আর শিশুদের জন্য চটি ও জুতো।

একটি কথা বলে চিঠি শেষ করব। তোমরা আমাদের চিঠি দিয়ো। আজ স্পেনের যুব সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হচ্চে—সমস্ত পৃথিবীর ছেলেমেয়েকে পৃথিবীর শান্তির জন্য একত্রিত করা! আচ্ছা, আজ এই পর্য্যন্ত, ভাই বন্ধুগণ! সমস্ত স্পেন দেশের মেয়ের পক্ষ থেকে তোমাদের আমি অভিবাদন করছি।

বার্সেলোনা, মারগারিটা রোবল্‌স্‌
রোসেলন ২৭১, স্পেন

ই. আই. আর. ট্রেণ দুর্ঘটনা যেন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিটা দুর্ঘটনা ভুলতে না ভুলতে তার চেয়েও ভয়াবহ নিদারুণ এক রেল দুর্ঘটনায় আমরা স্তম্ভিত হয়েছি। এবারেও আশ্চর্য্য সেই বিহার প্রদেশই দুর্ঘটনার লীলাভুমি! গভীর রাতে হাজারিবাগ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যখন আপ্‌ দেরাদূণ এক্সপ্রেস ছুটে চলেছিল তখন এই করুণ মৃত্যুময় ঘটনা ঘটে। রেললাইনের প্লেট নাকি কে বদ্‌মায়েসী করে সরিয়ে ফেলেছিল। ফলে এঞ্জিন

ও পরের গাড়ীখানা সজোরে বেরিয়ে যাওয়ার দরুণ তাদের কিছু হয়নি কিন্তু অন্যান্য যাত্রীগাড়ী লাইন থেকে ছিটকে নীচে খাদের মধ্যে পড়ে। ফলে কয়েকটি যাত্রীদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে। আজ পর্য্যন্ত খবর পাওয়া গিয়েছে একুশজন যাত্রী নাকি মৃত। আহতের সংখ্যা অনেক। কয়েকজন যাত্রীর নাকি কোন হদিস পাওয়াই যাচ্ছে না। মৃত যাত্রীদের পরিবারবর্গ ও বন্ধুদের শোকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

* * * * *

ভারতবর্ষের পূর্ব্বদেশীয় রাজ্যসমূহে নানা অশান্তি দেখা দিয়েছে। সেখানকার প্রজারা আজ অত্যন্ত অসুখী, নানাভাবে তারা অত্যাচারিত। তাদের অভাব আবেদন শোনবার আজ কেউ নেই। ঢেনকানাল দেশীয় রাজ্যের অনেক প্রজারা সেখানকার অশান্তি থেকে পরিত্রাণ নিতে ঢেনকানাল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আর একটি পূর্ব্বদেশীয় রাজ্যে এক হত্যাকাণ্ড ঘটল। এই রাজ্যের নাম রণপুর। রণপুরের প্রজারা দলবেঁধে তাদের আবেদন জানাতে বোধহয় রাজপ্রাসাদের দিকে চলেছিল। সে দেশের রাজা তাদের ঐরূপ ভাবে আসতে দেখে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করে সেখানকার পোলিটিক্যাল এজেণ্ট এক সাহেব মিঃ বেজালগেটকে ডেকে পাঠান। খবরের কাগজের মারফতে শোনা যায়, এই সাহেবের সঙ্গে প্রজাদের কারুর কারুর বচসা বাঁধে। ব্যাপারটা তারপর আরো সঙ্গীণ হয়। শোনা যায় প্রজাদের মধ্যে কেউ নাকি লাঠি নিয়ে সাহেবকে ভয় দেখায়। প্রজাদের মধ্যে আগে কেউ সাহেবকে মেরেছিল কি না আমরা জানি না, তবে সাহেব বোধহয় আত্মরক্ষায় গুলি চালান। কিন্তু সেই গুলিতে প্রজাদের মধ্যে একজন না দুজন হত হয়। তারপরই প্রজার দলের কেউ কেউ নাকি ক্ষেপে যায়। ফলে সাহেব আহত হন—পরে তাঁর মৃত্যু হয়। এই মারামারি হত্যাকাণ্ডে আমরা আন্তরিক দুঃখিত। কেন এমন অশান্তি হল, কেন এই লাঠি গোলাগুলি চলল—এর সমস্ত ব্যাপার রণপুরের রাজার উচিৎ জনসাধারণকে ও সরকারকে জানান। কোথায় আসল অশান্তি সেটা না জানলে এই হত্যাকাণ্ড, ইংরেজ ও ভারতীয়দের এই করুণ মৃত্যু ভারতবর্ষে কলঙ্কিত হয়ে থাকবে। এই দুঃসাহসী ইংরেজটি ও দুজন অসুখী প্রজা তাদের যে জীবন দান করে গেল, তার কারণ যেন ব্যর্থ না হয়।

* * * * *

ইংলণ্ডের হাইস্কুলের একদল ছেলেরা নাকি ভারতবর্ষে বেড়াতে আসছে। অষ্ট্রেলিয়ারও এক দল স্কুলের ছাত্র ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছে। ইউরোপীয় ছাত্রদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তারা দেশভ্রমণ করছে। দেশভ্রমণ একটা বড় শিক্ষা—স্কুলের বইপড়ার চেয়েও অনেক বড় শিক্ষা। আমাদের দেশের স্কুল কলেজের ছেলেদের উচিৎ দেশভ্রমণে সদলবলে

বেরিয়ে যাওয়া। স্কুল ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের উচিৎ অল্প খরচে যাতে তাঁদের ছাত্রেরা দেশভ্রমণের সুযোগ পায় তার সুবিধে করে দেওয়া। ভারতবর্ষে কয়েকটি স্কুল কলেজে দেশভ্রমণের বা হাইকিংএর বন্দোবস্ত হয়েছে। কিন্তু তা অত্যন্ত কম। কলিকাতার বড় বড় হাই স্কুল ও কলেজে এই দেশভ্রমণের সুযোগ সুবিধা করা উচিৎ। আশা করি অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের এই তরুণ ছাত্রদলের সঙ্গে তোমাদের নিবিড় পরিচয় ঘটবে। তাদের দেশের স্কুলের শিক্ষাদীক্ষার কথা তাদের নিজেদের মুখে তোমরা শুনতে পাবে।

* * * * *

এবারে জানুয়ারী মাসে লাহোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনায় ব্রতী বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক ও ছাত্র সকলে একত্র হন ও নানা বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। আজ ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক ও ছাত্র বর্ত্তমান বিজ্ঞানের নতুন গবেষণায় মন দিয়ে নতুন তথ্য আবিষ্কারে ও পর্য্যবেক্ষণে সমস্ত পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলকে আকর্ষণ করেছেন। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ; পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলের সঙ্গে পা ফেলে ও মাথা মিলিয়ে আজ ভারতবর্ষ তার নিজের দানে পৃথিবীর মধ্যে তার বিশেষ স্থান বেচে নিতে চলেছে। এবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন লাহোরে হল বলে, সেখানে একটি বই ছাপা হয়—অতীত ও বর্ত্তমানে পাঞ্জাব। পাঞ্জাবে এক সময় এক বিরাট প্রস্তর যুগ ছিল। পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র ছিল তখনকার লোকেদের উপজীবিকার জিনিষ। পাঞ্জাবে রাওয়ালপিণ্ডির কাছে এই প্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। আর একটি ভারতের প্রাচীন প্রাগ ঐতিহাসিক লীলাভূমি ছিল হারাপ্পাতে—সেখানেও বিরাট এক সভ্যতা—ঘরবাড়ী প্রভৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সভ্যতা নাকি প্রায় তিন চার হাজার বছর আগেকার। তারপরের পাঞ্জাবের ইতিহাসের কথা তোমরা অল্পবিস্তর সকলেই জান।

মৃত্যুমুখী সূর্য্য

স্যর জেমস্ জীন্স্

(অনুবাদ)

আকাশে কয়েকটি "তারা" আছে আমাদের পৃথিবীর চেয়ে হয়ত সামান্য বড়; কিন্তু বেশীর ভাগ তারাগুলি এতই প্রকাণ্ড যে সহস্র-হাজার পৃথিবী তাদের একটির মধ্যেই অনায়াসে জায়গা পেতে পারে। আবার এক একটি তারা আছে পৃথিবীর কোটি কোটি গুণ বড়। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রতীরের বালুকণা যদি গোণা যায় বোধহয় ততগুলি তারাও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে।

ভেবে দেখো তাহলে সমস্ত বিশ্বমণ্ডলে আমাদের জায়গা কতটুকু, কত নগণ্য !

শূন্যপথে এই সমস্ত তারা ক্রমাগত চলাফেরা করছে। কয়েকটি দল বেঁধে চলাফেরা করে, বেশীর ভাগ তারাই কিন্তু নিঃসঙ্গ শূন্যচারী। শূন্যপথটা এতই প্রকাণ্ড যে, এক একটি তারার মধ্যপথের যে দূরত্ব তা লক্ষ যোজনেরও অধিক। কাজেই ব্রহ্মাণ্ডে একটি তারার সঙ্গে আর একটি তারার সাক্ষাৎলাভ অতিমাত্র দুর্লভ।

কিন্তু হাজার দুই কোটি বছর আগে আকাশপথে এরকম একটি দুর্লভ ঘটনা ঘটেছিল ! সূর্য্য একটি বিরাট "তারা" তোমরা জানো। এখন সূর্য্যের কাছাকাছি আর একটি তারাকে দেখা গেল। চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবীর বুকে যেমন আলোড়ন তোলে তেমনি এই দ্বিতীয় তারাটিও নিশ্চয় সূর্য্যের বুকে সেরকম আলোড়ন তুলেছিল। সে আলোড়ন এতই বিরাট ও প্রবল যে, তার তুলনায় চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রে যে তোলপাড় হয় তা অতি নগণ্য। এই দ্বিতীয় তারাটি বোধহয় পর্ব্বত প্রমাণ আলোড়ন সূর্য্যের বুকে উপস্থিত করেছিল। যখন এ দ্বিতীয় তারাটি সূর্য্য থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকল তখন তার আকর্ষণের ফলে এই বিরাট পর্ব্বতপ্রমাণ আলোড়নগুলি সূর্য্যের গা থেকে খসে গেল। কিন্তু সূর্য্যের নিজের আকর্ষণও এত বেশী যে এই ছিন্ন অগ্নিখণ্ডগুলি একেবারে ছিটকে না গিয়ে সূর্য্যের চারিপাশে ঘুরতে থাকল এবং ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে লাগল।

এই খণ্ডগুলিকে আমরা বলি উপগ্রহ; আর আমাদের এই পৃথিবী তাদের একটি।

পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে টেলিস্কোপে সূর্য্যের চেহারা

(১), (২) আমেরিকা থেকে, ১৯১০ খৃষ্টাব্দ ; (৩) কাশ্মীর থেকে, ১৯১৬ ; (৪) ব্রেজিল থেকে, ১৯১৯।

চতুর্থ ছবিতে সূর্য্যের যে অগ্নিশিখার আলোড়ন দেখা যাচ্ছে—

৫০০,০০০ মাইল এই অগ্নিশিখা সূর্য্য থেকে উচ্চে উঠেছিল। পৃষ্ঠা ২৯০
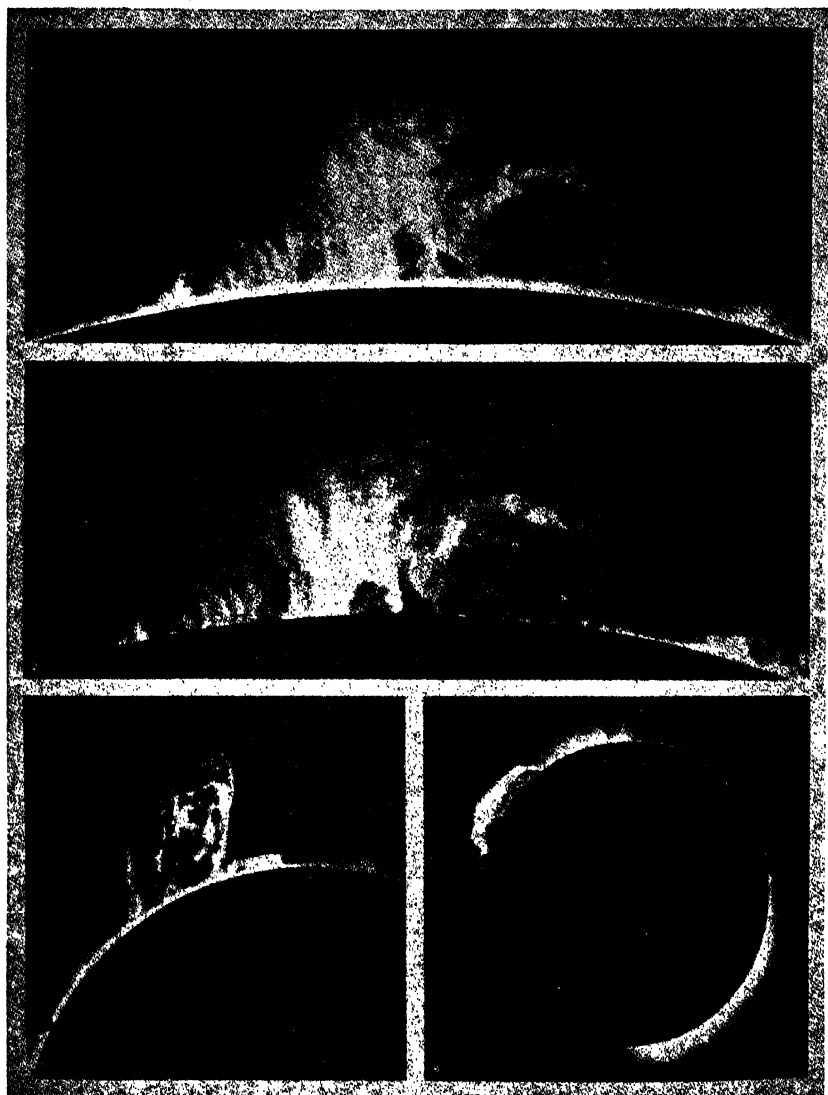
পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে টেলিস্কোপে সূর্য্যের চেহারা

(১), (২) আমেরিকা থেকে, ১৯১০ খৃষ্টাব্দ ; (৩) কাশ্মীর থেকে, ১৯১৬ ; (৪) ব্রেজিল থেকে, ১৯১৯।

চতুর্থ ছবিতে সূর্য্যের যে অগ্নিশিখার আলোড়ন দেখা যাচ্ছে—

৫০০,০০০ মাইল এই অগ্নিশিখা সূর্য্য থেকে উচ্চে উঠেছিল। পৃষ্ঠা ২৯০

সূর্য্য এবং অন্যান্য তারাগুলি এক একটি অগ্নিকুণ্ড; সেখানে কোনরকম জীবনধারণ অসম্ভব। কাজেই ঐ ছিন্ন সূর্য্যখণ্ডগুলিও যে অতি মাত্রায় গরম তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রমশঃ এই সূর্য্যখণ্ডগুলি ঠাণ্ডা হতে থাকল—যেটুকু গরম আজ রয়েছে তা ঐ সূর্য্যের কাছাকাছি থাকার দরুণ।

ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে হতে এই গ্রহ-উপগ্রহের অন্ততঃ একটির মধ্যে, কখন্ আমরা ঠিক জানি না কিন্তু এক পরম রহস্যের মধ্যে দিয়ে, প্রথম জীবের আবির্ভাব হল। যেখানে জীবের আবির্ভাব হল সেটি আমাদের এই পৃথিবী।

এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী তাহলে কতটুকু? অর্থাৎ একটি বালুকণার অণু পরমাণুর একটি অংশের (পৃথিবী) ওপর দাঁড়িয়ে আমরা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের ঘরবাড়ী স্থানকাল কতটুকু! প্রথম উপলব্ধিতেই তো ভয়ে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি! এই অসীম অর্থহীন শূন্যপথ, এই অকল্পনীয় সৃষ্টিছাড়া কালপ্রবাহ যাতে মানুষের ইতিহাস চোখের একটি পলকের মত মনে হয়, পৃথিবীর এই করুণ নির্জ্জনতা, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের থাকবার জায়গার এই অতি-নগণ্যতা—সবকিছু আমাদের মনে বিপুল ভীতি জাগিয়ে তোলে। আমাদের আশা আকাঙ্খা, স্নেহভালবাসা, আমাদের আবিষ্কার, আমাদের ধর্ম্ম, কলা, প্রতিষ্ঠা সবকিছুই এই বিশ্বের বিপুলতায় অর্থহীন হয়ে পড়ে তাদের যে একটা জায়গা আছে তার যেন কোন ইঙ্গিত নেই। বিশ্বের সমস্ত নিয়ম কানুন আমাদের একেবারেই বিপক্ষ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শূন্য জায়গাগুলো এতই নির্ম্মমভাবে ঠাণ্ডা যে মানুষের জীবন সেখানে এক মুহূর্ত্তে জমে যেতে পারে; বিশ্বের গ্রহতারাগুলি আবার এতই গরম যে সেখানেও দগ্ধ হয়ে যেতে হবে। শূন্যপথে আবার গ্রহ নক্ষত্র ক্রমাগত দিকবিদিক চলাফেরা করছে আর কখনও সংঘর্ষিত হচ্চে। মনে হচ্চে বিশ্বের সমস্ত নিয়ম কানুনই নিদারুণ মৃত্যুময়।

এই রকম নির্ম্মম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন আমরা দুর্ঘটনায় বা ভুল করে যেন হোঁচট খেয়ে এসে পড়েছি!

তারাগুলি সমস্ত বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে। এই অগ্নিপুঞ্জ অতিক্রম করে আবার অচিন্ত্যনীয় ঠাণ্ডা; তাদের নিকটেই আবার হাজার হাজার ডিগ্রির এত উত্তাপ যে সেখানে সমস্ত শক্ত পদার্থ গলে গলে পড়ে, সমস্ত জলীয় পদার্থ সেখানে টগবগ্ করে ফোটে।

এই সমস্ত অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে যে পাতলা পরিমিত কটিবন্ধটুকু বা আবরণ আছে, মাত্র সেখানেই জীব বাঁচতে পারে। এর বাইরে ঠাণ্ডায় জীব আড়ষ্ট হয়ে যায়, এর মধ্যের উত্তাপে জীবন দগ্ধ হয়ে যায়। এই জীবনধারণ উপযোগী ক্ষীণ আবরণ এর আয়তনও বিশ্বের মাঝে অতি নগন্য, তাতেও আবার জীবের উপযুক্ত থাকার জায়গা খুঁজে পাওয়া অসাধারণ ব্যাপার। এটাই অস্বাভাবিক, যে অন্যান্য সূর্য্যেরা আমাদের সূর্য্যের মত গ্রহ উপগ্রহ সৃষ্টি করবে। বোধ হয় এক লক্ষ তারার মধ্যে একটি মাত্র গ্রহ আছে যেখানে সামান্য একটু জায়গা জীবন ধারণের উপযোগী হতে পারে।

এই সমস্ত কারণে একটি কথাই বার বার মনে হয়। মনে হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম কানুন এ নয় যে

আমরা বেঁচে থাকি। সৃষ্টি করা যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত নিয়মের বাইরে: ধ্বংস করাই যেন তার নীতি। কিম্বা হয়ত জীবন সৃষ্টি করা ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে একটা নিতান্ত উপেক্ষনীয় অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণীরা তার আপন নিয়মের একেবারেই সৃষ্টি ছাড়া।

আমাদের জীবন যে কত নগন্য আরো সহজে বোঝা যাবে। আলো ও উত্তাপের কয়েকটি বিশেষ উপযোগী অবস্থার মাত্রাতেই জীবনধারণ সম্ভব এ কথা আমরা জানি। সেই মাত্রা কম বেশী হলেই আমাদের জীবন টলমল করে উঠে। সূর্য্য থেকে ঠিক উপযুক্ত মত উত্তাপ পেলে আমরা বেঁচে থাকি। সূর্য্যের উত্তাপ বাড়া কমার ওপর আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে।

আর আসল ব্যাপার এই, যে, সূর্য্যের উত্তাপ বাড়া বা কমা অতি সহজেই ঘটতে পারে!

প্রাগ ঐতিহাসিক মানব এক বিরাট তুষার প্রবাহ দেখেছিল পৃথিবীর বুকে নামতে। সে প্রাচীন মানব নিশ্চয় সে ঘটনায় দারুণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। প্রতি বৎসর উপত্যকায় তাদের বাসভূমিতে তুষার নদী নেমে এসে তাদের ধ্বংসের পথ সৃষ্টি করত, মনে হোত সূর্য্য বুঝি ক্রমশঃ নিভে আসছে। আমাদের মত তাদেরও নিশ্চয় মনে হয়েছিল—বেঁচে থাকা এ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম নয়।

সুদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ এক তুষার আক্রমণ আমাদের মনেও ভীতি সঞ্চার করছে। "ট্যানটেলাস্" যেমন গভীর হ্রদে ডুবতে ডুবতেও তৃষ্ণায় মরতে বসেছিল, তেমনি আমরাও শীত সমুদ্রের মধ্যে জমে মরব, হয়ত এই ভাগ্য আমাদের ঠিক হয়ে আছে। সূর্য্যের নিজের উত্তাপের কোন অফুরন্ত ভাণ্ডার নেই, ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার উত্তাপ আসছে কমে। বাসোপযোগী যে ক্ষীণ কোন জায়গাটুকু আজও আমাদের আছে—সে জায়গাও গুটিয়ে ছোট হয়ে আসছে। আমাদের বাঁচতে হলে ঐ মরণাপন্ন সূর্য্যের কাছেই সরে যাওয়া চাই। কিন্তু সূর্য্যের কাছাকাছি যাওয়া দূরে থাকুক, আমরা বাস্তবিক যেন তার থেকে ক্রমশঃ দূরেই সরে যাচ্ছি।

আমাদের জন্ম ও জীবন দাতা সূর্য্য তো নিজই মরণাপন্ন। আর নানা আকর্ষণের ফলে অন্ধকারে ও বাইরের নির্ম্মম ঠাণ্ডার ধ্বংসের পথে আমাদের পৃথিবী এগিয়ে চলেছে!

যতদূর প্রত্যক্ষ করতে পারা যায়, ক্রমশঃ দূরে চলে যেতে যেতে শীতে জমে আমরা বিলুপ্ত হব: কিম্বা হয়ত, ব্রহ্মাণ্ডের তারকারাশি গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে কোন বিপুল সংঘর্ষে ও প্রলয়ে আমরা তার অনেক আগেই আকস্মিক ভাবে একেবারে লয় প্রাপ্ত হব। এই চরম দুর্ভাগ্য কেবল যে একা আমাদের পৃথিবীর পক্ষেই স্বাভাবিক তা নয়—অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে যদি কোনরূপ প্রাণী থাকে তাদের মৃত্যুও ঠিক এমনি দুর্ভোগের মধ্যে দিয়েই ঘটবে।

তবে একটা আশার কথা আছে। সে সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করে যাবে।
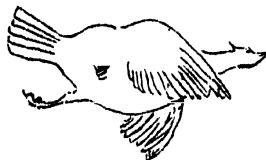
ইষ্ট ইণ্ডিয়া টেনিস

এবার কলকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রতিযোগিতায় আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড়রা যোগ দেওয়াতে খেলাগুলি বেশ উপভোগ্য ও উঁচু দরের হয়েছিল। সিঙগ্‌লস্ প্রতিযোগিতায় আমেরিকার তরুণ খেলোয়াড় ডন ম্যাকনিল ভারতবর্ষের পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ঘাউস মহম্মদকে তিনটি সোজা সেটেই হারিয়ে দিলেন। ফলাফল হোল : ৬-৪, ৬-৪, ৬-৩। প্রতিযোগিতায় সকল বিষয়ে তরুণ আমেরিকানটির খেলা কৃতিত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া খেলায় তাঁর মত ব্যাক-হ্যাণ্ড ড্রাইভিং ও ভলি আর কেউ দেখাতে পারেন নি। সেদিন ভারতের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় ঘাউস মহম্মদ ম্যাকনিলের কাছে খেলায় ম্লান হয়ে গিয়েছিলেন।

মিক্সড্ ডাবলস্ খেলাতে অবশ্য ভারতবর্ষ আমেরিকান দলকে হারিয়েছে। এতে খেলেছিলেন সাহনী ও মিস হার্ভে জনষ্টন্ (ভারতবর্ষ) এবং এণ্ডারসন ও মিসেস বিশপ (আমেরিকা)।

ভারতবর্ষ—আমেরিকা প্রদর্শনী খেলাগুলিতে ডন্ ম্যাকনিল (আমেরিকা), ৬-২, ৬-৮, ৬-৩ এই ফলাফলে সাহনীকে (ভারতবর্ষ) হারালেন। অন্যদিকে অবশ্য ভারতবর্ষ (ঘাউস মহম্মদ) হারাল আমেরিকাকে (এণ্ডারসন). তার এই ফলাফল : ৬-৩, ৩-৬, ৬-৩।

কিন্তু দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ আর ঠাঁই পেলে না ; সেদিন আমেরিকার জয়জয়কার। এণ্ডারসন আমেরিকার দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড় কিন্তু এই খেলোয়াড়টি সেদিন অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে ভারতবর্ষের দোস্‌রা নম্বর খেলোয়াড় সাহনীকে হারিয়ে দিলেন—তার ফলাফল হল : ৭-৯, ৬-২, ৬-১।

এদিকে ডন্ ম্যাকনিল তো বেশ সোজাভাবেই আবার ভারতবর্ষের পয়লা নম্বর খেলোয়াড়কে ১-৬, ৬-৪, ৬-৩ এ হারিয়ে দিলেন।

তৃতীয় ডাব্‌লস্ খেলাটিতেও আমেরিকার জয় হল। সেদিন ভারতবর্ষের বড় অপয়া দিন গিয়েছে। ডাব্‌লস্ এ রবার্টসন ও এণ্ডারসন হারালেন বেটি ও মিসেলমুরকে।

এসব দেখে শুনে টেনিসে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই প্রমাণ হয়। অথচ আমেরিকার যাঁরা সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় তাঁরা এ আমেরিকান দলে কেউ ছিলেন না!

ক্রিকেট ঃ রঞ্জিট্রফি

ক্রিকেট খেলাতেও কলকাতায় এবার বেশ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য হয়েছিল। বিশেষ করে ইণ্টার প্রভিন্সিয়াল ক্রীকেটে রঞ্জি ট্রফির প্রতিযোগিতায়। বেঙ্গল ও মধ্য-ভারত এর খেলা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। অবশ্য মধ্য ভারতীয় দল বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না। নাইডুরা ও মাস্তাক আলি না থাকার দরুণ এ দলটি বেশ দুর্ব্বল ছিল বলতেই হয়। যা হোক বেঙ্গল এক ইনিংস ও ১২১ রাণে মধ্য-ভারতকে পরাজিত করে। মধ্য-ভারতের খেলোয়াড়ের মধ্যে জে, এন, ভায়া খুব চমৎকার খেলা দেখিয়েছিলেন ও একাই ৮৯ রাণ করেছিলেন।

রঞ্জি ট্রফিতে দক্ষিণ পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে যে খেলাটি হয়েছিল তাতে দক্ষিণ পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশের দলকে একেবারে গো-হারাণ হারালে। ফলাফল হল ঃ পাঞ্জাব এক ইনিংস্ ও ৭২ রাণে জয়ী হল।

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার এখনও মীমাংসা হয় নি। খেলা এখনও কিছুদিন চলবে। শীঘ্রই বেঙ্গলটীম মাদ্রাজ এর সঙ্গে রঞ্জি ট্রফিতে খেলবে। বেঙ্গল টীম নির্ব্বাচিত হয়ে গিয়েছে। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা যোগদান করবেন ঃ—

লঙফিল্ড—ক্যাপ্টেন; ভ্যান্ ডার গুট্; এম্ ডাবলু বারেণ্ড; কার্ত্তিক বোস; নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জী; তারা ভট্টাচার্য্য; কমল ভট্টাচার্য্য; বি ম্যালকম্; পি মিলার; এ জাব্বর; হজেস।

এই নির্ব্বাচনে দুটি ভাল খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া হয়েছে—এস্ গাঙ্গুলী ও বাপি বোস, এঁরা দুজনেই বেশ ভাল খেলছিলেন। এঁদের বাদ দিয়ে কেন ম্যালকম ও হজেসকে নেওয়া হল, এ নিয়ে ক্রিকেট আসরে তুমুল তর্ক উঠেছে।

মৃত্যু

শ্রীশুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

অপারেশন থিয়েটার।

সাদা মার্বেলের টেবিলটা ঘিরে আমাদের বসবার গ্যালারী; বড় বড় কাঁচের জানলা-ভরা ঘরখানি পরিষ্কার সাদা ধবধবে। সর্ব্বাঙ্গ সাদা এ্যাপ্রণে ঢেকে আমরা বসে আছি। এমনিই পোষাক পরে ব্যবস্থা করছে দু'একজন নার্স, সার্জ্জেনের এ্যাসিষ্টান্ট, এ্যানেসথেটিক। সবাই উদ্‌গ্রীব, কখন্ সুরু হবে অপারেশন।

একটা ট্রলিতে ক'রে রোগীকে নিয়ে আসা হ'ল। ছোট বাচ্চা একটি ছেলে—দুরারোগ্য অন্ত্রের অসুখে সে ভুগছে। ঘরের গন্ধে, আর এই সব অদ্ভুতপোষাকপরা মূর্ত্তি দেখে তার দুই চোখে নেমে এসেছে ভয়ের ছায়া। বোবা বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে যেন বুঝতে পারছে না সে কোথায় এসেছে—তাকে নিয়ে কি করা হবে।

সাদা পোষাক পরা সার্জ্জেন ঢুকলেন একটি কাঁচের দরজা ঠেলে। নিঃশব্দে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। মাথা নাড়িয়ে আমাদের বসতে বলে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। ইতিমধ্যে রোগীকে টেবিলের উপর শুইয়ে এ্যানেসথেটিক তাকে অজ্ঞান করে ফেলেছে। নিঃশ্চল, নির্জ্জীব অবস্থায় সে পড়ে রয়েছে, পেটের খানিকটা বাদে দেহের সবটা সাদা কাপড়ে ঢাকা। পাশে দাঁড়িয়ে এ্যাসিষ্টান্ট যন্ত্রপাতি ঠিক করছে।

'রেডি?' নিস্তব্ধ ঘরে সার্জ্জেনের গলার আওয়াজে আমরা চমকে উঠলাম।

'ইয়েস্ সার', এ্যাসিষ্টান্ট আর এ্যানেসথেটিক একসঙ্গে উত্তর দিলে। দৃঢ়পদক্ষেপে সার্জ্জেন এগিয়ে এলেন। ছুরি নিয়ে অকম্পিত হাতে তিনি অপারেশন সুরু করলেন। মুহূর্ত্তের মাঝে চামড়া, মাংস সরিয়ে বার করে নিয়ে এলেন একরাশি অন্ত্র; ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন কোথায় তার ক্ষত। অবাক্ বিস্ময় আর শ্রদ্ধার চোখে আমরা দেখছি। ঐ যে সাদা কাপড় ঢাকা দেহ পড়ে রয়েছে—ও কি আমাদের মতই

মানুষ—সুখ দুঃখ, হাসি কান্না জীবনের সব মাধুর্য্যে জড়ান ? হয়ত, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে ও কতকগুলি হাড় ও মাংসের সমষ্টি ছাড়া আমাদের কাছে কিছুই নয়—ওরই মাঝে লুকিয়ে রয়েছে জ্ঞান, আর তারই সন্ধানে এসেছি আমরা।

'ষ্টপ ! রেস্পিরেশন ফেলিং—' চাপা ভীতগলায় এ্যাসিষ্টান্ট বলে উঠল। ছুরি ফেলে সার্জ্জেন নাড়ী ধরলেন—এক মুহূর্ত্ত—দৃঢ়কণ্ঠে বললেন 'অক্সিজেন।' চোখের পলকে সমস্ত বদলে গেল। এতক্ষণ যে জীবনের অস্তিত্বের কথা মনেও আসে নি তারই জন্যে অসাধারণ ব্যস্ততা পড়ে গেল। অক্সিজেন—বাঁচাতেই হবে ঐ জীবনটিকে, বিজ্ঞানের সমস্ত শক্তি প্রয়োগে। এক মিনিট, দু মিনিট······পাঁচ মিনিট। না, হল না। ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভে গেল ···।

ম্লানমুখে সকলে ফিরে এলাম—কিন্তু সে কি ঐ মৃত্যুর জন্যে ? না। জ্ঞানের মশাল হাতে ধরে মানব সভ্যতাকে আলোক দিতে আমরা এগিয়ে চলেছি। সে মশাল জ্বালিয়ে রাখতে এমন কত মৃত্যু হচ্ছে—হবে······সেকথা ভেবে দেখবার সময় নেই, সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি, অবিচলিত দৃঢ়পদে।

মায়াবাড়ী

শ্রীমীরেন্দ্রকুমার সরকার

ঐযে দেখছ নদীর বাঁক, ওরই ঠিক পূবে আছে এক রাস্তা। সেই রাস্তা দিয়ে গেলে দেখতে পাবে এক বন। সেই বনের ভেতর আছে একটা সুন্দর বাড়ী। সেই বাড়ীর নামই হ'চ্ছে 'মায়াবাড়ী'। বনের ভেতর ঢুকতে গেলেই দু'টি কুকুর আসবে তোমায় তাড়া করে; আর তুমি যদি ঘাবড়ে না গিয়ে ঢুকতে পার সেই বনে তবেই দেখতে পাবে 'মায়াবাড়ী'। আর কুকুর দু'টোর ভয়ে যদি পালাবার চেষ্টা কর তবেই তারা তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু এমনিই মজা যে মায়াবাড়ীর ভেতর ঢুকে তুমি তাদের যা' আদেশ করবে তাই তারা বিনা আপত্তিতে করে যাবে।

সেবার এক বুড়োর কাছে ঐ 'মায়াবাড়ীর' এ রকম আশ্চর্য্য গল্প শুনে আমার ভারী লোভ হল সেখানে যাওয়া চাই-ই। গ্রামে ডানপিটে ছেলে বলে আমার খ্যাতি ছিল। রোজই ভাবতাম কেমন করে যাওয়া যায়। শেষে একদিন সকাল বেলা সবার কথা অগ্রাহ্য করে রওনা হলুম মায়াবাড়ীর পথে। পথে এক বুড়ীর সাথে দেখা। বুড়ী আমায় জিজ্ঞেস করলে আমি কোথায় যাচ্ছি। সব কথা তাকে খুলে বললাম। সে আমায় খুব উৎসাহ দিলে এবং সাবধান করে দিলে যে কুকুর দু'টোকে না তাড়ালে বাড়ী ফেরা যাবেনা।

মায়াবাড়ীর বনে যেই গেছি ঢুকতে অমনি কুকুর দু'টো এল আমায় তাড়া করে। ভয়ে আমার মুখ গেল শুকিয়ে। দু'চোখ বুজে মনে সাহস এনে বহু কষ্টে এগুতে লাগলুম। বনের ভেতর ঢুকেই দেখি কুকুর দু'টো যেন কোথায় উধাও হয়েছে। তারপর সোজা পূবে এগিয়ে গিয়ে দেখি মণিমুক্তো দিয়ে তৈরী ছোট্ট একটা ঘর। ঘরটার ভেতর তিনটী মাত্র কামরা—একটী শোবার, একটী বসবার আর একটী খাবার। কিন্তু প্রত্যেকটী কামরাই সুন্দর করে গোছান রয়েছে। মনে হয় যেন এই মাত্র কেউ গুছিয়ে গেল। কিছুক্ষণ এঘর ওঘর ঘুরে খাবার ঘরে গিয়ে কিছু খেয়ে এলুম। কিন্তু একলা কিছুতেই মন টিকছিল না। আমি

বেরিয়ে পড়বার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগলুম। তখনই সে বুড়ীর কথা পড়ল মনে। কুকুর দুটোকে ডেকে আদেশ করলুম—'আমি স্নান করব, আমার জন্য দুধ সাগরের জল নিয়ে এস।' তারা ছুটল দুধ সাগরের পথে, আর এই অবসরে আমিও ধরলুম আমার বাড়ীর পথ। সেই থেকে আর ওপথ কোনদিন মাড়াইনি; তবে তোমরা যদি কেউ যেতে চাও তা'হলে আবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

আমার প্রতিবেশী কে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র

তোমার প্রতিবেশী?—তোমার প্রতিবেশী সে, যাকে তুমি পার সাহায্য ক'রতে এবং সেবা ক'রতে; যার বেদনা-ব্যথিত চিত্ত ও চিন্তা-জ্বালা-জর্জ্জরিত ললাট যুগল তুমি তোমার হস্তের স্নেহপরশ দিয়ে ক'রতে পার সুশীতল।

তোমার প্রতিবেশী সেই মুমূর্ষু দীন দরিদ্র—রিক্তের আতিশয্যে যার চক্ষু নিরুজ্জ্বল ও ম্লান হ'য়ে পড়েছে; ক্ষুধার তাড়না যাকে মানুষের নির্দয়-দুয়ার থেকে দুয়ারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যাও, তাকে কিছু সাহায্য করগে।

তোমার প্রতিবেশী—সেই জীবন পথের ক্লান্ত পথিক, যার কঠোর পথ চলা প্রায় সাঙ্গ হ'য়ে এসেছে; যার পিঠের শিরদাঁড়া—রোগ, শোক ও দুশ্চিন্তার গুরুভারে একেবারে বক্র হ'য়ে পড়েছে। যাও, তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কর!

এ জগতে, জীবনের আদরের ধন—তাদের যারা হারিয়ে ফেলেছে সেই বৈধব্য দশা প্রাপ্ত অসহায় মেয়ে ও মাতৃপিতৃহীন অনাথ শিশুদল তোমার প্রতিবেশী। তাদের তুমি আশ্রয় দান কর!

তোমার প্রতিবেশী—ঐ দূরে যারা মুখ বুজে কাজই ক'রে যাচ্ছে—সমাজ যাদের শারীরিক, মানসিক সকল স্বাধীনতাই ছিনিয়ে নিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখেছে—সুখ ব'লতে ইহলোকে যাদের আর কোন আশা ভরসা নেই। যাও, এমন যেসব তোমার প্রতিবেশী, যদি পার, গিয়ে, তাদের উদ্ধার কর!

শোন, শোন, ভাই! তুমি অমন আনমোনা চ'লে যেও না। তুমিই হয়ত' সেই বীর হৃদয় যে তাদের এই সকল অসহনীয় দুঃখ, কষ্ট থেকে মুক্ত ক'রতে পারবে। আহা! তোমরা তাদের জন্য ভাব, ভাব—তাদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর! *

* অজ্ঞাত লেখকের Who is my neighbour নামক কবিতার সরল অনুবাদ

আমার প্রিয় ভাই বোনেরা !

আরও একটা মাস চলে গেল পায়ে পায়ে—এবার এল মাঘ! শীত কমে এসেছে—পাতাঝরা কাঙাল গাছগুলো কান পেতে আছে কার পদধ্বনি শোনার জন্য। বিবর্ণ রুক্ষ পাণ্ডুর প্রকৃতি চেয়ে আছে উৎকণ্ঠিত হয়ে—কে যেন আসবে তারই বেণু বাজছে।

পৌষ গেল কিন্তু যদি কখনও বাংলার পল্লীর ভিতর এই পৌষ মাসের আয়ু ফুরোবার আগে যেতে পারো যেখানে যন্ত্রদানব পৌঁছতে পারেনি—সেখানে শুনবে আনন্দের সুর, দেখবে সুন্দর দৃশ্য। কারণ পৌষ সংক্রান্তি উৎসব চলেছে।

পৌষ-এর এই শেষ দিনে—লক্ষ্মী পৌষকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা চলছে। মেয়েরা ভোর বেলা উঠে উৎসবের আয়োজন করে—গিন্নি বান্নিরা সুর করে লক্ষ্মী পৌষকে বলেন—

এসো পৌষ যেওনা
সোনার পৌষ যেওনা
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেওনা
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেওনা।

এই ইঁট কাট দিয়ে তৈরী পাষাণ সহরে এরই সুর বাজছে আমার কানে।

কল্পনা, অঞ্জলি আচার্য্য (নাগপুর) গ্রাঃ ৮৩৩

না ভাই, আমি অভিমান করে চিঠির বাক্স বন্ধ করিনি আর সম্পাদক মশাইও জায়গাটুকু কেড়ে নেননি। আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি? অমলি! তোমার কথামত আবার চিঠির বাক্স নিয়ে বসেছি—আর রাগ নেইতো? হ্যাঁ সেদিন ওখানে উপস্থিত ছিলুম আর তোমাদের ইন্দিরাদির সঙ্গে দেখা ও গল্প শোনা দুইই হয়েছে। আমার কথা শোননি বুঝি? কল্পনা! তোমার হাতের লেখা

ভাল, আমি লেখা দেখে হাসিনি—তুমি নিজে আমায় লিখেছ দেখে আনন্দে হেসেছি ভাই। প্রথমবার যে ব্যাজ হয়েছিল তা ফুরিয়ে গেছে আবার তৈরী হচ্ছে, হলেই পাঠাবো।

অমলা চক্রবর্ত্তী (মীরাট) ১২০৫

এত দেরাতে চিঠি কেন? আপনার করে নেবো আমি, না তোমরা আমায় নেবে ভাই? কাকে লেখনী বন্ধু নেবে তুমি নাম জানিও।

পিন্টুরাণী, মিন্টুরাণী বসু, (চুঁচড়া) ১১১৮

পিন্টু! লীলা ব্যানার্জ্জি বলে কোনও গ্রাহিকা আমাদের নেই—তাই ঠিকানা দিতে পারবো না।

মিন্টু! সুনন্দার ঠিকানা তোমায় পাঠালাম। সেলাই-এর কথা ওবাড়ীতে বলেছি কিন্তু তোমাদের ইন্দিরাদি স্থানাভাবে কয়েকমাস লিখতেই পারেন নি। স্মরণকে বলো রথীশের ঠিকানা পাঠাচ্ছি। দেখা একদিন হবেই ভাই, ব্যস্ত কেন?

রণেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার (ভবানীপুর) ১২০০

রাণু ভাই! রংমশাল দেরীতে প্রকাশের জন্য তুমি যে কারণ দেখিয়েছ তা মোটেই নয়—আমি বলি—তোমাদের সংস্পর্শে রংমশাল আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। ক্ষমা চাইতে হবে কেন? আমরা খুব চেষ্টা করি যাতে খুব তাড়াতাড়ি রংমশাল প্রকাশিত হয়—কিন্তু গত কয়েক মাস বড্ড দেরী হচ্ছে—আমি কর্ত্তৃপক্ষকে এবার তোমাদের কথা জানাবো। তুমি আর ওসব কথা ভেবোনা ভাই কেমন?

পঞ্চানন রুই (কলিকাতা) ১১৬৩

তুমি চাঁদার কথা যা লিখেছ তাতে জানাচ্ছি যান্মাষিক গ্রাহকরা টাকা দেবার সময় বার্ষিক চাঁদা দিতে পারে।

জ্যোৎস্নাকুমার সেন গুপ্ত (দিনাজপুর) ১১৬৯

রংমশাল সম্বন্ধে যা বলেছ তার জন্য আমরা খুব চেষ্টা করবো ভাই, বুঝেছ?

শ্রীলেখা বসু, গ্রাঃ ১১৪১

আমার ভুল কি, তোমার ভুল জানিনা। তোমার নামের 'শ্রী'টী উড়ে গিয়েছিল—এখন কিন্তু যথাস্থানে ফিরে এসেছে ভাই দেখে নিও ঠিক হয়েছে কিনা। তোমার সব নাম কয়টাই আমার ভাল লেগেছে। মেজদির নামটা আমায় বলে দিও, তাহলে তাঁকে তুমি আমি দুজনেই জব্দ করে দেবো—কি বল?

নীরেন্দ্রনাথ রায় (আঠার বাড়ী) ১১৮৮

'চিঠির বাক্স'—পৌষের সংখ্যায় নতুন নয় তুমি বুঝতে ভুল করেছ। কার্ত্তিকের রংমশাল পেয়েছ আশা করি? না পেলে পরিচালক মশাইকে চিঠি লিখো তুমি বোধ হয় নতুন গ্রাহক?

কামাখ্যাচন্দ্র বল (ডালটনগঞ্জ) ৮০৩

মাখন ভাই ! তোমার বাবা গত ৬ই সেপ্টেম্বর মারা গেছেন শুনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। তোমাদের মানসিক অবস্থা আমিও বুঝতে পেরেছি, শ্রীভগবান তোমাদের মনে শান্তি দিন। যাদের ঠিকানা চেয়েছ পাঠালাম।

রহিমা খাতুন—গ্রাঃ ৭৭৭

তোমার আগের চিঠি আমি তো পাই নি দিদু, পেলে নিশ্চয় উত্তর দিতাম। ব্যাজ আমাদের ফুরিয়ে গেছে—আবার তৈরী হচ্ছে—হলেই পাবে। তোমার কথা শুনে আমি একটু হাসিনি তোমার ইচ্ছাটা অতি সহজ তো ভাই—করে ফেলো—তাতে আমারও খুব ভাল লাগবে বোনটী।

শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী (শ্রীরামপুর) ১০৯০

তোমাদের উৎকণ্ঠার সীমা নেই জানি। না ভাই অসুখ করেনি, আর তোমাদের ভুলিনি বা চিঠির বাক্স তুলে দেওয়াও হয়নি তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। এক বছরের গ্রাহক হলে ২।৴০ পাঠাতে হবে। তোমার রংমশাল আর একখানি পাঠান হয়েছে, পেয়েছ আশা করি।

জয়ন্তী সিংহ (কলিকাতা) ৮১৩

তোমার এটা প্রথম চিঠি, কিন্তু তোমার কথা ঠিক হয়নি—চিঠি পড়তে বিশেষ আমার এই সব স্নেহের ভাইবোনদের চিঠি পড়তে কোন দিন ধৈর্য্যের অভাব ঘটে না, তোমার লেখা? সেও খু-উ-ব ভাল। এখন তো ছোট্ট বড় হলে আরও ভাল হবে।

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (হাওড়া) ১০৮৮

তোমার পূর্ব্বের চিঠিতে ভাই উত্তর দেবার বিশেষ কিছু ছিল না তাই একসঙ্গে দিয়েছিলুম—তারজন্য দুঃখ হয়েছে বলে এইবার আলাদা লিখলাম। তোমার কবিতা যদি সম্পাদক মহাশয় মনোনীত করেন তাহলে নিশ্চয় প্রকাশিত হবে। লেখা যখন পাঠাবে কপি রেখো। দিলীপ রায়ের ঠিকানা তোমায় পাঠাবো। রংমশালকে তোমরা কত ভালবাস তা আমি জানি।

নিশানাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা) ১০০৯

রংমশাল দলের গত প্রীতি সম্মিলনীতে এসে তারপর তুমি যা চিঠি লিখেছ তা আমরা পেয়েছি। চিঠিটী খুব বড় আমি তার কিয়দংশ তোমার ভাইবোনদের পড়তে দিচ্ছি···"সেই দিন পরিচালক মহাশয়ের" ইচ্ছাটীর বিষয় কিছুক্ষণ ভেবেছিলাম, তাঁর ইচ্ছা অন্ততঃ বছরে চার, ছয়বার বা দুইবার এইরূপ সম্মেলনীর আয়োজন করা।···তার ইচ্ছা যদি সফল হয় আমাদের পক্ষে বড়ই আনন্দের কথা। এ বিষয়ে তিনি আমাদের সাহায্য আশা করেন কিনা জানি না, তবে আমরা বিশেষ আমি তাঁকে সব দিক দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আর একটী কথা চুপি চুপি আপনাকে জানাই যে প্রতি সম্মিলনী উৎসবের আগে বা সময়ে যে সমস্ত প্রতিযোগীতার আয়োজন হ'বে তার জন্য প্রতিবারেই আমি ছয়টী পর্য্যন্ত মেডেল দিতে প্রস্তুত। এ ছাড়া প্রতি বৎসরের একটী সম্মিলনীতে গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যে যিনি গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধে

আপন প্রতিভা রংমশালের মধ্যে দিয়ে বৎসরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করবেন তাঁকে একটী Shield (Running) ও একটী মেডেল দেবার ইচ্ছা রইল।" নিশানাথ! তোমার মতামত ভাল, আমি এ বিষয় পরিচালক মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলে তোমায় পরে জানাবো।

গুলজার গ্রাঃ ১১৮৫

তোমার ২৮শে অগ্রহায়ণের চিঠির কাজ আশাকরি মিটে গেছে সেজন্য আর তার উত্তর দেওয়া দরকার মনে করলাম না।

অরুণ ঘোষ (কলিকাতা) ১০৬৬

তোমরা যদি ভাই অত বেশী অভিমান করো আমি তাহলে কোথায় যাই? ভুল একটু হয় তো, থাক এখন আর রাগ করতে পাবে না লক্ষী ভাইটী আমার! শিবপ্রসাদ সেন এর ঠিকানা তোমায় পাঠিয়ে দেবো।

রেখা (পাটনা) ৩৭২

তোমাদের 'বাসন্তিকা' আর 'হীরার নূপুর' সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে জেনে খুব আনন্দ হলো। শামুককে বলো ছোটবোনকে ভালবাসতে হয় তার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। পরীক্ষা কেমন হলো?

কমলাদাস (শিলং) ৫৮১

এতদিনে তুমি বোধহয় অগ্রহায়ণের রংমশাল পেয়েছ। বাণী ঘোষের চিঠি না পেয়ে দুঃখ করেছ, কিন্ত সে তোমার চিঠি পেয়েছে লিখেছ—তার পদবী হঠাৎ বদলে গেল কিন্তু আমাদের একেবারে ফাঁকি দিয়ে—বুঝেছ? সেইজন্য ব্যস্ত ছিল এইবার সে তোমায় চিঠি লিখবে। আমার মনে হয় চিঠির সঙ্গে সন্দেশও এসে পৌছবে কি বল? আর কাকে লেখনী বন্ধু নেবে নাম জানিও ভাই।

শান্তি কুণ্ডু (শান্তিনিকেতন) ১১৮৯

প্রথমবার তোমার চিঠির উত্তর ছোট হয়েছিল বলে দুঃখ করেছ ভাই কিন্তু জানো তো দিদু, জায়গা বড্ড কম তাই বড় করে উত্তর দেওয়া যায় না। তোমার চিঠিটী আগা গোড়া খুব চমৎকার। দিদি তোমার তো অনেক হয়েছে ভাই তাছাড়া এই দিদিভাইও রয়েছে। তোমার অনুরোধ নিশ্চয় আমি রাখবো ভাই, যথাসময়ে আমায় জানিও। যাদের ঠিকানা চেয়েছ পাঠাচ্ছি।

বাণী সেন (পাটনা) ১০১২

বাণী, তুমি খুব দুষ্ট হয়েছ কিন্তু, এতগুলি ভাই বোন এবং দিদিভাইকে ফাঁকি দিয়ে চুপি চুপি পদবী বদলে ফেললে। উল্টো চাপ দিয়েছ আমরা নাকি তোমায় ভুলেছি! সেটী একেবারে ভুল তোমার এ চিঠি পাওয়ার আগে যে চিঠির কথা তুমি বলেছ তা আমি পাইনি পেলে নিশ্চয় উত্তর দিতাম। বয়সের কথা যা বলেছ তার উত্তর তো আগেই দিয়েছি ভাই, আর দল থেকে বাইরেই বা যাবে কেন? তুমি অভিমান করেছ, কিন্তু এবার অভিমান করবার কথা আমার। শিবানী কেন চিঠি দেয়নি তাতো জানিনা। ঠিকানায় কথা যা বলেছ হবে। আশাকরি এবার আর ভাই বোনদের ভুলে থাকবে না। তোমাদের নূতন যাত্রাপথ মধুময় হয়ে উঠুক—এই আশীর্ব্বাদ জানাই।

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (এলাহাবাদ)

যে ছুটো কারণের জন্য তুমি রংমশাল দলে আসছিলে না—সে ছুটোর জন্য ভাবনার কোনও কারণ নেই—ওকথার উত্তর আমি বহু পূর্ব্বেই তো দিয়েছি ভাই। রংমশাল দলের নিয়ম কানুন রংমশালের পাতাতেই আছে দেখে নিও।

কল্যাণকিশোর মুখোপাধ্যায় (গয়া) ৬৮৮

'প্রতিহিংসা' গল্প সম্বন্ধে যা বলেছ তার উত্তর হচ্ছে ওটা অনুবাদ গল্প, সুতরাং অনুবাদ করবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। নিজস্ব রচনা হলে অন্য কথা ছিল। কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা তোমায় পাঠিয়ে দেবো। বেশী লিখলে লেখা ভাল হবে।

কুমুদবন্ধু সেন গ্রাঃ ১১৭

ধাঁধা সম্বন্ধে যা বলেছ সে কথা পরিচালক মশাইকে জানিও। শৈলেন সেন আমাদের গ্রাঃ নয়। সুরমা, সমরেশ, সুজাতা রক্ষিত, আনোয়ারা বেগম তোমাদের অনেক দিন খবর নেই কেন? সুজাতা! তুমি কি বাড়ী চলে এসেছ? কই কোনও খবর আজ পর্য্যন্ত দাওনি কেন? শরীর কেমন আছে সব জানিয়ে শীঘ্র চিঠি লিখো, চিন্তিত আছি।

রবীন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা) ১০৭৭

ছোট ছেলেমেয়ে পড়বার মত বই কতকগুলির নাম তুমি জানতে চেয়েছিলে। বয়সের দিক থেকে কিছু বলনি। মাট্রিকক্লাশে যারা পড়ে তাদের মত আমি কতকগুলি বইএর নাম ঠিক করে রেখেছি। তোমার চিঠি পেলে আমি সেগুলির নাম তোমায় পাঠাবো—যদি রংমশালের পাতায় যায় ভালই না, হলে ডাক যোগে তোমার বাড়ী যাবে।

সকলে আমার ভালবাসা নিও।
শুভার্থিনী তোমাদের

বিজ্ঞাপন

কয়মাস থেকে আমাদের প্রেসের অত্যন্ত কাজ বাড়াতে রংমশাল ঠিক সময়ে তোমাদের হাতে দিতে পারছি না। সেজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। রংমশাল যে তোমাদের কত আদরের বস্তু তা তোমরাই আমাদের টেলিফোনে, চিঠিতে জানিয়েছ।

তোমাদের একটা সুখবর জানাচ্ছি যে সম্প্রতি আমাদের প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ এই পত্রিকার পরিচালনায় আরও ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিয়েছেন। তোমাদের অভাব অভিযোগ তাঁকে জানালে তিনি তাঁর যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করবেন। তাঁর ঠিকানা, ১০ নং, ইন্দ্ররায় রোড, টেলিফোন নং সাউথ ৪৭৯।

আশা করি এবার থেকে রংমশাল মাসের প্রথম সপ্তাহেই তোমাদের হাতে যাবে।

কে বলতে পারো?

বাঁ দিকে মানে তো বলে দেওয়া হ'ল—ডান দিকের কথাগুলো মানে ধরে পুরো করা চাই। এক একটি তারকা চিহ্নতে এক একটি অক্ষর বসালেই কথাটি খুঁজে পাবে। কে বলতে পারো কি কথাগুলি—?

(১) এ ছাড়া এখন উপায় নেই
(২) ভালও নয় মন্দও নয়
(৩) আধখানা বাদ দিলে পাখির পেটে যায়
(৪) না বুঝলে সব পণ্ড
(৫) সবাকেই খেতে হয়, কিন্তু কেউই খেতে চায় না
(৬) হাতেই আছে
(৭) ঠিক মোটেই নয় বরং কাজে লাগালে মিষ্টি পাওয়া যায়
(৮) একটি অক্ষরেই ঝঞ্ঝাট মিটে যায়

১	অ	*	দা	*	
২	*	বা	*		
৩	*	ন	*	ন	*
৪	মা	*			
৫	*	কি	*		
৬	*	*	ম	*	ল
৭	*	টিক			
৮	*	রব			

নতুন প্রতিযোগিতা

এবারের নতুন প্রতিযোগিতা হচ্ছে: ভারতবর্ষের কি জিনিষ তোমাদের ভাল লাগে ও কেন ভাল লাগে?

ধর যেমন এরকম জিনিষ—

ভারতবর্ষের বনজঙ্গল মাঠঘাট ক্ষেত	ভারতবর্ষের ফলফুল
ভারতবর্ষের পশুপাখী	ভারতবর্ষের পূজা পার্ব্বন মেলা
ভারতবর্ষের লোকজন	ভারতবর্ষের সাহিত্য
ভারতবর্ষের খেলাধুলা	ভারতবর্ষের গ্রাম
ভারতবর্ষের শিল্পকলা	ভারতবর্ষের আধুনিক পরিবর্ত্তন
ভারতবর্ষের নৃত্যগীত বাদ্য	ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থানগুলি, ইত্যাদি—

এরকম আরো অনেক যোগ করা যেতে পারে। এখন, তোমাদের, ভারতবর্ষের এই রকম, কি ভাল লাগে ও কেন লাগে, তাই নিয়ে ছোট্ট একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। রংমশালের ২৫ লাইনের বেশী হবে না। পাঠাবার শেষ দিন ১২ই ফাল্গুন। পুরস্কার—ছোটদের একটি, বড়দের একটি।

গত মাসের

ধাঁধার উত্তর

১। বুলাই বাবু মুখস্থ করছিল,
ফানুস ওড়ানো মানে অকারণে ব্যয় করা।

২। রবি দাদা বাড়ী আছো, বড়দা বাড়ী নেই,
কোথায় গেল? জানি না।

৩। কি হচ্ছে রে? উনুন খুঁড়ছি।
কি হবে? ভাত রাঁধবো।

৪। খোকন মণি খোকন মণি
কচ্ছ তুমি কি?
এই দেখ না আমি কেমন ছবি এঁকেছি।

গত মাসের ধাঁধার

উত্তর দাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তরদাতা

জগদিন্দ্রনাথ রায়, (ভবানীপুর)। প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর)। কামাক্ষাচন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ)। অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার মুখার্জ্জি, (ভবানীপুর) সুরেখা বসু, (কলিকাতা)। ধ্রুবেন্দুকুমার সেন, (কালীঘাট)। সাধনা, অর্চ্চনা, গোদাল ও রাখাল, (গৌহাটী)। ইরা বন্দোপাধ্যায়, (বালীগঞ্জ)। নিবেদিতা, সব্যসাচী ও ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা। পিন্টু, মিন্টু, কাবুল (কলিকাতা)। জীমূত বাহন রায়, কলিকাতা। নীলিমা, নমিতা, নির্ম্মলেন্দু, অমলেন্দু, (নিউ দিল্লী)। জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়, (নাওয়াদা)। অমিতাভা, মনোজিৎ, অপরাজিতা, নমিতা, ধ্রুবজ্যোতি, অদিতি, সুবোধ ও নির্ম্মল, (পুরুলিয়া)। রবীন্দ্র, সরিৎ, অরুণ, রণেন্দ্র, নীরেন্দ্র রায়, (আঠার বাড়ী)। জনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (খিদিরপুর)। অজয়নাথ ঘোষ, (ভেড়ামারা)। অসীম, অশোক, অসিত, অশেষ রণজিৎ, (পুরুলিয়া)। কুমুদবন্ধু সেন ও অজিত, রুবী, (কালীঘাট)। যশোধন ভট্টাচার্য্য, (বাঁকুড়া)। অরুণিমা ও প্রতিমা চক্রবর্ত্তী, (চট্টগ্রাম)। সন্দীপ রাও, (কটক)। শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী। (শ্রীরামপুর) তরুণ ঘোষ (কলিকাতা) সুনীলা বল (লাহোর) দ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য (রেঙ্গুণ) দুর্গাদাণী দেবী (শ্রীরামপুর) ইন্দিরা, কল্যাণী, রূপেশ ও শিপ্রা ঘোষ (ফেণী)।

একটী ভুল উত্তর দাতার নাম

প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী (কলিকাতা) কল্পনা ও অঞ্জলী আচার্য্য (নাগপুর) তারারাণী মুখার্জ্জী (আলমোড়া) দিলীপ ব্যানার্জ্জী (বালিগঞ্জ) গৌরাঙ্গ রায় (ধানবাদ) দিলীপকুমার রায় (চাইবাশা) কল্যাণকিশোর মুখার্জ্জী (গয়া) মনু, পারুল, হৃষিকেশ, অজিত, মোহিত (শ্রীহট্ট) রূপবানী রায় (ভবানীপুর) রাসমোহন ভট্টাচার্য্য (বর্দ্ধমান) গীতা দত্ত (কালীঘাট) মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর)।

বাদশাহী

গল্প

ঠাকুরদাদা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ

দাদাভাই !

—আরে কে ও ? কাবুলিদিদি যে ! ষষ্টির দিনে হঠাৎ, মা কই বাবা কই, দুলালী কই !

—তারা পুজোবাড়ীতে, তুমি তো গাড়ী পাঠালেনা তাই মিশিরের গাড়ীতে আমি চলে এলেম, আকাল আগমনী ! দাদাভাই—বাবা মা নেই, রাধাকান্তকে এইবেলা খেল্‌না আনতে বলে দাও !

—রাস্তায় আসতে কিছু দেখলে ভাল খেলনা কাবুলিদিদি ?

—একটি দেখেছি, চমৎকার মাটির পুতুল ঃ

—বল কেমন শুনি ?

—ষষ্টিবুড়ি ষষ্টি হাতে গুড়ি গুড়ি যায় ।

—ওই শোনো দিদি ষষ্টি ঠক্ ঠক্ সিঁড়িতে উঠছে পুতুল !

—না দাদাভাই আমার ভয় করছে, আমি ও পুতুল নেবোনা !

—দামটা লোকসান যাবে যে !

—ও তুমি নিয়ো ! আমি কি পুতুল খেলি ?

—না খেল তাকে তুলে রাখবে ঘর সাজিয়ে! আচ্ছা রাধাকান্তকে বলে এসো নতুন পুতুল জোগাড় করুক!—দাম!—সে ভাবনা নেই, বল আমার ঐ যে হাতঘড়িটা আছে সেইটের মধ্যে পয়সা আছে—চুপি চুপি বার করে নিয়ে, বুঝলে? হাঁ কাউকে বোলোনা।

—ও দাদাভাই এযে দাত্থ এলো লাঠি হাতে, ষষ্টিবুড়ো ত নয়!

—আমাকে দিয়ে দিয়েছ আর ফিরে পাবে না!

—ইস্ আমার দাত্থ!

—তোমার দাত্থ হতে পারে কি, দাম তো দিয়েছি আমি।

—কত হলে ছেড়ে দিতে পারো?

—দাম কেন, তুমি নাও না অমনি।

—দিয়ে নিলে যে কালিঘাটের কুকুর হয়!

—আচ্ছা কানাকড়ি একটা!

—আমি জানি সে ভয়ানক শক্ত পাওয়া!—আচ্ছা, কাবুলীওয়ালার সেই নাচগানটা একবার দেখিয়ে দাও।

—ঝুলি লাঠি তো আনিনি

—এই নাও তাকিয়া এই নাও লাঠি, লাগাও নাচগান কাবুলীদিদি:—

(ছড়া) পেশ্ওর সে আতাহুঁ অয়েস চায়ন মেরা কাম, অব রাহ্গীর হেন্দকা হুঁ
লেও লেও বাবু আঙ্গুর পেস্ত বদকসান কা খিসমিস্ বাদাম সস্তা বদস্তা হুঁ
সালুন্ মিছরী সালাম সালাম

(গীত) আঙ্গুর খরবুজ আহালু বখরা কাবুল কশ্মীর মশ্কট হালবা
খিসমিস খিসমিস অখরোট পিস্তা!
গুল্জিন্ পুস্তিন্ জাফেরাণ হোর হিং খোড়ি খড়ি খড়ি বিচ্তা
খাজুর খাজুর মিঙ্কই কাফুর কাবুলী ধুস্সা উনী কম্বল
বুনবন বোস্তা সিস্তান সহরা সস্তা জোড়!

—এইবার দাদাভাই ধর লাঠি, তোমার সেই ভিখিরি বুড়োর গান গাও

—কোন্ ভিখিরি ভাই

—সেই যে তোমার ছেলেবেলায় আগমনীর দিনে গান গেয়ে গেয়ে দোরে দোরে কেঁদে বেড়াত পয়সার জন্যে ?

—অমন কথা বলো না, পয়সার জন্যে কাঁদতো না সে

—তবে ?

সে তার মায়ের জন্যে কাঁদতো—মায়ের জন্যে কেঁদে কেঁদে তার দুটি চোখই কাণা হয়ে গিয়েছিল, সে লাঠি নিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে আসতো ধুলোয় বসে গাইতো—

মা ওমা জগতের মা সবার মা হয়ে কি আমার মায়া ভুলেচো

—এই টুকখানি মনে আছে আর মনে নেই।

—তারপর ! দাদাভাই আমার চোখে কি একটা পড়লো !

—কচলিওনা লাল হয়ে যাবে।—মন্তর মন্তর চোখ জ্বলার মন্তর জল পড়ার মন্তর যাঃ ফুঃ উড়ে যা, দেখ দেখি আর চোখ জ্বলছে ?

—না, মা আসচেনা কেন দাদাভাই ?

—এই আসেন আর কি, আচ্ছা সেই যে ভিখিরিটা বসে গাইলে তার নামটি কি ছিল বলতো দিদি ?

—কেন জগত্ !

—তুমি ত দেখনি তাকে কেমন করে জানলে তার নাম ?

—গানের মধ্যে রয়েছে যে জগতের মা। পূজো বাড়ীতে খেয়ে মা বাবা দুলালী বসে রইলেন আসবার নামটি নেই ! নিশ্চয় মা গল্প জুড়ে দিয়েছেন, বুঝেছো দাদু ?

—গেছে তো খানিক বসে গল্প করবেনা, থাকনা আসবে যখন খুসি।

—শুনলে কাবুলীভাই তোমার দাদুর কথাটা শুনলে।

—যখন খুসী আসবেন আমরা না খেয়ে বসে থাকি, বাদশাদাদাও নেই

—সে তার মামার বাড়ী যাবেনা ;

—আমি তাই বুঝি বলছি, দাদু কি বলেন তার ঠিক নেই দাদাভাই তুমি এর বিচার করো--

—আচ্ছা তুমি কি বলছো শুনি কাবুলীদিদি—তবে এর বিচার !

—আমি বলছি এতক্ষণ ধরে গাড়ী বসিয়ে রেখেছেন কত তেল পুড়ছে বল।

—তা পুড়েছে বইকি।

—তবে ? যদি আসবার সময় তেল ফুরিয়ে যায় ?

—ফুরিয়ে যায় যাবে তোর তাতে কি লা ?

—আঃ থামোনা দাদু, আমি এক বলছি দাদু আর এক বলছেন আমাকে বলতে দাও

—দাদু কি বুঝবে তুমি চুপি চুপি বলো তোমার মনের কথা

—শোনো, বুঝলে তো—

—ঠিক বুঝেছি

—দাদুকে বুঝিয়ে দাও !

—বুঝলে তো বোঝাবো—পূজোর দিন টেক্সি পাওয়া শক্ত, মিশিরের গাড়ীও চলবেনা—বাবা মা দুলালী রিস্‌ক ডেকে সোজা বাড়ী যাবে ; এইতো তোমাব ভাবনা কাবুলীদিদি ?

—তিনজনের বেশী চাপলে রিস্‌ক ভেঙে পড়বে কি দাদাভাই ?

—রিস্‌ক ভাঙতে না পারে রিস্‌কওয়ালার কোমর ভেঙে যাবে, এতো মিশির ড্রাইভার নয় ?

—যায় যাবে, তুই এইখেনে থেকে যাবি লুচী খেয়ে

—আরে না না, এই দেখ আবার কি চোখে পড়লো—যাঃ ফুঃ সেরে যাঃ গেছে তো ?

—গেছে একটু একটু আছে !

কোথায় গেছেন পূজো দেখতে বাবা মা—বলে ফেলো ও কাবুলীদিদি, জেনে রাখি

—বাবার মায়ের মামার বাড়ী

—তাহলে ভয় নেই তেলকলঘাট কাছেই।

—ভাবিস্ কেন আজ ষষ্টি, আসতেই হবে তোর মাকে বাপের বাড়ী

—এইবার পাকা কথা বলেছেন তোমার দাদু,—চন্দর সুয্যি উল্‌টে যেতে পারে কিন্তু পাঁজীতে যা লিখেছে কেউ উল্‌টাতে পারবেনা,—আসতেই হবে

—এলো বলে দেখ্‌না লা

—ঘর্ঘর করে কিসের শব্দ হচ্ছে ?

—ও ইসক্রীম কল ঘোরাচ্ছে রাধু

—তাহলে এখনো রাত হয়নি—তুমি ছড়া বলো দাদাভাই, আমি শিখে নিই—

—সব ছড়া মনে নেই

—একটু একটু বলোনা আমি জুড়ে জাড়ে নেবো বাড়ী গিয়ে—

—ছড়া কই তবে ঃ

গোরচাঁদের মেলায় যাবো মেলায় গেলে হেলায় পাবো ; দয়াল নিতাই দয়া করে
খেতে দেবে পেট ভরে
গোণ্ডা মিঠাই যা চাই পাবো
গোরা বাজারের বুড়া কর্ত্তা খায় এককুড়ি বেগুন ভর্ত্তা
গিন্নিটি তার পেঁচা চিল্লি পাঁঠা চাই তার হপ্তা হপ্তা
খেয়েছে শতাবধি পাঁঠার মুড়ো একটি ফেলেনি হাড়ের গুঁড়ো, সেখানে কেনো যাবো !
পাতড়া চাটতে অক্কা পাবো ! গোরাচাঁদের মেলায় যাবো
বলে ঠোঁটকাটা মুটে সকালে উঠে—খেংরাপটির নোংরা গলিতে আর কি রবো

—দাদাভাই আমাদের পাড়ায় গোরাচাঁদের মেলা হয়, কোনদিন তো ঠোঁটকাটা মুটেকে দেখিনি

—রোসো সে আগে তার খেংরাপটির বাসাভাড়া চুকোক, রাধুকে আজও সকালে ধরেছিল—আমি যদি তার বাসাভাড়াটা দিয়ে দিই

—তুমি দিয়েছ নাকি দাদাভাই ?

—দিয়েছি তো !

—তবেই হয়েছে, সে ঠোঁটকাটা এখন কত্তাগিন্নির মত তোমার নাম ছড়া বেঁধে ফেলেছে

—আমি রাধুকে বলে দিয়েছি ঝাঁকাভরে মাটির পুতুল মুর্গিহাটা থেকে পৌছে দেবে তবে পাবে পয়সা ।

—না হলে থাকো খেংরাপটীতে ! বেশ বুদ্ধি করেছো দাদাভাই !

—একি আমার বুদ্ধি বাদশাবাবুর বুদ্ধি !

—তুমি হলে হয়তো বলতে আহা গরীব দিয়ে দে ক'টা পয়সা

—তাহলে কি হতো ?

—পয়সা নিয়েই সরে পড়তো মুটে, পুতুলও আসতো না মুটেও আসতো না

—এখনো তো এলোনা কে জানে রাধাকান্ত কি করে বসে আছেন, দেখিতো—

—আবার অন্ধকারে যায় মেয়েটা

—না দাদু, বারাণ্ডা থেকে দেখছি, রাধাকান্তো—

—কি বলচো ?

—ঠোঁটকাটা ঝাঁকা মুটে এয়েচে ?

— না পাওয়া গেলনা

—পুতুল এলোনা! আঃ জবাব দেয়না? এলোনা দাদাভাই! এই যে এগুলো কি?

—রোস্ ভেঙে যাবে!

—এই দাদাভাইয়ের টেবিলে রাখলেই হতো

—এটা কে নেবে, এটা কে নেবে, এটি বাপু হুলালী নেবে, এটি বাদশা নেবে, এটি আমি ......

—হিহি দাদাভাই, দাতু কি করচেন দেখ, এমন হাসি পাচ্ছে আমার!

—আচ্ছা দেখা যাক পুতুলগুলোর দাম কত

—রাধাকান্ত এদিকে আনো এই টেবিলে, দেখো পড়ে না যায়! দাদাভাইকে ফর্দ্দটা দাও।

—'দাদাভাই চালভাজা খাই ময়না মাছের মুড়ো'—এপুতুলটা কি দাদাভাই?

—এ সেই খেংরাপটির বাড়ীওউলী, দেখচোনা ঝাঁটা হাতে...

—ঠোঁটকাটা এখানে নেই, তুই যাঃ আমাদের ঘর ঝাঁটাবার লোক আছে

—ওটা তুই নিবিনে তো রাখ রাধুর কাছে

—থাকনা, আগে কোন্‌টা কি বুঝে দেখি দাতু!

—কাবুলীদিদি, এটি যে দেখছি কর্ত্তা বেগুন ভর্ত্তা

—ও আমি চাইনে রাধুর কাছে থাক্ হুলালী নেবে এলে

—এযে দেখি জীভ বার করে মেমাচ্চে কচি পাঁঠার মুড়ো

—বুঝেচো দাদাভাই ও সেই গিন্নির, আমি নিচ্চিনে

—রেঁধে খেয়ে ফেলাবে

—আর মাগো দেখলে ঘেন্না করে ও আবার খাবে! একরকমের নাটপুতুল তুটি আনলে কেন রাধাকান্তো।

—ও জোড়া ছাড়া বিকোয় না নিতাইগৌর

—ঠিক হয়েছে, এহুটি রাখতে হবে দাদাভাই, গোরাচাঁদ দয়াল নিতাই ভুলে গেলুম যে ছড়াটা।

—এটি কে নেবে কাগজে মোড়া?

—ঐ দেখ দাতু একটা পুতুল লুকিয়ে রেখেছেন

—বোধ হয় মুড়ির ঠোঙা

—না পুতুল, আঃ হাতে দাওনা একবার টিপে দেখি

এ সেই খেংরাপটীর বাড়ীওলী

—তা হবে না, ঐ তুলালী মা বাবা সবাই এসে গেল ...

—বাদশা দাদা মামিমা রোসো দাত্ব একটু থির হয়ে বলছি, ভেবে নিই, ভেবে পাইনে যে দাদাভাই—

—আচ্ছা স্মরণ কর দেখি, সেই দোরে দোরে কেঁদে বেড়াচ্ছে

—ঠোঁটকাটা নাকি ?

—না সেতো আসেনি রাধু বলে তবে ! মনে পড়ছে

—বুক ঠুকে বলে ফেল তার নাম

—জগৎ ভিখিরী

—কাগজ খুলে দেখ্‌না লা শিবঠাকুর

—দাদাভাই তুমি ভেবেছিলে মুড়ি

—তাইতো ষষ্টির দিনটাতে কেবল আমি-ই ঠকলেম না, বাদশাবাবুও ঠকলেন, গল্প শুনতে না পেয়ে এতেই খুসি !

তালপাতার সেপাই

শ্রীসুকুমার দে সরকার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ছেলে নকীবের প্রবেশ।

এই যে মহারাজ এই যে—

রাজা খাজার পাত্র হাতে নিলেন। একটা খাজায় কামড় দিয়ে—

রাজা। যা তোরা সভাসদদের খবর দে এখুনি সভা বসাতে হবে। রাজকন্যেকে এখুনি উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

নকীবরা। যো হুকুম মহারাজ

রাণী। খালি খাওয়া খালি খাওয়া, তাও আবার এত জিনিষ থাকতে খাজা

রাজা। খাজা খাবনা ত রাজা হয়েছি কেন?

সভাসদদের প্রবেশ।

সভাসদগণ। মহারাজের জয় হোক

রাণী। জয়? কিসের জয়? দৈত্যরাজ রাজকন্যেকে ধরে নিয়ে গেল, লড়াইয়ের নাম নেই, একটা তরোয়াল উঁচু করা হোলনা, খামোখা জয় হোক।

রাজা। হ্যাঁ দেখ সেনাপতি, আজই রাজকন্যেকে উদ্ধার করে আন।

সেনাপতি। ওরে বাবা দৈত্যরাজ হুহুঙ্কারের সঙ্গে কে লড়াই করবে?

রাজা। কেন তুমি?

সেনাপতি। ওরে বাবা হুঙ্কার শুনেই আমি মারা যাব

রাজা। তবে কোটাল

কোটাল। ওরে বাবা আমি নয়

রাজা। তবে কে?

কোটাল, সেনাঃ। (একসঙ্গে) ওই প্রহরী

প্রহরী। (কাঁপতে কাঁপতে) হাতী ঘোড়া গেল তল
মশা বলে কত জল?

রাজা। তা হলে?

সকলে। মহারাজ আপনি থাকতে আমরা ?

রাজা। (খাজায় কামড় দিয়ে) না না ওরে বাব্বা !

রাজদূতের প্রবেশ।

রাজদূত। মহারাজ

রাজা। কেন দূত ?

রাজদূত। তুজন সেপাই এসেছে বাইরে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রাজা। নিয়ে এস।

রাজদূতের সঙ্গে লালকমল আর তালপাতার সেপাইয়ের প্রবেশ। তুজনেরই হাতে তলোয়ার। তালপাতার সেপাইয়ের কোমরে ভেঁপু ঝুলছে

সেপাই। জয় হোক মহারাজ !

রাজা। কি চাও তোমরা ?

সেপাই লালকমল। (একসঙ্গে) লড়াই—

রাজা। লড়াই ? ওরে বাবা, ও রাণী এরা যে লড়াই চায়। কি করি কোথায় লুকুই ?

তালপাতার সেপাই। না মহারাজ আপনার সঙ্গে নয়

রাজা। (স্বস্তির নিঃশেষ ফেলে) অ্যাঁ আমার সঙ্গে নয় ? বেশ বেশ লক্ষ্মী সেপাই, তবে কার সঙ্গে ?

সেপাই। দত্যিদের সঙ্গে

রাজা। দত্যিদের সঙ্গে ? হুহুঙ্কারের সঙ্গে ?

সেপাই। হ্যাঁ মহারাজ

রাজা। (সভাসদদের পানে ফিরে) হোঃ হোঃ বুজেছ, হোঃ হোঃ দত্যিরাজ হুহুঙ্কারের সঙ্গে লড়াই চায় বুঝেছ ?

সেনাপতি। হাঃ হাঃ হুঙ্কারে হুহু করে মরে যাবে

সেপাই। হুঙ্কারে করি না ভয়

রাজা। তালপাতার সেপাই ফুঁয়ে উড়ে যাবে

সেপাই। ফুয়ে ফুয়ে উড়ি
বাতাস ঘোড়ায় চড়ি

রাণী। সত্যি তোমরা দত্যিরাজের সঙ্গে লড়বে ? রাজকন্যেকে উদ্ধার করে আনবে ?

সেপাই। আনব মহারাণী

রাণী। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমরা দত্যিপুরী জয় করে ফিরে এস।

সেপাই। কিন্তু রাজা আমাদের পুরস্কার?

রাজা। (খাজা খেতে খেতে) পুরস্কার অর্দ্ধেক খাজাত্ব আর খাজকন্যে।

লালকমল। খাজকন্যে? খাজকন্যে কি?

রাজা। খাজকন্যে না বললে মেলেনা যে। খাজকন্যে মানে রাজকন্যে

সেপাই। আর খাজাত্ব মানে কি রাজত্ব নাকি? রাজত্ব টাজত্ব চাইনে বাপু, ও বড় হেঙ্গাম।

রাজা। না না অর্দ্ধেক খাজাত্ব মানে আধখানা খাজা।

সেপাই। আধখানা খাজা
খেতে বড় মজা
রাণী মোরা কক্ষণ-না রাজা

আচ্ছা মহারাজ চললাম। রাজকন্যেকে উদ্ধার করে তবে ফিরব। চল লালকমল।

রাণী। জয় তালপাতার সেপাইয়ের জয়।

সভাসদেরা। জয় অর্দ্ধেক খাজাত্বের রাজার জয়।

চলে গেল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সামনে দিগন্তজোড়া ধু ধু মাঠের বাঁ দিকে পাহাড়। পাহাড়ের নীচেই তিনটি গুহা। মাঠ চিরে রাঙামাটির লালপথ, সূর্য্য যেখানে অস্ত যায়, সেখানে গিয়ে হারিয়ে গেছে। কক্ষণ-না রাজার দেশ ছাড়িয়ে দত্যিপুরীর ওপর সূর্য্যাস্তের আকাশ যেন রেগে লাল হয়ে গন্ গন্ করছে। মাঠের ওপর ঘূর্ণি হাওয়া সোঁ সোঁ করে এসে সবেগে খড় কুটো পাতা আকাশে তুলে পাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে আবার নেমে এসে পাগলা মোষের মত নিঃশ্বাস ফেলতে গুহা তিনটির পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমে একটা মেঘের দলা কালো বাঘের মত থাবা উঁচিয়ে আছে।

গুহা তিনটের থেকে তিনটে বুড়ি বেরিয়ে এল। তাদের মুখের চামড়া লোল হয়ে ঝুলে পড়েছে। কোটরে বসা চোখ জ্বলছে ভাঁটার মত। খাঁড়ার মত নাক, মাথায় শণের মত পাকা চুল। পরণে রাতের মত অন্ধকার কালো কাপড়। বুড়ি তিনটে গুহার বাইরে এসে সার হয়ে দাঁড়াল, তারপরে চোখের ওপর হাতের ছাউনি দিয়ে একদৃষ্টে মাঠের পারে তাকাল।

প্রথম। তেপান্তরের মাঠে আজ বীরবাতাস উঠেছে

দ্বিতীয়। আকাশে বিষ কালো মেঘের থাবা!

তৃতীয়। আর বাতাসে ঘুরে ঘুরে কার যেন কান্না ভেসে আসছে। বদ্ধজলার ওপার থেকে আলেয়া উঠছে নেচে নেচে। ডাইনি পাহাড়ের ভেতর থেকে আহত পৃথিবীর গোঙানির গর্জ্জন কেঁপে কেঁপে ঠেলে উঠছে। কে যেন আসছে, কে যেন দিগন্ত কাঁপিয়ে অট্টহাসি হেসে, বিদ্যুতের তলোয়ার ঝলসে ছুটে আসছে। চারিদিকে কি যেন অমঙ্গলের সূচনা আমাদের ডাইনি বুকও থেকে থেকে ভয়ে চমকে উঠছে।

দূরে ভেঁপুর আওয়াজ

ওকি? ওকি ও? ও কা'র ভেঁপুর আওয়াজ? এ পথে কে আসে?

হাতে তরোয়াল খোলা তালপাতার সেপাই আর লালকমলের প্রবেশ।

তরোয়ালে আজ ঝলক উঠেছে বিদ্যুৎ খান খান
পথের পাথর আথাল পাথাল শত্রুরা সাবধান

মানুষ? দত্যিপুরীর পথে পা বাড়িয়েছে ভয় নেই?

সেপাই। তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।

লালকমল। ও ভাই সেপাই ওখানে কারা?

সেপাই। এই ও তোমরা কে?

বুড়িরা। আমরা ডাইনি পাহাড়ের ডাইনি বুড়ি। আদ্যিকালের আদ্যি থেকে খড়ি পেতে বসে পৃথিবীর বয়স আমরা হিসেব করি। তা তোমরা কারা বাছা চলেছ কোথায়?

সেপাই। আমরা চলেছি দৈত্যপুরে। দৈত্যরাজ হুহুঙ্কারের অত্যাচারে পৃথিবীর বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। দৈত্যরাজের সাথে আমরা লড়াই করব।

বুড়িরা। খবরদার খবরদার ওপথে যেও না। ওই দেখ দৈত্যপুরের পাহাড়ের মাথায় আজ আগুন জ্বলেছে, ওই দেখ আকাশে কালপুরুষের কালো মুখ জ্বল জ্বল। শুধু শুধু প্রাণ খোয়াবে? শুনছ না কালপেঁচার ডাক? আর ওই শ্মশানে, থেকে থেকে মরাকুকুর আকাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে চেঁচিয়ে উঠছে? ভয় নেই তোমাদের, প্রাণের মায়া নেই?

সেপাই। না, আমাদের ভয় নেই, আমাদের ভাবনা নেই, পায়ের নীচে পথ আমাদের ডাকছে, আমরা দুরন্ত হাওয়া।

বুড়িরা। কিন্তু ওই যে দেখছ বীরবাতাস, ওকে ঠেলে তোমরা যাবে কি করে?

সেপাই।

আমরা ফুয়ে ফুয়ে উড়ি
বীর বাতাসে চড়ি
আমরা জীবন করেছি জয়
মরণে নেইক ভয়।

চল লালকমল

লালকমল। চল

চলে গেল।

১ম বুড়ি। যাক যাক যাক, হয়ে যাক। চল বোন আমরা ঘরে যাই। ঘরছাড়াদের পথে চেয়ে থাকলেও আমাদের চলে না। আকাশে রাতের কালো ওড়না উড়েছে আমাদের তারা গোণবার সময় হোল। বিধাতা পুরুষের অলক্ষ্য হাসি বেয়ে যে সব দুষ্টু তারা ঝরে পড়বে পৃথিবীর বুকে, তাদের আবার কুড়িয়ে রাখতে হবে। ওই যে ওই একটা নীল তারা খসে পড়ল। চল বোন চল।

সকলে। চল চল চল!

দ্বিতীয় দৃশ্য

লালপথ প্রকাণ্ড এক পাহাড়ের বুকে এসে রুখে গেছে। পাহাড়ের মাঝখানে প্রকাণ্ড লোহার দরজা। দরজার সামনে লালকমল আর তালপাতার সেপাই।

সেপাই। এসে গেছি লালকমল এসে গেছি। এই যে দত্যিপুরীর ফটক

লালকমল। কিন্তু ফটক যে বন্ধ

সেপাই। তৈরী হয়ে দাঁড়াও, এখুনি ফটক খুলে যাবে দত্যিরাজ হুহুঙ্কারে এখুনি আসবে ছুটে।

সেপাই ভেঁপুতে ফু দিল

পাহাড়ের ভেতরে একসঙ্গে যেন কাড়া নাকাড়া বেজে উঠল। একটা প্রচণ্ড হুহুঙ্কারে পাহাড় উঠল কেঁপে।

সেপাই। ওই এল এল—

লোহার ফটক সশব্দে খুলে গেল। তার ভেতর দিয়ে বিরাট চেহারা, ভয়ঙ্কর আকৃতি দৈত্যরাজ গর্জ্জন করতে করতে বেরিয়ে এল!

দৈত্যরাজ। কেরে দৈত্যপুরীর ডঙ্কাতে ঘা দেয়? কার এত সাহস? তোরা কেরে ছোঁড়া?

দুজনে। আমরা তোমার যম!

দৈত্যরাজ। যম? যম? ঘাড়ে কটা মাথা?

সেপাই। একটা

দৈত্যরাজ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তুই কে?

সেপাই। আমি তালপাতার সেপাই

দৈত্যরাজ। তোকে ত ফুয়ে উড়িয়ে দেব। আর তুই?

লালকমল। আমি লালকমল

দৈত্যরাজ। কি চাই তোর?

লালকমল। লড়াই

দৈত্যরাজ। বটে? আজ লড়াইয়ের সখ দিচ্ছি মিটিয়ে, বার কর তরোয়াল।

তালপাতার সেপাই তরোয়াল হাতে ছুটে এল। কিন্তু দৈত্যরাজের বিরাট এক ফুঁয়ে সে সাতহাত দূরে গিয়ে ঠপ করে পড়ল।

সেপাই। ওরে বাবা

তখন লালকমল আর দৈত্যরাজের তরোয়ালে তরোয়ালে ঠোকাঠুকি চলেছে।

সেপাই। সাবাস লালকমল! সাবাস সাবাস! দৈত্যরাজের পড়ন্ত তরোয়াল লালকমল তার মাথার ওপর রুখল। তারপরে দৈত্যরাজের হাতে এক খোঁচা

দৈত্যরাজ। উহু গেছি গেছি

সেপাই আবার উঠে তরোয়াল উচিয়ে ছুটে এল আর আবার দৈত্যরাজের ফুঁয়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল, আবার লালকমলের সঙ্গে লড়াই চলতে লাগল।

লালকমল। সেপাই সেপাই আমি আর পারছি না, আমার হাত অবশ হয়ে আসছে।

দৈত্যরাজ হেসে উঠল

সেপাই। ভয় নেই লালকমল তুমি আমার পেছন থেকে ঠেলে থাক দেখি, যেন উড়ে না যাই।

সেপাই উঠে এল লালকমলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লালকমল দুহাতে তাকে ঠেলে রইল।

সেপাই। সামাল হুহুঙ্কার

দৈত্যরাজ। (চীৎকার) উঃ!

সশব্দে পতন আর মৃত্যু

সেপাই। ব্যস্ দৈত্যরাজ হুহুঙ্কারের হুঙ্কারে আর পৃথিবীকে কোনদিন ভয় পেতে হবে না

লালকমল। কিন্তু রাজকন্যে ?

সেপাই। চল যাই দৈত্যপুরে, দেখি কোথায় আছে সে রাজকন্যে!

ফটকের ভিতর দিয়ে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মস্ত এক বাগান। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বাগানের একপাশে একটা কুঁড়ে ঘর। ঘরে রাজকন্যে ঘুমুচ্ছে। দূরে ভেঁপুর আওয়াজ।

রাজকন্যে। (চমকে জেগে) কে? কে? কে আসছে এ পথে? আমার বড্ড ভয় করছে। আমি ছেলে মানুষ এত বড় বাগান পাহারা দিতে আমার বড্ড ভয় করে। আমার মার জন্যে মন কেমন করে কিন্তু কেউ সে কথা শুনবে না, বুঝবে না। তাই ফুলেদের আমি আমার দুঃখের কথা শোনাই। ওরা তবুও বোঝে, বুঝে ঘাড় নাড়ে।

খোলা তরোয়াল হাতে সেপাই আর লালকমলের প্রবেশ

সেপাই। তফাৎ যাও, তফাৎ যাও—

তরোয়ালে আজ ঝলক উঠেছে বিদ্যুৎ খান খান
পথের পাথর আথাল পাথাল শত্রুরা সাবধান

রাজকন্যে। না না আমায় মেরোনা, আমায় মেরোনা।

সেপাই। তুমি কে গো?

রাজকন্যে। আমি রাজকন্যে। দত্যিরাজ আমায় ধরে এনে এই বাগানের মালিনী করে রেখেচে। আমার মার কাছে যাবার জন্যে এখন মন কেমন করে।

লালকমল। আর তোমার ভয় নেই রাজকন্যে। দৈত্যরাজকে আমরা মেরে ফেলেছি।

রাজকন্যে। সত্যি? তুমি বুঝি রাজপুত্তুর, সাতসমুদ্দর তেরো নদী পার হয়ে এসেছ?

সেপাই। এই দেখ যা বলেছিলুম। দেখা হতে না হতেই রাজপুত্তুরের বায়না। না বাপু ও রাজকন্যে টন্যে আমার চাইনা। লালকমল, ও রাজকন্যে নিতে হয়ত তুমি নিও। আমার আধখানা খাজাই ভাল, সারা জীবন ধরে আর খাওয়ার ভাবনা থাকবে না।

লালকমল। না রাজকন্যে, আমি রাজপুত্তুর নই, আমি গরীবের ছেলে কুঁড়ে ঘরে থাকি, তবে আমার কিছু অভাব নেই। একটি অভাব ছিল খেলার সাথীর, সে অভাবও এখন এই তালপাতার সেপাই মিটিয়েছে।

রাজকন্যে। তোমার আল্লাদী পুতুল আছে ?

লাল। না

রাজকন্যে। তোমার পুঁতীর মালা আছে ?

লাল। না

সেপাই। দেখেছ দেখেছ সুরু হয়েছে বায়না

লাল। না রাজকন্যে, আমার কিছু নেই, আছে শুধু এই তালপাতার সেপাই।

রাজকন্যে। তালপাতার সেপাইত ভারী !

সেপাই। ভারী নয়, ভারী নয় হাল্কা।

ফুয়ে ফুয়ে উড়ি
বাতাস ঘোড়ায় চড়ি।

রাজকন্যে। (লালকমলকে) তোমার নাম কি ভাই ?

লাল। আমার নাম লালকমল

রাজকন্যে। আচ্ছা লালকমল, তুমি আমাদের রাজ্যে চল, তোমায় কত খেলনা দেব, তারপরে একদিন তুমি রাজা হবে। যাবে ?

সেপাই। যাও লালকমল তুমি রাজা হওগে, আমার জন্যে দখিন থেকে মলয় ঘোড়া ছুটে আসছে আমি যাই।

লাল। না না, আমি রাজা হতে চাইনা, আমি আমার মাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে চাই না।

সেপাই। বেশ তবে চল।

রাজকন্যে। আমিও মার কাছে যাব

সেপাই। সেই ভালো। চল তোমায় পৌঁছে দিয়ে রাজার কাছ থেকে অর্দ্ধেক খাজাত্ব নিয়ে আমরা রওনা হই।

লাল। চল, চল

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

লালকমলের ঘর বিছানায় তেমনি মশারী ফেলা। ঘরের প্রদীপ নিভানো। লালকমল আর সেপাইয়ের প্রবেশ। সেপাইয়ের হাতে আধখানা খাজা।

লালকমল। আঃ কতপথ ঘুরে, কত পরিশ্রমের পর এই ঘরটি আমার কি মিষ্টি

সেপাই। (খাজায় কামড় দিয়ে) ঠিক এই খাজার মত। আমার মিষ্টি খাজা লাভ, তোমার মিষ্টি ঘর লাভ।

লাল। ঘর ত আমার ছিলই

সেপাই। কিন্তু ঘর ত তখন মিষ্টি ছিল না। ঘর ছেড়ে বেরোলে কি ঘর মিষ্টি হয়?

লাল। (হাই তুলে) সেপাই আমার ঘুম পাচ্ছে

সেপাই। যাও তুমি শুয়ে পড়—

লাল বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। জানলা দিয়ে বকুল গন্ধের সঙ্গে চাঁদের আলো আসছে। সেপাই সুর করে বলতে লাগল।

মায়াকাজল মায়াকাজল লালকমলের চোখে
ফুলের পানে তারার মালা মিটমিটিয়ে দেখে
লক্ষ তারার জ্বলে সেই যে দেশে ভাই
হাওয়ার পিঠে ওপর নীচে সেথায় আমি যাই
ওপর নীচে ওপর নীচে ফুলের রেণু মেখে
দোলন চাঁপায় দোলায় দোলায় চিহ্নখানি রেখে
চাঁদের আলোর হাল্কা চাদর যেথায় ওড়ে ভাই
হাওয়ার পিঠে মেঘের ভেলায় সেথাই আমি যাই।

ঘুমোও, লালকমল ঘুমোও। আমি আসি। এই যে হলুদ পুকুরের পাড়ে একানড়ে তালগাছ হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে, আমি যাই আমি যাই। ধনুকছাড়া তীরে মত আমি যাই।

(সেপাই যে জানলা দিয়ে এসেছিল সেইপথে বেরিয়ে গেল)

্যাটা
।, না, ক্যা
ছ।”

লালকমল। (হঠাৎ জেগে) একি একি? সেপাই কোথা গেল! একি স্বপ্ন মা মা!

লালের মা ছুটে এলেন

মা। কি, কি হয়েছে লাল?

লাল। মা আমি আশ্চর্য্য এক স্বপন দেখেছি।

মা। ঘুমো ঘুমো লাল, এখনও রাত অনেক। প্রদীপটা আমি জ্বালি।

লালের মা প্রদীপ জ্বাললেন

লাল। মা, তুমি আমার কাছে বোস না

মা। এই যে বাবা—

মশারীর ভেতর গিয়ে বসলেন

ঘুমো এবার ঘুমো। আমি গান গাইছি শোন।

লালকমলের মায়ের মৃদুস্বরে গান। মশারীর ভেতর থেকে আবছা অস্পষ্ট চেহারা। গানের শেষের দিকে ধীরে ধীরে যবনিকা।

গান

নীল আকাশে চাঁদের হাসি
সাদা মেঘের খেলা
ছায়া পথে ভেসেছে মোর
স্বপন পুরীর ভেলা।
বেলা যে আজ পড়ে এল
পথ হোল চঞ্চল,
যাত্রী ওরে রাত্রি আসে
আগেই ছুটে চল!
ছায়াপথে পথ হারাল
দিক্‌ভোলাদের দল,
অশ্রুজলেই মুছে গেল
চোখেরই কাজল,
আঁখি তাদের মুছে নিতে
আমাদের এই ভেলা;
আয়রে পাগল আয় ক্ষ্যাপাদল
এল যাবার বেলা

ওলটু বাঘ

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

পুরী সহরে কয়দিন ভীষণ চাঞ্চল্য দেখা গেল। সন্ধ্যা না হতে হতেই সমুদ্র তটের যেদিকটায় বাসস্থানগুলি বিরল হয়ে এসেছে, লোকালয়গুলি দূরে দূরে, সেই দিকে লোক চলাচল একদম বন্ধ। রাত দশটা বাজতে না বাজতে সহরের দোকান পাট বন্ধ, যারা খোলা বারান্দায় শুয়ে রাত কাটাতো, তারা ঘরে খিল দিয়ে শোয়, জানালার কাছে খাট টেনে কেউ শুতে চায় না। আমাদের মালী, তার বৌ, আর আমাদের বুড়ী ঝি এরা তো সন্ধ্যের দিকে কাজ করতেই এলনা দু'দিন। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে রে? আসিস্ না কেন রাতে?" বুড়ী ঝিটা চোখ কপালে তুলে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লে, "আলো দিদি, একটা বড়ো বাঘ-অ আউছি।" অমনি মালীও চোখ গোল গোল করে বল্লে, "হঁা দিদি গোটে মনুষ্য আর ছিটা গাউ খাই সারি লানি।" আমাদের এখানকার নতুন দিদি অমনি তাঁর কুকুর ছানা টিকে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে বল্লেন, "এই খানে বসে থাক্, খবরদার বেরোবিনি— বাঘ এসেছে।" কুকুর তো মহানন্দে লেজ নাড়তে সুরু করলেন, যেন বাঘ আসা ব্যাপারটা খুবই আমোদজনক। চারিদিকে রব উঠল—"বাঘ" "বাঘ"! সেই দিন সন্ধ্যাবেলা এক পাল নরুকে দৌড়ে বাড়ীর দিকে আসতে দেখে তো আমাদের চাকর হুঁকো ফেলে দে ছুট একেবারে সামনের স্কুল বাড়ীর লাইব্রেরী ঘরে, সেখানে গিয়ে দরজা এঁটে সে বসে পড়ল। আর মোটর ক্লিনারটা বাইরে হল ঘরে কাঁউ মাঁউ সুরু করল।

তার পরদিন পাশের বাড়ীর মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় হুড়মুড় করে ছুটে এলো আমাদের আশ্রমে। তাদের ভীত চকিত মুখ দেখে সবাই ত্রস্ত ব্যস্ত—"কি হয়েছে? কি হয়েছে?" তাদের মা ছিলেন আশ্রমে, সন্ধ্যাবেলার স্তবে যোগ দেবেন বলে। মেয়েরা বল্লে, "ওমা, বড় ভয় করছে,শীগগির বাড়ী এসো, কেউ ডাকছে।" আর কি! আশ্রমের কয়েকটী মেয়ে চোখ পর্য্যন্ত খুল্‌তে চায় না। যেন তারা চোখ না খুল্‌লে বাঘ আর বার হবে না কি আসবে না।

সকাল বেলা বুড়ী ঝিটা এসে বল্‌ছে কি—"দিদিমণি কাল 'ফেউ' শুনেছিলে?" আমি বল্লাম, "শেয়াল তো রোজই চেঁচায়—কালও চেঁচিয়েছিল, তবে 'ফেউ' ডেকেছিল কি এমনি 'ক্যা হুয়া'বলেছিল তা বাপু আমি মন দিয়ে শুনি নি।" ও তখন হাতের ঝাঁটা গাছটা না মেঝেয় ফেলে বেশ আরাম করে পা মুড়ে মেঝেয় বসল, তার পর বল্ল, "না, না, ক্যা হুয়া বলে নি, বাঘের পিছনে 'ফেউ' হয়েই লেগেছিল। আমার ছেলে দেখেছে।"

"তাকে বাঘে খেল না ?

"না, দিদিমণি, ঠাট্টা নয়। ও বাঘটা যে ওলটু বাঘ, ওলটু বাঘ জান না তো ? (আমি সত্যি ওলটু পালটু কোনই বাঘ জানি না, তোমরা তাদের চেন কি ?) ঐ বাঘ দিনের বেলা মানুষ হয়, আর রাতে দশটার পর বাঘ হয়ে যায়। এখন আমার ছেলে কাল রাত ৯টার পর বাজার থেকে সওদা কিনে আস্‌ছে বাঘটাও তখন বাজারে গিয়েছে, সেও ছেলের সঙ্গে ফির্‌ছে। স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি এসে বাঘ-মানুষটা সমুদ্রের ধার ধর্‌ল। আমায় ছেলেও তো ঐ পথ দিয়ে আসে, বাড়ীটা কাছে হয় কি না ?—ছেলেতো একটা বিশ্রী গন্ধ পাচ্ছে—ঐ মানুষটার গা থেকে বার হচ্ছে। কিছু দূর যেতে যেতেই মানুষটা কেমন মাথা ছুলিয়ে চলতে আরম্ভ করল। ছেলের তো ভয় ভয় কর্‌তে লাগল—ও ছুট্রে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী এসে পৌছালো। তারপর আমরা জান্‌লা দিয়ে দেখি কি, লোকটা কেমন কেমন করে চল্‌ছে, সামনে হাত ছুটো ঝুলে পড়েছে, গাটা ঝুঁকে পড়েছে, আর মাথা চালাচ্ছে। এমন সময় ও বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজ্‌লো আর অমনি মানুষটা বাঘ হয়ে দে ছুট। সে কি যেমন তেমন বাঘ ! রাজার ছোট হাতীটার মত মস্ত এক বাঘ। জান, রাজা মারতে গিয়ে ফিরে এসেছে। ওঃ বাবা, ওলটু বাঘ কি মার্‌তে পারা যায় ? সে যে কোন্ ফাঁকে পালাবে তার কি কিছু ঠিক আছে ?—ও কি ! হাস্‌ছো কেন, দিদিমণি ? বিশ্বাস কর্‌ছ না—"
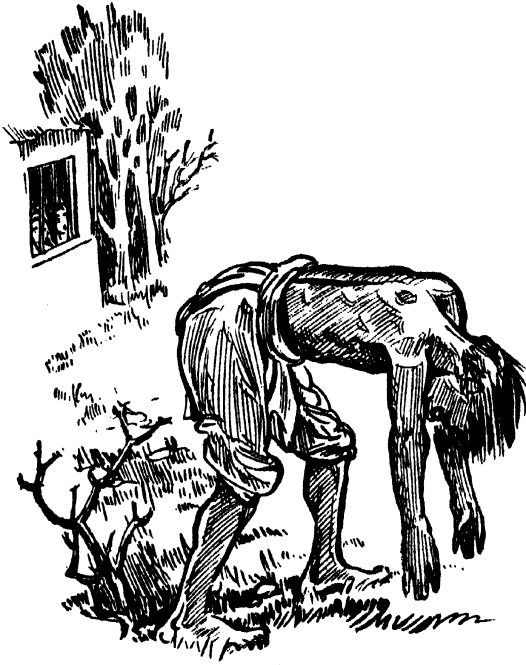
সামনে হাত ছুটো ঝুলে পড়েছে

"না না, বিশ্বাস করছি ! সব বাঘই তো পালায়, সে ওলটুই হোক্ আর পালটুই হোক্।

"না, না, ওলটু বাঘ বড্ড ফাঁকী দেয়। দিনে মানুষ রাতে বাঘ—ও ভারী চালাক হয়।"

বাঘটা নাকি বারো হাত লম্বা বৃহল্লাঙ্গুল আচার্য্য মহাশয়দের একজন। তোমাদের শীবাবু নিশ্চয়ই ওলটু বাঘ দেখেন নি ? তাঁকে একবার এদিকে পাঠাতে পার না ? তা ংমশাল কার্য্যালয়ে ওলটু বাঘের গায়ের চামড়ার 'ম্যাগ' পাতা হতে পারে।

ছন্দরবিস্তোত্র

শ্রীসতীকান্ত গুহ

'শান্তি নিকেতন' গেহে প্রকৃতি মায়ের স্নেহে
আপনি আছেন সুখে ছন্দে কথা কন,
আমরা মিলের খোঁজে এত ঘুরি লোকে বোঝে !
ক্রিটিক তবুও রুষ্ট কভু তুষ্ট নন।

করে শত ছল ছুঁতো মারেন রুলের গুঁতো
সমালোচনার ফাঁস কবিত্রাসপাশ—
লিখিয়ের বড় জ্বালা পিঠেতে তুলোর ছালা
সদা কর্ণ ঝালাপালা, ভয়ে হাসফাস।

ছাপার ভরসা নাই মাসিকে লিখিনা তাই
সম্পাদক ছুঁচো মর্ম্ম পারেনা বুঝিতে,
বলে 'মৌলিকতা নেই ভাবের বহর এই ?
মশায়ের ছন্দে হাত হবে পাকাইতে !'

মৌলিকতা হলে ল্যাঠা বলে 'ছোঁড়া বখা জ্যাঠা' !
প্রকাশ্যে বলেনি 'ব্যাটা' বলেছে গোপনে,
বয়স নয়ত বিশ সংসার হয়নি বিষ
না হলে যেতাম ভেক নিয়ে বৃন্দাবনে।

'স্বপ্রতিভা তীক্ষ্ণধার'— নেই মনে অহঙ্কার,
প্রতিভা শানায়ে তবু এনু ভীতমনে,
হবে শ্রুতি ছিন্নভিন্ন তবু না হবেন খিন্ন
এই ভরসায় ছন্দ রাখিনু চরণে।

ছন্দে রবি চলেন হেসে রঙ ছিটিয়ে,
ছন্দে রবি ফেরেন গ্রহের দলটি নিয়ে,
ছন্দে রবি নিত্য জাগান চাঁদের হাসি,
ছন্দে তো তাই জোয়ার ভাটা ; আলোর বাঁশী
ছন্দে যে তাই বাজান এবং ফোটান কমল,
ছন্দে জাগে সূর্য্যমুখী, রঙ-শতদল,
ছন্দে রবির আসর জমে ; চোখ ধাঁধিয়ে
পূবআকাশে দিলেন দেখা ঝল্‌মলিয়ে।

রবির আগে কী হাল ছিল ? ফুটতো জবা ?
তখন শুধ্ তারার আলোয় চলত সভা।
মিট মিটে ওই আব্‌ছা আলোয় আকাশতলে
ফুটত শুধু রাতের কুসুম , অলির দলে
ভিড় হোতনা এখন যেমন ; নেহাৎ যারা
ছন্দপাগল এবং খ্যাপা লক্ষ্মী-ছাড়া,
তারাই শুধু জুটত কেমন প্রাণের টানে,
হঠাৎ রবি এলেন পূবে রঙের গানে।

ছন্দরবি অনেক দেশেই ছিলেন যাঁরা,
ছন্দে উঠে ছন্দে ডুবে গেছেন তারা ;
এই জগতের সবখানেতেই তাঁদের ডেরা,
তবুও মোদের পূবের রবিই সবার সেরা।
প্রথম রবি পূবেই ছিলেন অনেকশত
তাঁদের আলোর ছন্দসুরের বাহার কত !
সব জমিয়ে এই রবি যে এলেন চলে'
তাই এ রবির চটক দেখে জগত ভোলে !

যদিও আমি নইকো গ্রহ কিম্বা তারা
যদিও বুকে নেই অতি ক্ষীণ আলোর ধারা,
ছন্দে দখল নেই এতটুক, পথ বিপথে
বেড়াই ঘুরে, তবুও আশা, ভবিষ্যতে,
রবির আলোয় হাসেন যাঁরা তাঁদের পাশে
উঠবো ফুটে জোনাই আলোয় ক্ষীণ আভাষে
ছন্দ ভেঙে ছন্দরবির গাঁথনু ছড়া,
রবির কিরণ ধার করেছি, কি আর করা !
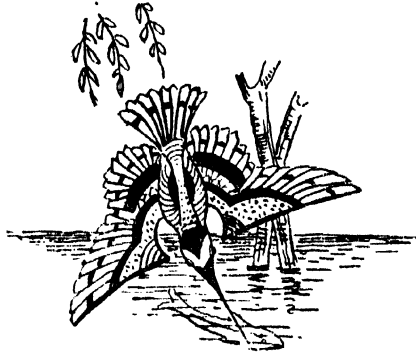
মঙ্গলগ্রহে প্রাণী

শ্রীকমলেশ রায়

মঙ্গলগ্রহ

মঙ্গলগ্রহে মানুষ আছে কিনা তাই নিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বৈজ্ঞানিক মহলে খুব হৈ-চৈ ওঠে। সূর্য্য থেকে পৃথিবী যতদূর—মঙ্গলগ্রহ তার চেয়ে একটু বেশী দূরে। মঙ্গলগ্রহকে পৃথিবীর প্রতিবেশী বলা চলে, কারণ মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী গ্রহ। পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়াও নাকি অনেকটা একপ্রকার—মঙ্গলে নাকি একটু বেশী ঠাণ্ডা এবং জল কম। আবহাওয়া ও উষ্ণতার মাত্রা বিচার করলে মনে হয়, মঙ্গলগ্রহ অনেকটা যেন পৃথিবীর মতই।

তা হ'লে সেখানে কি মানুষ, পশু-পাখী, গাছপালা থাকতে পারে না ?

আর যদি সেখানে জীবজন্তু থাকে, তবে তারা কি নতুন হয়েছে, না পৃথিবীর জীবজন্তুর অনেক আগে থেকেই সেখানে তারা আছে ?

টেলিস্কোপে দেখা গিয়েছে মঙ্গলগ্রহের গায়ের চেহারাটাও নাকি পৃথিবীর মত উবড়ো-খেবড়ো একটা শক্ত বা নরম আবরণ দেওয়া। আর চাঁদের গায়ে যেমন আমরা দেখতে পাই সাদা কালো ছায়া, তেমনি মঙ্গলগ্রহেও নাকি ঐ রকম দেখতে পাওয়া যায়। তবে চাঁদে যেমন ঠাণ্ডা—মঙ্গলগ্রহে তেমন নাকি নয়, কাজেই মঙ্গলগ্রহে জীবজন্তু, গাছপালা থাকা অসম্ভব নয়।

মঙ্গলগ্রহে পৃথিবীর মত নাকি শীত গ্রীষ্ম আছে! ফটোগ্রাফে বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়েছেন যে শীতের সময় মঙ্গলগ্রহের এক রকম চেহারা আর গ্রীষ্মের সময় আর এক রকম চেহারা। মঙ্গলগ্রহের কোন কোন অংশে দেখা গিয়েছে একসময় কালো কালো ছায়া আবার অন্য সময় সে বিশেষ অংশের চেহারা একেবারে সাদা। তাঁরা বলেন এই কালো ছায়াগুলি গাছপালার—তখন মঙ্গলগ্রহে গ্রীষ্ম ; আবার যখন তার চেহারা সাদা—তখন সেখানে শীত ; শীতে গাছপালা আর নেই। তবে, মঙ্গলগ্রহে যখন গাছপালা থাকার এরূপ সম্ভাবনা—জীবজন্তু থাকাটাও বিচিত্র কী ?

মঙ্গলগ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে—সূর্য্যের অপেক্ষা দূরে বলে হয়ত মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর আগেই ঠাণ্ডা হতে সুরু হয়েছিল। উপযুক্ত ঠাণ্ডা হলে পৃথিবীতে প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু তার

অনেক আগেই মঙ্গলগ্রহ ঠাণ্ডা হতে সুরু হয়েছিল—তাই মনে হয়, সেখানে যদি প্রাণী থাকে তারা আরো অনেক আগে জন্মেছে। তারা হয়ত আমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

আর একটা মজার কথা। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বল্‌লেন,—"আমরা দূরবীণ দিয়ে মঙ্গলগ্রহের ওপর লম্বা লম্বা খাল দেখতে পেয়েছি।" তাঁরা বলেন,—মঙ্গলগ্রহে জল কম, তাই মঙ্গলগ্রহের প্রাণীরা মঙ্গলগ্রহের মেরুপ্রদেশ থেকে মঙ্গলগ্রহের অপেক্ষাকৃত গরম অংশ পর্য্যন্ত জল সরবরাহ করার জন্য লম্বা খালগুলি খেটেছে! আশ্চর্য্য, খালগুলি সরল রেখার মতই সোজা, যেন অঙ্ক কষে এই খালগুলি কাটা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করলেন, মঙ্গলের লোকেরা খুব বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বড় ইঞ্জিনীয়ার!

এই সব মিলিয়ে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে সকলের এক অদ্ভুত ধারণা হল। হবারই কথাই! সকলে ভাবতে লাগলেন, যদি মঙ্গলগ্রহে লোক থাকে, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কেমন করে কথাবার্ত্তা বলা যায়? প্রথমে তাদের জানান দরকার যে, পৃথিবীর উপর আমরা আছি, তা হ'লে তারাও আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু কি ক'রে জানান যায় যে এখানে আমরা সভ্য, শিক্ষিত মানুষ আছি আর আমরা ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে চাচ্ছি? একজন বললেন,—সাহারা মরুভূমির ওপর আগুন দিয়ে বড় বড় করে কতকগুলি কথা লিখে দেওয়া যাক: মঙ্গলগ্রহ থেকে দূরবীণ দিয়ে দেখতে দেখতে কারো হয়ত নজর পড়তে পারে! কিন্তু মুস্কিল এই যে তাদের ভাষা আর আমাদের ভাষা তো এক হ'তে পারে না। সকলে ভাবতে লাগলেন, তাইতো কী করা যায়!

তখন একজন একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি বল্‌লেন,—সাহারা মরুভূমিতে কোন রকম কথা লিখে লাভ নেই, কারণ, মঙ্গলগ্রহের লোকেরা সে ভাষা বুঝতে পারবে না। তারচেয়ে সেখানে আগুন দিয়ে বড় বড় ক'রে জ্যামিতির চিত্র এঁকে দেওয়া হোক্। তারা যখন এত বুদ্ধিমান, ইঞ্জিনিয়ার, তখন নিশ্চয়ই তারা অঙ্ক আর জ্যামিতি জানে। ভাষা তফাৎ হ'তে পারে, কিন্তু জ্যামিতির চিত্র তো আর বদ্‌লাবে না! তিনি বল্‌লেন,—সুবিখ্যাত পিথাগোরাসের প্রতিপাদ্যটির (সাধারণ স্কুল জ্যামিতির ২৯ নং প্রতিপাদ্য) চিত্র এঁকে দেওয়া যাক্। এই প্রতিপাদ্যটি এত প্রয়োজনীয় যে, কোন দেশের কোনও বৈজ্ঞানিকের কাছে অজানা থাকতে পারে না। মঙ্গলগ্রহে যদি বাস্তবিকই সুসভ্য প্রাণী বা বুদ্ধিমান মানুষ থাকে তবে তারাও এই মূল্যবান জ্যামিতির চিত্রটি নিশ্চয়ই জান্‌বে। তা হ'লে মঙ্গলের কোনও বৈজ্ঞানিক যদি দূরবীণ দিয়ে হঠাৎ এই ছবি পৃথিবীর বুকে দেখতে পায়, তৎক্ষণাৎ বুঝতে

পারবে পৃথিবীতে সুসভ্য উন্নত প্রাণী আছে, যারা তাদেরি মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করে। তখন তারাও আমাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করবে।

সকলে এই ফন্দির খুব তারিফ করলেন। তখন তাঁরা ভাবতে লাগলেন, কী ক'রে সাহারা মরুভূমির উপর আগুন দিয়ে জ্যামিতির ছবি আঁকা যায়। যাই হোক্, নানা কারণে তা আর হ'য়ে উঠল না।

এরপর বড় বড় টেলিস্কোপ আবিষ্কার হওয়াতে, তার দ্বারা মঙ্গলগ্রহকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বল্‌লেন—মঙ্গলগ্রহে কোন খালের চিহ্ন তাঁরা দেখতে পান নি—ওগুলি হয়ত চোখের ধাঁধাঁ মাত্র।

মঙ্গলগ্রহে হয়ত কোন জীবজন্তু নেই, হয়ত বা ছিল, কে জানে তারা বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে কিনা! এর সঠিক খবর আজও আমরা জানি না।

অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন—মঙ্গলগ্রহে অক্সিজেন কম। সেখানকার পাথর—হাওয়া থেকে নাকি অক্সিজেন শুষে নেয়। টেলিস্কোপে মঙ্গলগ্রহকে অনেকটা লাল দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা—সেখানকার পাথরে যে লোহার অংশ আছে—অক্সিজেন শুষে নেওয়ার দরুণ সে লোহা ও পাথরের পরিবর্ত্তন হচ্ছে ও এই লাল রং সেই লোহা পাথরের। আমাদের পৃথিবীতেও পাথরে যদি হাওয়া থেকে ঐ রকম অক্সিজেন শুষে নিতে থাকে—তা হ'লে এখানের অবস্থাও মঙ্গলগ্রহের মত হবে।

একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বলেছেন,—মঙ্গলগ্রহে যদি প্রাণী থাকেও—প্রায় বিলুপ্ত হ'য়ে এসেছে। অক্সিজেনের অভাবে তাদের জীবন আজ বিপন্ন। হয়ত কয়েক হাজার বছর পরে মঙ্গলগ্রহ চাঁদের মতই প্রাণহীন হবে।

পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলগ্রহটি সূর্য্য থেকে যেমন একটু বেশী দূরে, শুক্রগ্রহটি তেমনি একটু কাছে। ফলে, শুক্রগ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে একটু বেশী গরম। বৈজ্ঞানিকরা বলেন—সেখানে হয়তো কিছুকাল হয় কীটপতঙ্গ জন্মাতে সুরু করেছে। শুক্র ও মঙ্গলগ্রহ এ দুইটি প্রাণীবাসের অযোগ্য না হ'লেও সেখানে জীবজন্তু গাছপালা আছে কিনা একেবারে সঠিক বলা যায় না। এত বিশাল আকাশের আর কোথাও পৃথিবীর মতো গ্রহ দেখা যায় না যেখানে জীবজন্তুর কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিরাট বিশ্বের বুকে শুধু পৃথিবীর উপর আমরাই হয়তো জীবন্ত প্রাণী!

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সেইদিন বিকেলে মংলু নদীতে সাঁতার কাটতে চলল। এটা তার একটা নতুন খেলা। যে দিন তার বিশেষ ময়লা মনে হয় নিজেকে, গায়ে অনেক পথের ধূলো জমে, সে নদীতে চলে যায়। মনের আনন্দে বহুক্ষণ মাছের মত সাঁতার কাটে। জলের নীচে বৃদ্ধ কাছিম অবাক হয়ে মানুষের ছানার এই খেলা দেখে।

সেদিন সাঁতার কেটে মংলু যখন উঠল তখন পশ্চিমের আকাশ উদাস রিক্ত লাল থেকে ধূসর কালো বর্ণ ধারণ করেছে। পাখায় পাখায় অদ্ভুত সারে পানকৌড়ি আর বকের দল বাসায় ফিরছে। বন থেকে, থেকে থেকে কি যেন সন্ধ্যার একটা করুণ শব্দ উঠছে। ভাল্লুকরা গেছে অন্যদিকে চরতে।

বনের পথে বাসায় ফিরতে মংলুর মনে হোল পেছনে কি যেন একটা সামান্য শব্দ। এত সামান্য যে শুনেও মংলুর মনে হোল তার মনের ভুল। সে পেছনে চেয়ে দেখল দূরের বড় ঘাসগুলো নড়ছে, যেন বাতাসেই। কিন্তু বনের জীবনে অভ্যস্ত ভাল্লুকদের মংলু তখন

বিপদ বুঝতে পেরেছে আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আকাশে চীল চেঁচিয়ে উঠল—বাঘ বাঘ; সাবধান মংলু!

কালকেতু পেছনে ক্রুদ্ধ গম্ভীর গর্জ্জনে বন কাঁপিয়ে তুলল।

মংলু ততক্ষণে ঘুরে আবার নদীর দিকে মারল ছুট। নালুখ সঙ্গে নেই। এখনও কালকেতুর সঙ্গে যোঝবার মত বল ছোট্ট মংলুর হয়নি। সে কথা সে জানে, সে বুঝছে তার একমাত্র আশা এখন নদী। তাই পাথর টপকে শালের দলের ফাঁকে ফাঁকে এঁকে বেঁকে বিদ্যুতের মত ছুটল মংলু। আর কালকেতু গর্জ্জনে বন কাঁপিয়ে, তার পেছু নিল। সে ভাবছিল—ব্যস্ আজকে মানুষের ছানাটাকে হাতে পাওয়া গেছে। বাঘের সঙ্গে ছুটে আর কতদূর?

মংলু তখন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে কিন্তু কালকেতুর প্রতি লাফে তাদের ব্যবধান কমে আসছে। মংলুর বুক ফেটে যাবার যোগাড়। সে ছুটেছে প্রাণপণে তবু সামনে একটা টিলা, তারপরেই নীচে দিয়ে নদী কুলকুল করে ছুটে চলেছে। বাঘও বুঝল যে তারা নদীর কূলে এগিয়ে চলেছে সামনেই নদীর বাধা, সে আরও আনন্দে গর্জ্জন করে উঠল কারণ সে ভেবেছিল নদীর কূলে গিয়ে নিশ্চয় মানুষের ছানাটা থমকে দাঁড়াবে। মংলুর মতলব সে বোঝেনি। কালকেতু আনন্দে আবার গর্জ্জন করে উঠল। এদিকে ক্ষিপ্র পায়ে মংলু টিলার ওপর উঠেছে। কালকেতু আর তার ব্যবধান মোটে দশ হাত। আর দুই লাফে কালকেতু তাকে ধরে ফেলবে কিন্তু ওই দেখা যায় টিলার চূড়া। কালকেতু ভাবল মানুষের ছানাটা আর যাবে কোথায়! তবু পলায়মান শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত আনন্দ বাঘেদের আর কিছু নেই। ততক্ষণে ঠিক টিলার মাথায় গিয়ে পৌঁচেছে মংলু। নীচেই গভীর নদীর কুলকুল শব্দ। টিলাটা খাড়া নদীর বুকে নেমে গেছে। কাল্‌কেতু শিকার গর্জ্জন করে মারল লাফ। আর সঙ্গে মংলু লাফাবার আগে, উ উ ই ই!—করে ডেকে উঠে ঝাঁপ দিল নদীতে। একটা দ্রুত তীরের মত নদীর জলে মিলিয়ে গেল সে।

কালকেতু মংলুর পরিত্যক্ত জায়গায় লাফিয়ে পড়ে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে খানিকটা তাকিয়ে রইল তারপরে সেও জলে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু মংলু তখন নদীর স্রোতে তীরের মত সাঁতরে বহুদূর এগিয়ে গেছে। জলে বাঘ আর তার অনুসরণ করে কি করবে? দেখতে দেখতে বিদ্যুতের মত গতিতে ছোট হতে হতে কালো একটা ছোট্ট বিন্দুর মত হয়ে বহুদূরে মিলিয়ে গেল মংলু।

বাঘ ভিজে জুবড়ি, ব্যর্থ হয়ে গোঁ গোঁ করতে কূলে উঠে বনের ভেতর মিলিয়ে গেল। মংলু আবার তাকে ফাঁকি দিয়েছে।

সেদিন মংলু যখন বাসায় ফিরল, রাত তখন গভীর হয়েছে। বনের মাথায় প্রকাণ্ড থালার মত চাঁদ আর বনের গভীর উষ্ণ অভ্যন্তরে পাণ্ডুর উদাস রিক্ততা। বাসায় ফিরে মংলু দেখে মহা হৈ চৈ। ভাল্লুক-মা পড়ে কাৎরাচ্ছে আর বাচ্চারা ভীষণ হৈ চৈ লাগিয়েছে, নালুখ একঠায়ে ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে চুপ।

—কি হয়েছে? মংলু জিগেস করল

কালা জবাব দিল—মায়ের পায়ে কাঁটা ফুটেছে

—কাঁটা ফুটেছে ত বের করে ফেললেই ত হয়।

এখন ভাল্লুকরা কাঁটার কাছে ভারী জব্দ। ছোট কাঁটা হলে কোন রকমে তারা বের করে ফেলে নয়ত কিছুদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেটাকে অভ্যেস করে নেয়। তাদের বিশাল থাবা দিয়ে সরু কাঁটা বার করে ফেলবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই মংলু যখন বলল যে—"বের করে ফেললেই ত হয়—"ভাল্লুকরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। নালুখ বলল—কাঁটা আবার বার করা যায় নাকি? কিছুদিন খুঁড়িয়ে চললেই ও কাঁটা অভ্যেস হয়ে যাবে। ভাল্লুকমা কাৎরে উঠল—না গো এ প্রকাণ্ড সরু কাঁটা, এ পায়ে থাকলে পা ফুলবে পেকে পুঁজ পড়বে। হয়ত পাটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মংলু বলল—কই এদিকে এসোত দেখি। ভাল্লুকমা তিন পায়ে নেংচাতে নেংচাতে মংলুর কাছে এগিয়ে এল। মংলু তার আহত থাবাটা চাঁদের দিকে তুলে ধরে দেখল যে থাবার নরম জায়গাটায় একটা কাঁটা একেবারে গোড়া পর্য্যন্ত বিঁধে রয়েছে। প্রথমবারে তার সরু সরু আঙ্গুলের নখ দিয়ে কাঁটা ধরতে গিয়ে ফসকে গেল। কাঁটাটা খচ্ করে ওঠায় ভাল্লুকমা যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল।

মংলু বলল—মিছিমিছি ভীরু শেয়ালের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

নালুখ বলল—বেশ বলেছে মংলু, বেশ!

আবার নখ দিয়ে একবার মংলু কাঁটাটাকে সজোরে চেপে ধরল তারপরে বাঁ হাতের মুঠোয় থাবাটা প্রাণপণে চেপে একটানে কাঁটাটাকে বের করে ফেলল। ভাল্লুকমা বন ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল—উহুহু, গেছি গেছি!

ততক্ষণে ভাল্লুকের বাচ্চারা এমন কি নালুখও অবাক হয়ে কাঁটাটা দেখছে।

নালুখ বলল—সাবাস মংলু

পাঁচমিনিটের মধ্যে জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে গেল। ভাল্লুকমা বলে উঠল—আর মুখ ফুটে কথা বলতে হবে না। মোটা বুদ্ধি! একটা কাঁটা বার করবার ক্ষমতা নেই! ভাগ্যে মংলু ছিল তাইত বেঁচে গেলুম।

নালুখ হেসে বলল—মানুষের ছানাত! কেউটের বাচ্ছা তার বিষ ভোলে না, মানুষের বাচ্ছা তার বুদ্ধি ভোলো না।

তার আহত থাবাটা চাঁদের দিকে তুলে

ভাল্লুকমা তখন মংলুর ঝাঁকড়া মাথায় থাবা দিয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে আদর করে বলছে—তোর কি ভয় নেই মংলু? আজ একা এত রাত অবধি কোথায় ছিলি? কালকেতুর হাতে কি শিকার হতে চাস?

ও যে তোর চির শত্রু!

মংলু শুধু বলল—জানি। আজ আমায় তাড়া করেছিল।

ভাল্লুকমা লাফিয়ে উঠল—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ! চিল আমায় জানিয়ে দিল যে পেছনে কালো বাঘ তাড়া করেছে।

—তারপরে ?

মংলু হেসে বলল—সে আমায় ধরতে পারবে কেন ? নদীতে সাঁতরে পালিয়ে এলুম।

ভাল্লুকরা বলে উঠল—সাবাস মংলু !

নালুথ বলল—ওই কালকেতুর একদিন মংলুর হাতেই শেষ—এ আমি বলে দিলুম।

মংলুর চোখে তখন গভীর পিপাসা। সারা ঘুমন্ত বনে ঝিম ঝিম আওয়াজ, আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা, আর প্রকাণ্ড হলদে চাঁদ। বনের প্রান্তে প্রহরীর মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো খাড়া দেবদারু আর শালের সার। বিরাট বিশাল যুগান্তরের শ্রান্ত বিশ্রান্ত কালো বন।

তারপরে ধীরে ধীরে তাদের চোখে ঘুম নেমে এল।

সেই আধো জাগা আধো ঘুমন্ত অবস্থার মধ্যে মংলু শুনল ভাল্লুকমা গাইছে—

বাদুড়ের কালো পাখা আলো দিল মুছে
খোকা এবার ঘুমো।
কালো বাঘ ঘরে গেল লেজ বুকে গুঁজে
খোকা এবার ঘুমো।
শাল বনেতে কাল পেঁচার ঘুম ভেঙেছে
খোকা এবার ঘুমো।
রাত ঘিরেতে বন বেরালের চোখ জ্বলেছে
খোকা এবার ঘুমো।
নীল চাঁদা কপালে তোর এঁকেছে যে চুমো
খোকা এবার ঘুমোরে তুই খোকা এবার ঘুমো॥

ক্রমশঃ

নটরাজের চোখ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
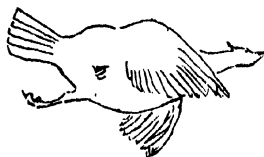
নিস্তব্ধ রাত থম থম করছিল।

অনেক দূরে পূব ঘাট পাহাড়ের ধূসর শ্রেণী, অন্ধকার দিগন্তকে আরো অন্ধকার করে দুর্গের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে চাঁদ নেই, আল্‌কাতরার মতো মিশকালো শূন্যের বুকে অসংখ্য জল্ জলে তারা যেন দাঁত বের করে হাসছিল।

তারার নিস্তেজ আলোতে অন্ধকারের গভীর কৃষ্ণতা একটু তরল হ'য়ে এসেছে, তা'র মাঝখানে চার পাশের সমস্ত গাছ পালা, পথ ঘাটকে অস্বাভাবিক ভূতুড়ে ব'লে মনে হচ্ছিল। পূবঘাট পর্ব্বতের কালো কালো উদ্ধত চূড়োগুলো পার হ'য়ে সমুদ্রের দিক থেকে রাতের ভিজে বাতাস ব'য়ে আসছে আর সেই বাতাসে মাদ্রাজ উপকূলের অসংখ্য নারকেল শ্রেণীর পাতায় পাতায় একটা কান্নার সুর যেন গুমরে গুমরে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে ভিজে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে পা ফেলে রঘু কামার অন্ধকারের ভেতর থেকে ঘাপটি মেরে এগিয়ে এলো। বেড়ালের মতোই তা'র দুটো চোখের তারা যেন সেই জমাট আঁধারের মাঝখানে ঝক্ মক্ ক'রে জ্বলে' উঠছে। তার কোমরে গোঁজা যোল ইঞ্চি লম্বা একখানা ছোরা, ডান হাতে একটা কালো লোহার ডাণ্ডা, বাঁ হাতে টর্চ লাইট।

সামনে নটরাজের মন্দির।

মন্দিরের দেশ এই দাক্ষিণাত্য। দ্রাবিড়ী শিল্প প্রতিভা এবং আর্য্য সভ্যতা ও সৌন্দর্য্য বোধের সংমিশ্রণে এদেশের মন্দিরগুলো ভাস্কর্য্যে অতুলনীয়। তা' ছাড়া এ দেশে আর কিছু থাক বা না থাক, ধর্ম্মের প্রতি মানুষের প্রকাণ্ড একটা মোহ আছে। তিন দিক সমুদ্র ঘেরা মাদ্রাজ অন্তরীপের পথে ঘাটে তাই অসংখ্য মন্দির ছড়ানো। দেবতারা দরিদ্র ন'ন, হীরে মুক্তো সোনাদানার রাশি রাশি সমারোহে তাঁরা প্রায় রাজা রাজড়ার মতোই বিরাজ করেন।

রঘু কামার দাগী আসামী! একটা খুনের মোকর্দ্দমায় ওর নামে ওয়ারেণ্ট বের হওয়ায় দেশ থেকে ফেরার হ'য়ে একেবারে মাদ্রাজে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু কাজের লোক সে, ব'সে থেকে তার সময় নষ্ট করবার উপায় নেই।

অন্ধকারের গভীর কালো আস্তরণের মাঝখানে মন্দিরটাকে প্রেতপুরীর মতো মনে হ'চ্ছে। সদর দরজার পাশে ঝাঁক্ড়া একটা শিরীষ গাছ থেকে কী যেন একটা পাখী ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে কর্কশ ভাবে ডেকে' উঠল, রঘু কামারের বুকের পাটাও একবার কেমন একটু শিউরে গেল।

রঘু টর্চটা জ্বালালো, তীক্ষ্ণ আলোটা দরজার উপরে পড়ল বৃত্তের মতো গোল হ'য়ে। দেখা গেল, লোহার দরজার মোটা মোটা কড়ার সঙ্গে একটা মস্ত ভারী তালা আঁটা—সেটাকে ভাঙা দুঃসাধ্য।

রঘু এজন্যে তৈরী হ'য়েই এসেছিল, দু'চার বার সে তালাটা নাড়া চাড়া করলে, তারপর পকেট থেকে বে'র ক'রে আনলে কাঁচের ছিপি আঁটা শিশিতে খানিকটা ষ্ট্রং নাইট্রিক য়্যাসিড।

ছিপিটা খুলে তালার মুখে একটু খানি ঢেলে' দেওয়ার অপেক্ষা মাত্র—মুহূর্ত্তে বুজ্ বুজ্ করে খানিকটা নীল ফেনা জমে' উঠ্‌লো আর উগ্র একটা ধাতব গন্ধের সাথে লালাভ বিষাক্ত ধোঁয়া জায়গাটাকে কিছুক্ষণের জন্যে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। এক মিনিটের মধ্যে দেখা গেল, তালার প্রায় অর্দ্ধেকটা পরিমাণ গলে গিয়ে একটা বিকৃত রূপ গ্রহণ ক'রেছে।

এইবার রঘু একটা হ্যাচকা টান দিতেই তালাটা চট্ ক'রে খুলে' গেল। রঘু আস্তে আস্তে দরজা খুলে' ফেললে। 'ক্যাঁচ্' ক'রে কব্জার একটুখানি শব্দ হ'ল, রঘু আরেকবার চমকে চারিদিকে তাকাল কোথাও কেউ শুন্‌তে না পায়।

কিন্তু কারো শুনতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। মন্দিরের কাছাকাছি কোনো মানুষের বসতি নেই পূজারীরাও কেউ এখানে থাকে না, রোজকার মতো পূজো শেষ ক'রে তা'রা নিজেদের বাড়িতে ফিরে' যায়। তা' ছাড়া সমুদ্রের অশ্রান্ত ঝোড়ো হাওয়ায় নারকেল বীথি এমনি ভাবেই মর্ম্মরিত হচ্ছিল যে দরজা খুলবার সামান্য একটু শব্দ কেন, এখানে বন্দুকের আওয়াজ করলেও বোধ হয় ত' কা'রো কানে যেত না। চারদিক কেমন একটা নিঃশব্দ নির্জ্জনতায় যেন ভরাট হয়ে আছে।

রঘু সামান্য একটু দ্বিধা ক'রে মন্দিরের মধ্যে পা বাড়ালো। লম্বা পাথর বাঁধানো একটা প্রাঙ্গন পেরিয়ে নটরাজের মন্দির। রঘুর টর্চের আলো লেগে' আশে পাশের সমস্ত অন্ধকার যেন একটা কালো পাখীর মতো ছট পট ক'রে দু' পাশে ডানা গুটিয়ে নিলে, সাপের জিভের মতো তীক্ষ্ণ খানিকটা আলো মার্ব্বেল পাথরে চক্ চক্ ক'রে উঠল।

রঘু মন্দিরের বারান্দায় উঠে' এল। দুপাশে সারি সারি থাম যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে, তাদের গায়ে নানা রকম শিল্প কার্য্যের বহু পরিচ্ছদ। মন্দিরের দরজার চৌকাঠের উপরে দুটো পাথরের সাপ জড়াজড়ি করে উঠেছে, ফণা দুটো তাদের ছোবল মারবার ভঙ্গীতে উদ্যত। মুহূর্ত্তের জন্য কেমন যেন একটা ভয় রঘুর মনকে আচ্ছন্ন করে ধরল, ওর মনে হতে লাগল: সাপ-দুটো এখুনি জীবন্ত হয়ে উঠে যেন ফোঁস করে গর্জে উঠবে।

কিন্তু দাগী আসামী রঘু, জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওর পরিচয়, তাই নিজের মনের

ভয়ের কথা ভেবে' ওর নিজেরই হাসি আসছিল। মন্দিরের দরজায় আস্তে একটা আঘাত করতেই দরজাটা খুলে গেল, টর্চের আলোয় সামনের বেদীর উপরে নটরাজের মূর্ত্তিটা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল।

কয়েক মিনিট একটা বিচিত্র আশঙ্কা এবং দ্বিধায় রঘু মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। মূর্তিটা আকারে অত্যন্ত বড়, দৈর্ঘে প্রায় তিন হাতের মতো। নাচের তালে তালে উড়ছে মাথার জটাজুট আর নটরাজের চারপাশে বেষ্টিত একটা চক্র থেকে আগুনের শিখা ছিটকে বেরোচ্ছে। এক হাতে ডমরু, আরেক হাতে অগ্নিময় উদ্যত ত্রিশূল। মুখের ভাবে একটা প্রচণ্ড কঠোরতা, তিনটে চোখের ভাব আরো ভয়ানক।

মূর্তির সর্বাঙ্গে পূজারীদের শ্রদ্ধা এবং জনসাধারণের ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ বহুমূল্য অলঙ্কার টর্চের আলোয় সেগুলো চিক্‌চিক্ করছিল। ক্ষুধার মতো একটা হিংস্র লোভে ওর মুখের ভাব অমানুষিক হ'য়ে উঠেছে : গয়নাগুলোর দাম সব শুদ্ধ চার পাঁচ হাজার টাকার কম হ'বে না, রঘু মনে মনে একটা হিসেব করলে।

কিন্তু সব চাইতে মূল্যবান এবং সবচেয়ে লোভনীয় হ'চ্ছে নটরাজের তৃতীয়-নেত্রটি। রঘু আগেই লক্ষ্য ক'রেছিল, নীল রঙের একখানা বহুমূল্য পাথর সেখানে বসানো, ওজনে সেখানা একশো ক্যারেটেরও বেশি। তার দাম—

রঘু কামারের ছেলে, ঠকবার পাত্র ও নয়। ওর মনে হ'তে লাগল, ওর সারাজীবন আর এরকম চুরি ডাকাতি ক'রে বেড়াতে হ'বে না, এইবারে দিন কতক পায়ের উপরে পা তুলে' ব'সে খেতে পারবে। এতবড় দাঁও ও শীগগির মারতে পারেনি' আর তা' ছাড়া এমন নির্বিঘ্নে চুরি করবার সুযোগও সচরাচর ঘটে' ওঠে না।

রঘু আস্তে আস্তে মূর্তির গা থেকে গয়নাগুলো খুলে' নিতে লাগল। বক্র একটু হাসির রেখাও ভেসে' উঠেছে ওর মুখের উপর : হায়রে দেবতা! পুরাণে তো তোমার কত বিক্রমের কথাই শুনতে পাওয়া যায়, এই কলিকালে কি তুমি নিজেকেও রক্ষা করতে পারো না!

এবারে চোখের মহামূল্য রত্নটা। রঘু ভাবলে : সার্থক হ'য়েছে, একান্ত সার্থক হ'য়েছে আজকে ওর এ ভাবে চুরি করতে আসা, এই একখানা হীরেই ওকে রাজা ক'রে দেবে। দশ হাজার টাকার কমে এখানা কে ছাড়ে! তারপরই সারাজীবন নিশ্চিন্তে পায়ের উপর পা তুলে' দিয়ে বসে খাওয়া। এই মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেই ছোট মতন একখানা বাড়ি সে করবে। পুলিসের সাধ্য কি যে এখানে ওর নাগাল পায়?

কিন্তু নটরাজের ওই ভীষণ মূর্তি আর চোখের ওই ভয়ানক দৃষ্টি যেন রঘুকে শাসাচ্ছিল। আলো লেগে' কপালের হীরেটা চারপাশে একটা নীলাভ দ্যুতি ছড়িয়ে ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বলছে, রঘুর একবারের জন্য মনে হ'ল, পাথরের ওই তীব্র নীলাভা কেমন যেন অস্বাভাবিক! একবার ভাবলে : থাক্, ও পাথরখানা নিয়ে দরকার নেই।

কিন্তু এসব কী দুর্ব্বলতা! নিজের মনের উপরেই রঘু চটে যাচ্ছিল। বার কয়েক ইতস্তত ক'রে ও হীরেটার দিকে হাত বাড়ালো।

হাতটা যেই-চোখের কাছাকাছি এসেছে, অমনি কে যেন সজোরে ওর বুড়ো আঙুলে পিনের মতো কি একটা ফুটিয়ে দিলে। যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে রঘু আঙুলটাকে সামনের আলোয় নিয়ে এলো, দেখলে আঙুলের মাথায় অদ্ভুত ধরণের একটা ক্ষত চিহ্ন। খানিকটা চামড়া কী ক'রে কেটে' গিয়ে ছোট্ট একটা ক্ষত হ'য়েছে আর সেই গর্ত্তের ভেতর থেকে নীল রঙের এক বিন্দু রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

রঘু আঘাতটার দিকে বিস্মিত ভাবে তাকালে, কারণ মূর্তির চোখের কোথাও এমন কোনো একটা তীক্ষ্ণ জিনিষের অস্তিত্ব ছিল না, যার জন্যে আঙুলে এমনি একটা ক্ষত হওয়া সম্ভবপর। রঘু আবার হাত বাড়ালো।

আবার আঙুলে সেই পিন্ ফুটানোর অনুভূতি, সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় রঘুর সর্বাঙ্গ শিউরে' উঠল। হাত থেকে ঝন্ ঝন্ ক'রে টর্চটা খসে পড়ল, রঘুর অচেতন দেহটাও লুটিয়ে পড়ল তারি সঙ্গে সঙ্গে! পাথরটা তীব্র বিষে ভরা।

সকালে মন্দিরের পূজারীরা এসে' দেখলে, রঘুর বিষে-নীল বর্ণ মৃতদেহটা নটরাজের পায়ের নীচে প'ড়ে রয়েছে আর নটরাজের চোখ যেন ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে।

ছায়া নিয়ে লেখা

দেশ-বিদেশের হ্যাঁচ্চো

শ্রীঅজয় শঙ্কর ভাদুড়ী

হাঁচি সম্বন্ধে সংস্কার পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই কিছু-না কিছু আছে। আমাদের যাদের ছোট ভাই বোন আছে, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য ক'রে থাকবে যে ভাই বোনটি হাঁচলে মা যদি কাছে থাকেন, তবে ব'লে ওঠেন 'জীবসহস্রং'। কোথাও যাবার সময় যদি পিছন থেকে কেউ হাঁচে তবে বুড়োদের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়—'যাত্রা নাস্তি'। অর্থাৎ হাঁচি মানেই কোন একটা বাধা।

এ সব সংস্কার তো আমরা জানি। কিন্তু কেবল আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অনেক দেশেই এই হাঁচি সম্বন্ধে নানারকম সংস্কার আছে, নানা মজার ব্যাপার আছে।

মাওরী নিউজিল্যাণ্ডের একটা অসভ্য জাতি। ওদের ছেলেদের নামকরণ এক ভারী মজার কাণ্ড। মাওরীদের পুরুতঠাকুর ওদের পূর্ব্বপুরুষদের নামের একটা তালিকা গড় গড় ক'রে পড়তে থাকেন। ছেলে ইতিমধ্যে হেঁচে ফেল্লেই সেই মুহূর্ত্তে যে নামটী বলা হয়েছিল সেইটে ওর নাম হয়ে যায়!

কেনিয়াতে কারো রোগ হ'লে সকলের আগে খোঁজ নেওয়া হয় রোগটা কি—মৃত-আত্মীয়ের আত্মার ভর্ না সাধারণ রোগ! এর জন্যে সে গ্রামের জ্ঞানী বৃদ্ধার উপদেশ চাওয়া হয় আর তিনি এক চমৎকার ওষুধ বেছে দেন। সেটা এই:—পরের দিন সকালবেলায় সে কি করেছে, তা তার বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করতে যাবে। সে যদি হেঁচে থাকে—বুঝতে হবে রোগটা সাধারণ, আর না হেঁচে থাকলে রোগটা হচ্ছে আত্মার ভর্।

লিপার দ্বীপে যদি কোন ছোট ছেলে হাঁচে তবে বুঝতে হবে তার আত্মা চলে গিয়েছিল এইমাত্র ফিরে এসেছে; আর অমনি আশেপাশের লোকজন তার মঙ্গল কামনায় চেঁচামেচি সুরু করে দেয়। এই দ্বীপের লোকেরা আরো একটি মজা করে। যে নাম ধরে একজনকে ডাকা হয়, সে নাম তার আত্মার পছন্দ হয়েছে কিনা এইটে ঠিক তারা করে এইভাবে:—নাম ধরে ডাকার সময় সে যদি আস্তে হাঁচে তবেই বুঝতে হবে নামটা ঠিক হয়নি এবং এই হাঁচিটা আত্মার অসন্তুষ্টির পূর্ব্বাভাষ।

মিলানশিয়াতে কোন লোক হাঁচলে লোকে মনে করে কেউ তার নাম ধ'রে ডাকছে; আর যদি সে হাঁচতে না পারে তবে বুঝবে কেউ তার নাম ধ'রে ডাকার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

মালয়বাসীরা হাঁচলে তাদের আত্মাকে খুব জোরে এক ডাক দেয়। ডিয়াক (Dyak) শিশু হাঁচলে তার মা ডাক দেন—'আত্মা! শীগ্‌গীর এখানে চ'লে এস।' টোবা বাটাক (Toba Batak)-রা খুব তাড়াতাড়ি হাঁচলে তাদের দেশের ডাক্তারকে ডেকে পাঠায় যাতে সে তৎক্ষণাৎ আত্মাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে হাঁচলেই সে তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, 'আমি না, অন্য কেউ নিশ্চয়।' সঙ্গে সঙ্গে হাততালির ধুম পড়ে যায়। এ কথাটির অর্থ হচ্ছে—'আমার আত্মাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যেতে দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। (এদের বিশ্বাস আত্মা নাকের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায়)। তুমি যাকে ভাবছ, আমি সে নই।' জুলুদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মৃতের আত্মা স্বপ্নে তাদের মধ্যে বিচরণ করে ও রোগ জন্মায়। জুলু হাঁচলে বল্‌বে,—'আমি ধন্য। আমার পূর্ব্বপুরুষের আত্মা এখন আমার কাছে এসেছেন; আমাকে হাঁচিয়েছেন ব'লে এখনই আমি তাঁর পূজা করব।'—এই ব'লে তাদের বংশের মহিমা কীর্ত্তন করতে থাকে।

বৃটিশ নিউগিনির কোয়টারা ঘুমের মধ্যে হাঁচলে, মনে করে তার আত্মা ফিরে এলো। পলিনেশিয়েন্‌রা বলে,—হাঁচিটা হচ্ছে আত্মার অস্থায়ী অনুপস্থিতি। প্যারেটোঙ্গাতে আবার একটা মজার ব্যাপার হয়। যে হাঁচে—তার কাছাকাছি যারা থাকে, তারা তার আত্মাকে সম্বোধন ক'রে বলে—'ওহে, তুমি কি ফিরে এসেছ?'

সাইবেরিয়ার বারিয়াটেরা ভাবে ঘুমের মধ্যে হাঁচা খুবই বিপজ্জনক, কারণ তখন আত্মা হঠাৎ লাফিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় আর দুষ্ট প্রেতাত্মারা যারা ব্যাপারটা দেখে, আত্মাকে পালিয়ে যাবার আগেই ধ'রে নিয়ে যায়। নরওয়ের চাষাদের ধারণা—রোগী হাঁচলে সেটা সুলক্ষণ—সে মরবে না। ছোট ছেলে হাঁচলে তারা ব'লে উঠবে—'বেড়ে ওঠ।' কারণ এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তাদের আরও ধারণা—কোন লোক কিছু ভাবতে ভাবতে হেঁচে ফেল্লে তার ভাবনা সত্যি হবে।

ফ্লোরিডাতে কেহ হাঁচলে তারা মনে করে, যে হেঁচেছে তার সম্বন্ধে কথা কইতে কইতে কেউ রেগে উঠেছে—হয়ত নিজের টিণ্ডালোকে (Tindalo—নিজের আত্মা) বল্‌ছে তাকে খেয়ে ফেলতে। তখন যে হেঁচেছে সে নিজের টিণ্ডালোকে বলে—যে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে তাকে ধ্বংস করে ফেলতে। ঠিক এইভাবে 'সা'তে কেউ হাঁচলে সে বলে ওঠে—'কে আমায় ডাকৃছে, যদি ভালোর জন্যে হয়—বেশ; আর যদি মন্দের জন্য ডাকে—তবে 'অমুক' (যেমন প্রেতাত্মা) আমাকে রক্ষা করুক।' ব্যাঙ্ক দ্বীপেও এই রকম হয়—হাঁচলে মনে করে—কেউ তার ভালোর জন্য বা খারাপের জন্য ডাক্‌ছে। মোট্‌লাভেতে যদি ছেলে হাঁচে তবে তার মা ডেকে ওঠেন—'ওকে থাকতে দেও, ওকে এই পৃথিবীতে আস্‌তে দাও।' 'মোটা'তে ছেলে হাঁচলে সকলে চেঁচিয়ে ওঠে,—'ওকে আমাদের কাছে ছেড়ে দাও।' ওরা ভাবে কোন ভূতটুত বুঝি ছেলের আত্মাকে নিয়ে যাচ্ছে।

এইত গেল সব বুনো জাতের কথা। এবার সভ্য জাতির কথাও কিছু বলি।

প্রাচীন ইউরোপে সব চেয়ে সুসভ্য ছিল গ্রীস্ আর রোম। গ্রীসে ওরা হাঁচিটাকে একটা ভাল জিনিষ বলে মনে করে। কেউ যদি হাঁচে তবে তাকে নমস্কার করে বলা হয়,—'বেঁচে থাক।' রোমেও অনেকটা এই ধরণের। যে হাঁচবে তার স্বাস্থ্য ভাল হোক এই কামনা সকলে করে।

মধ্যযুগে ও তার পরের যুগে ইউরোপের নানা জায়গায় হাঁচলে এক রীতি চলিত ছিল। হাঁচলে বল্‌তে হত—'ভগবান রক্ষা করুন' অথবা 'ঈশ্বর রক্ষা করুন'। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে, লোকে হাঁচলে, বুকের উপর দু'হাত তুলে ক্রশের মত করত। কিন্তু পরে পুরুতঠাকুরদের উপদেশে হাঁচিটাকে ওরা আর তত বেশী আমল দিত না।

মুসলমানগণ হাঁচিটাকে বিশেষ পবিত্র বলে মনে করেন। কেউ যদি হেঁচে ফেলে, বলে উঠতে হয়—'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ'; তবে দলের অন্ততঃ একজনকে বল্‌তেই হবে, 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' মিশরে কেউ হাঁচলে বল্‌ত, 'ভগবানকে ধন্যবাদ।' যারা কাছে থাকত তাদের প্রত্যেককে বল্‌তে হত, 'ভগবান তোমায় দয়া করুন।' যে হেঁচেছে, সে তখন বল্‌ত,—'ভগবান আমাদের সবাইকে চালিত করুন।'

রাজারা যখন হাঁচেন তখন ভারী সব মজার কাণ্ড হয়। মেসোপোটেমিয়ার রাজা একবার হাঁচলেই সারা রাজ্য জুড়ে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। আসান্তির রাজা হাঁচলে তার পার্শ্বচরেরা দুটো আঙ্গুল বুকে রেখে মঙ্গলের সূচনা করে।

অদ্ভুত সংবাদ

শ্রীনিখিলকুমার চক্রবর্ত্তী

কাল রাতে চুপি চুপি ও-পাড়ার নন্দ
গিয়েছিল 'হনলুলু' না নিয়ে সনন্দ।
দেখে এলো কত শত অদ্ভুত কাণ্ড ;—
বলি যদি হয়ে যাবে গল্প প্রকাণ্ড।

মুসুরির ডালে হোথা নেই নাকি ছন্দ,
কবিতার মাঝে নেই হলুদের গন্ধ !
আকাশের বুকে নেই লাল নীল ঝর্ণা,
পশুপাখী সেথা নাকি পরেনাকো ওড়না !

হিপোপটেমাস্ নাকি করে নাকো নৃত্য,
প্রভুর আদেশ নাকি মেনে চলে ভৃত্য।
জিরাফের গ্যাং নাকি গায় নাকো কোন গান ;
অদ্ভুত ! কেহ তবু করে নাকো অভিমান।

মানুষের পাখা নেই অদ্ভুত সংবাদ,
মরিলে বাঁচে না কেহ, হোথা এ প্রবাদ।
এ সকলি শুনে এলো ও-পাড়ার নন্দ ;
বিশ্বাস না কর তো কর গিয়ে জব্দ।

রুশদেশের গোগল

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

রুশ দেশের গোগল ছিলেন এক সাহিত্যিক! নামটী যেমন অদ্ভুত তেমনি লোকটীর জীবনও ছিল অদ্ভুত। অদ্ভুত লোককে—অর্থাৎ যাদের জীবন প্রণালী আমাদের সঙ্গে মেলেনা, আমরা প্রায়ই বলে থাকি, লোকটার মাথার স্ক্রু ঢিলে আছে—কিংবা পাগল। গোগলের কিন্তু মাথার স্ক্রু ঢিলে ছিলনা। তিনি ছিলেন অসাধারণ সাহিত্যিক। অসাধারণ এই হিসেবে যে, গোগল সাহিত্য সাধনাকে জীবনের সঙ্গে একভাবে গেঁথে ফেলেছিলেন। সাহিত্য চর্চ্চাকে তিনি সখ বা বিলাস হিসাবে দেখতেন না। তিনি মনে করতেন, সাহিত্য সাধনাই হচ্ছে জীবন—আর জীবনই সাহিত্য সাধনা! এ দুটী তাঁর কাছে এক বস্তু ছিল!

১৮০০ খৃষ্টাব্দে Czar-এর সময়ে রুশ দেশের এক গ্রামে গোগল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নামের মত, তাঁর জন্ম-স্থানের নামটীও অদ্ভুত ধরণের। গ্রামের নাম Sorotchintz. গোগলের মত তাঁর গাঁয়ের নামটীও উচ্চারণ করতে আমাদের গণ্ডগোল লাগে। বয়স যখন খুব অল্প তিনি কলেজ ছেড়ে, সেন্টপিটার্সবার্গ সহরে চাকরী করতে যাত্রা করেন। কিন্তু সে চাকরী বেশী দিন তিনি রাখতে পারলেন না। সেই সময় তাঁর মনে দুটো ইচ্ছা জাগলো। একটা ইচ্ছা, সাহিত্য চর্চ্চা করা, আর অন্যটী থিয়েটারে অভিনয় করা। কিছুদিন সরকারী কাজ করবার পর, একদিন দেখা গেল মাত্র একটা স্যুটকেশ হাতে করে, গোগল আমেরিকা-গামী এক জাহাজে উঠে বসেছেন! আমেরিকায় বহুদিন ঘুরে বেড়ালেন—কিন্তু কোন কিছুই যোগাড় করতে পারলেন না! অভিনেতা হওয়ার সখ তাঁর দারুণ ছিল! তার জন্যে অনেক থিয়েটারে যাতায়াত করলেন—কিন্তু তাঁর গলার স্বর ছিল অত্যন্ত দুর্ব্বল! থিয়েটারের কাজে গলার আওয়াজ দুর্ব্বল থাকলে অভিনেতা হওয়া যায় না। অতএব তাঁর মুখের উপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

গোগলের চেহারাখানাও মোটেই ভাল ছিল না। দেহের তুলনায় পা দুটো ছিল ছোট—আর সব সময় তিনি ঘাড় হেঁট করে রাস্তা চলতেন। মুখখানা বিন্দু মাত্র খুসী ছিল না—আর মাথার বড় বড় রুক্ষ চুলগুলো সেই কুশ্রী মুখের চারপাশে উড়তো। তাঁর চেহারা দেখে লোকে হাসতো।

কিন্তু গোগল যখন সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা দিলেন তখন একটা নূতন যুগ সৃষ্টি হ'ল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গোগল মস্ত বড় সাহিত্যিক বলে লোক সমাজে পরিচিত হলেন। একে একে তাঁর বই বেরুতে লাগলো—তার মধ্যে—Dead souls, The Cloak, Imperial-General, The memoirs of a mad man ইত্যাদি বিখ্যাত বইগুলি। এর মধ্যে The Cloak, আর Dead-souls জগৎবিখ্যাত বই। এই সব বই যখন তোমরা পড়বে গোগলের প্রকৃত ক্ষমতা বুঝতে পারবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত আনন্দও পাবে! গোগলের সাহিত্যে রুশদেশের প্রকৃত অন্তরের ছায়া তাঁর লেখার বুকে ফুটে উঠলো। লোকে প্রকৃতভাবে খাঁটী সাহিত্য পেল আর দেশকে সত্যরূপে চিনতে শিখলো—। রুশদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, গোর্কী এঁরা প্রত্যেকেই গোগলের লেখায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন!

রুশদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ডষ্টয়ভস্কি একসময় বলেছিলেন—We have all issued out of Gogol's Cloak—অর্থাৎ আমাদের সব লেখা গোগলের Cloak হ'তে অনুপ্রাণিত হয়েছে। গোগলের Dead-souls এটা তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি, আর Cloak এটা আজও পৃথিবীর গল্পের আদর্শ হয়ে রয়েছে।

রাশিয়ায় তখন সার্ফডামের যুগ। এক কথায় বলতে গেলে তখন রাশিয়ায় দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন যেমন বড় লোক বলতে আমরা বুঝি ব্যাঙ্কে যার যত বেশী টাকা কিংবা যার বিরাট জমিদারী আছে! কিন্তু সেই সময় যে ব্যক্তির যত বেশী দাস থাকতো সে তত বড় লোক। সেই ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তির অধীনে যত মানুষ বা প্রাণী (souls) থাকতো—তাকে সেই সব প্রাণীর মাথা পিছু গবর্ণমেন্টকে কর দিতে হ'ত।

যদি কোন প্রাণী (souls) মারা যেত, তবুও তদানীন্তন আইন অনুযায়ী সেই মালিক কর হ'তে রেহাই পেত না। এই সব মালিকের লক্ষ প্রাণীর নাম—করের পরিমাণ কত সমস্তই গভর্ণমেন্টের ঘরে (আদম সুমারীর খাতায়) লেখা থাকতো। তবে এতে একটা সুবিধা ছিল যে, ঐ সব মৃতপ্রাণী (Dead souls) দের নামকরে স্থানীয় ব্যাঙ্ক হ'তে টাকা ধার করা যেত। 'Dead souls' বইখানির নায়ক Tchitchikoff একটা মজার যুক্তি আঁটলো। সে ভাবলো, ঐ মৃত প্রাণীগুলি যদি সে অল্প মূল্যে মালিকদের কাছ হ'তে কিনে নেয়—আর সেই সব মৃত প্রাণীগুলির নাম করে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নেয় তবে তার এই দৈন্য দশা ঘুচে যায়। রাতারাতি লাখপতি হ'তে পারে—অর্থাৎ সেই টাকা দিয়ে বেশ বড় রকমের ব্যবসা খুলতে পারে। ঐ সব 'মৃতপ্রাণী'গুলির মালিকেরা অল্পমূল্যে তাদের বিক্রী করতে রাজী হ'বে—কারণ তাতে তারা গভর্ণমেন্টকে কর দেওয়া থেকে মুক্তি পাবে! এই মতলব এঁটে, Tchitchikoff "মৃতপ্রাণী" কেনবার জন্য রুশদেশের সারা গ্রাম ঘুরে বেড়াতে লাগল। Dead-souls এর ভেতর Tchitchikoff এর চক্ষে রুশদেশের গ্রামগুলির দীন মূর্ত্তি ফুটে উঠল, তাঁর লেখায় এত সজীবতা যে আমরা তাঁর কলমের তুলিতে নূতন ছবি দেখলাম। কিন্তু এই ছবি কি করুণ।

Dead-souls এর ভেতর অনেক হাসির অনেক কৌতুকের ব্যাপার আছে। কিন্তু সেই সব হাসি ও কৌতুকের পিছনে অশ্রু-প্রবাহ জমাট বেঁধে রয়েছে। ফল্গু-ধারার মত সেই অশ্রুপ্রবাহ সকলের অলক্ষিতে বয়ে যাচ্ছে। গোগল যে সব হাসিও কৌতুকাঙ্কন করেছেন—সে হাসি তাঁরই দুঃখময় জীবনের বাহিরের রূপ। এই ব্যথাময় হাসির তুলনা বুঝি কোন সাহিত্যে নেই। গোগল যখন পুস্কিনের সম্মুখে Dead-souls পড়লেন, তখন পুস্কিন চীৎকার করে বলেছিলেন God, what a sad country Russia is (ঈশ্বর কী দুর্ভাগ্য এই রাশিয়ায়)।

গোগল অনেকগুলি হাস্য-রসাত্মক অথচ তীব্র ব্যঙ্গময় নাটকও লিখেছিলেন। এগুলি যখন নাট্যমঞ্চে অভিনীত হ'ত, তখন প্রত্যেক দর্শক হেসে গড়াগড়ি দিত অথচ এই সব হাসির পেছনে ও কৌতুকের পেছনে সব সময় একটী জিনিষ ছিল যা হচ্ছে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকৃত বস্তুকে কৌশলে দেখান।

গোগলের শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখে কাটে! শেষে তিনি বই লেখা ছেড়েই দিয়েছিলেন। কখন যে কোথায় থাকতেন তা কেউ জানত না! আজ এখানে কাল ওখানে এইরূপ ভাবেই ঘুরে বেড়াতেন। তিনি

কিছুকালের জন্য রুশদেশ ছেড়ে রোমে চলে যান। তারপর রোম থেকে জেরুসালামে তীর্থ পর্য্যটনে বের হয়ে যান। তীর্থ পর্য্যটন সেরে তিনি আবার রুশদেশে ফিরে আসেন। এই সময় তাঁর হাতে একপয়সাও ছিলনা—মাত্র সম্বল একটী ছোট্ট চামড়ার ব্যাগ। এই ছোট্ট চামড়ার ব্যাগটী হাতে করে তিনি পদব্রজে সমগ্র রুশদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই সময়টা প্রায়ই অনাহারে অনিদ্রায় তাঁর কেটে যেতো। রাস্তার ওপর শীতের মধ্যে বরফের মধ্যে অনাহারে হয়তো চুপ করে বসে থাকতেন। কখনও লোকে দেখতে পেতো গোগল রাস্তা দিয়ে চলেছেন: হাতে একটা সুটকেশ—মাথায় বড় বড় লম্বা লম্বা এলোমেলোচুল—পরণে পুরাতন প্যান্ট আর একটা মাত্র কোট—। গোগল আপন মনে চলছেন, কিজানি বিড় বিড় করে কি বলতে বলতে ঘাড় হেঁট করে রাস্তা ভাঙ্গছেন।

অথচ এই উপবাসের মধ্যেই যখনই তিনি হঠাৎ কিছু টাকা পয়সা পেতেন, তখন যে সব গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিতেন।

শেষজীবনে সব সময় তাঁর মনে হত তিনি বই লিখে এক মস্ত পাপ কাজ করেছেন। কেন যে এ ধারণা হ'ল তা বলা যায় না। অনেকে বলেন, শেষ জীবনে গোগল সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি দিনরাত প্রার্থনা করতেন। নিদ্রাহীন রাতে মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক-ভাবে চীৎকার করতেন—দিবসে একা একা নির্জ্জন নদীতীরে বা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন।

গোগলের মৃত্যু সেও এক অদ্ভুত!

মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্তে—তিনি চীৎকার করে উঠেছিলেন: আমার সিঁড়ি কই—সিঁড়ি! পরক্ষণেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রংমশালের মাসিক প্রতিযোগিতায় যারা এখনও পুরস্কার পাওনি তাদের শীঘ্রই পুরস্কারগুলি পাঠাবার বন্দোবস্ত আমরা করছি।

—সম্পাদক।